ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর

কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই চৈত্র,
১৭৮০ শকাব্দ

আট টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
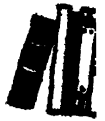
উৎসর্গ

"ভূমের্গরীয়সী মাতা ' ।পিতা"

৺বিনোদবিহারী চক্রবর্তী
৺ব্রজবালা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় যে সাহিত্যের ধারা একদিন বাঙলাদেশের জনমণ্ডলীর এক বৃহৎ অংশের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিত, তাহারই যথাসম্ভব সম্পূর্ণ এবং প্রামাণ্য পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে কবিগানের সঙ্গীত-ধর্ম অপেক্ষা সাহিত্য মূল্যের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়াছি।

বর্তমান গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে আমার পূর্ববর্তী মনীষিগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। যথাস্থানে তাঁহাদের ঋণ উল্লিখিত হইয়াছে। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতেও প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি।

এই গ্রন্থের রূপ-পরিকল্পনা করিয়াছেন আমার অগ্রজ পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়। প্রথমে যখন গুপ্তকবি সংগৃহীত কবিওয়ালাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে মনস্থ করি, সেই সময়ে তিনি আমাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিওয়ালাদের সামগ্রিক রূপটির পরিচয় প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, কারণ, গুপ্তকবির সংগ্রহ যে এইদিক দিয়া নিতান্তই অসম্পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাই হোক্ তাঁহার সেই আদেশ শিরোধার্য করিয়া বর্তমান গ্রন্থ রচিত হইল। তাঁহার শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণিপাত জানাইতেছি। আলাপ আলোচনায় আমাকে আন্তরিক সাহচর্য দান করিয়াছেন শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীযুত ত্রিদিবনাথ রায় এবং অধ্যাপক শ্রীযুত হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়গণ। গ্রন্থ রচনার কালে আমার মনে হইত যে এই বিপুলকায় গ্রন্থ হয়ত কখনই প্রকাশের সৌভাগ্যলাভ করিবে না। এ হেন সময়ে শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় জানাইলেন যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ-প্রকাশে সম্মত হইয়াছেন। সত্যসত্যই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত এবং শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তাঁহারা উভয়েই আমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীনা চক্রবর্তী, শ্রীমতী আরতি চক্রবর্তী এবং কল্যাণীয় শ্রীমান ভবানী মুখোপাধ্যায়। প্রুফ্-সংশোধনে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন শ্রীযুত পবিত্রকুমার রায়চৌধুরী।

পালা সাঙ্গ করিবার কালে মনে হইতেছে কবি-সঙ্গীতের সুধা-সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলি মাত্র গণদেবতার পূজার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলাম, কিন্তু মন তাহাতে তৃপ্ত হইল না। এ যেন শেষ হইয়াও শেষ হইতে চায় না। অন্ধকারের পার হইতে প্রভাতসূর্যের রক্তিমাভায প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্যস্নাত সেই অনাগত দিনের বন্দনা গান করিতে পারিয়াই নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

"শীলাবতী"
১৯এস/১/১এফ রাজা মনীন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৩৭
রামনবমী, শকাব্দ ১৭৮০

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীরামঃ ॥

শরণং

গীতরত্ন

গ্রন্থ

শ্রীরামনিধি গুপ্ত

রচিত

গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে
রাগ রাগিনী সহিত শঙ্কোলিত হইয়া

সন ১২৪৪ শালে

কলিকাতা বিদ্বন্মোদ প্রেষে
মুদ্রিত হইল ॥

এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺ নন্দরাম সেনের
ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।

রামনিধি গুপ্তের জীবিতাবস্থার একমাত্র গ্রন্থ "গীতরত্ন"-এর (১২৪৪ সাল) নামপত্রের প্রতিলিপি

ভূমিকা।

এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিলনা এক্ষণে সময় ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্ব সাধারণ গুণ গ্রাহি গণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ২ বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরি পূর্ম্মিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎ কৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তির দিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়া ছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানস ও রহিল। বঙ্গ ভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণ রূপে অভিনব নহে তথাপি এভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারেনা, এবং এই গীত সকলে আলাপ চারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দস্থানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিএ দেওয়া এমত নহে; অথচ

"গীতরত্ন"-এর ভূমিকা অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

দেশ বিদেশীয় পাঠক এবং বন্ধুগণের প্রতি প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।

শারীরিক রোগের প্রতীকার প্রার্থনায় এবং দেশ দর্শনের অভিপ্রায়ে গত অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তম দিবসে আমি কলিকাতার যন্ত্রালয় হইতে নৌকারোহণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ কয়েক মাস জলপথে ভ্রমণ করিলাম। ভ্রামক হইয়া ভ্রমণকালে স্থানে স্থানে সমূহ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। কি জলে, কি স্থলে, কি পর্ব্বতে, কি কাননে পরম কারুণিক পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আমারদিগ্যে রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার অনুকম্পায় সম্যক্ প্রকার সম্ভাবিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়াছি, ক্ষণকালের নিমিত্ত আপদে পতিত হই নাই, অত্যন্ত ভাবনার পরক্ষণেই আবার অপার আনন্দের সাগর সলিলে ভাসমান হইয়াছি। নূতন নূতন যত দেখিয়াছি ততই নূতন নূতন সুখের সঞ্চার হইয়াছে। নদী নদের সরল তরল লহরী লীলা, তরঙ্গ রঙ্গ, অতি সহজ ও অতি বঙ্কিম কুটিল গতি।—পর্ব্বত পুঞ্জের প্রকৃষ্ট তূসখালি, নেয়ামতি, সাহেবের হাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসায়ের, টাকী, শ্রীপুর, বাগুণ্ডী, পুঁড়া, খোড়গাছি, বাদুড়ে, বসুর হাট, চাঁদুড়ে, গোলাপনগর, বনগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, শিবনিবাস, হাঁসখালি ও রাণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন ও অভিনব নগর, গ্রাম ও গঞ্জ এবং তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ ছলে অতিক্রম পূর্ব্বক অদ্য এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইলাম। আমিই এপর্য্যন্ত প্রভাকরের ভ্রমণকারী বন্ধুরূপে গণ্য ছিলাম, এইক্ষণে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলাম। "ভ্রমণকারি বন্ধুর লিখিত বিষয়" এই উপাধির শ্রেণী মধ্যে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, এতদিন তৎসমুদয় মৎ কর্ত্তৃক রচিত ও প্রেরিত হইয়াছিল, বোধ করি তৎপাঠে তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তন্মধ্যে কতিপয় জিলা ও নগরের পুরাতন ও নূতন নূতন স্বরূপ ইতিহাস বিস্তৃত রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে আরো বর্ণিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে। আমি স্বয়ং সম্যক্ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদেশীয় বন্ধু

"ভ্রমণকারী বন্ধু"-র ছদ্মনামে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার প্রতিলিপি

সূচীপত্র

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার একটি লিপি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁহার স্বাক্ষর

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
ধরার অরুণোদয়,
আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক
তারকার গাহি জয়!
যে আলো কাঁদিছে ঊর্ধ্ব-ভুবনে—
সরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে
তারি এককণা মনের ভবনে
করিয়াছি সঞ্চয়,
তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
করিনু অরুণোদয়!

—মোহিতলাল

দেশ-কাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ মহিমাচ্যুতির আঘাতজনিত বেদনায় বড় বিষণ্ণ। ভারতবর্ষে বিদেশীর আগমন নূতন নয় সত্য কিন্তু ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন তাঁহারা কেহই পাশ্চাত্যের নহেন। মুসলমান হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন আক্রমণকারীর বেশে, বাণিজ্যের পথ ধরিয়া বিনীত আচরণের অন্তরালে আততায়ীর ভূমিকা লইয়া তাঁহারা আসেন নাই। ছলনাহীন ভাবে তাহাদের আগমনে আর যাহাই হউক না কেন হিন্দুস্থানের জনগণ তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মুসলমান-আক্রমণের এই রূপ-পর্যায় হইতেই ইংরাজ তথা পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর সহিত মৌলিক পার্থক্যের সীমারেখা বড় স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই পার্থক্য মুসলমান এবং ইংরাজের মধ্যেই সীমিত নয়, ইহা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতম পরিচয়। ইহার জন্যই পরবর্তীকালের ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসলমানগণ ভারতীয় বলিয়া নিজেদের পরিচিতি ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু ইংরেজ কোনদিনই ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই।

✓সম্রাট ঔরংজীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের যে ঘনঘটা বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রভাব পড়িয়াছিল তৎকালীন বাংলা দেশের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায়। এই বিপর্যয় বাংলা দেশের পক্ষে চূড়ান্তরূপে দেখা দিল যখন ঔরংজীবের প্রতিনিধি মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু ঘটিল। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হন। ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুবেদার হইলেন তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ। সরফরাজের অধীনস্থ বিহারের সহকারী-শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ সরফরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ঘেরিয়ায় তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে বাংলা দেশের যুগ-জীবন শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় শক্তি ক্রমশ শিথিল হইতে শিথিলতর হইতেছে। এইরূপ রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যেই লুণ্ঠনের দুর্বার গতি লইয়া দেখা দিল বর্গীর হাঙ্গামা। বর্গীর

হাঙ্গামার স্মৃতি বাঙালীর স্মৃতিপটে যে বেদনার লিপি ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছে, বাঙালীর নিকট তাহা বড় মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। তৎকালীন জনজীবনে এই হাঙ্গামার যে অভিঘাত উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় রহিয়াছে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-গ্রন্থে এবং গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'[১]। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, আলিবর্দী তাঁহার সৈন্যসামন্তগণ সহ পুরী এবং ভুবনেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া হিন্দু-মর্যাদার উপর যে আঘাত হানিয়াছিলেন তাহারই প্রত্যাঘাত আসিয়াছিল বর্গীর হাঙ্গামার মধ্য দিয়া। সত্য ঘটনার সহিত ভারতচন্দ্রের এই মন্তব্যের কতখানি সামঞ্জস্য আছে তাহা বলা কঠিন। তবে 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' গঙ্গারাম যাহা বলিয়াছেন তাহা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। গঙ্গারামের মতানুসারে ভারতচন্দ্রের মতই পুনর্বার সমর্থিত হয়। তাই এই আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালী জনচিত্তে আশা ও আশ্বাস জাগিয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বাংলা দেশে অত্যাচারী, পীড়নশীল মুসলমান শাসকগণের ক্ষমতা লুপ্ত হইবে এবং মুর্শিদাবাদের মসনদ হিন্দুর সিংহাসনে পরিণত হইবে। কিন্তু এই আশা অচিরেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। বর্গীর অত্যাচারে বাংলা দেশের জন-জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। তাহাদের অমানুষিক বর্বরতা লইয়া যে নরমেধ-যজ্ঞ বাংলা দেশের বুকে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন বর্ধমানের রাজসভা পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, সলিমুল্লা এবং গোলাম হুসেন। জনসাধারণের দুর্দশার কথায় গঙ্গারামের বর্ণনাও অনুধাবনযোগ্য :

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
গোঁসাই মোহান্ত যত চোপলায় চড়িয়া।
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধ্বনি
তলয়ার ফেলাইয়া তারা পলায় অমনি।
কায়স্থ বৈদ্য যত যে যে গ্রামে ছিল
বর্গীর নাম শুনি সে সব পলাইল।
সোনার বেনে পলায় জনরত্ন লইয়া
বোচকা বুচকি করি বাহুকে করিয়া।
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটুয়াতে
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে।

১ 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি অপ্রকাশিত পুঁথি।

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব যে যথা পলাইল।

গ্রাম্য ছড়ার মধ্যেও এই উপদ্রব-জনিত আর্তনাদ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইউরোপে যেমন নেপোলিয়নের নামের সঙ্গে ছেলেদের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার গান আছে, তেমনি বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামার গান,—

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥

এই খাজনা দেওয়ার সমস্যা যে কত মর্মান্তিক হইতে পারে, তাহাও একটি ছড়ার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ধান ফুরোলো, পান ফুরলো, খাজনা দেব কি।
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি॥

চৌথ, সরদেশমুখী রাজস্ব আদায়ের প্রথা তখন চালু আছে। কৃষির অবস্থা খুবই শোচনীয়। শ্রেষ্ঠ ফসল ধান তো নাই-ই এমন কি সামান্য আয়ের উৎপাদন পানও নাই! তাই খাজনা দেওয়ার চিন্তায় সাধারণ প্রজা ব্যাকুল ভাবে পাইকের প্রতি অনুরোধ করে কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার জন্য। রসুনের মত অতি সামান্য ফসলের প্রতি চাহিয়া আছে। সে জানে তাহার জীবনের উপর রাষ্ট্রের দয়া মায়া নাই। তাই রাজস্বের চিন্তায় সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রাম যাঁহারা ত্যাগ করেন নাই তাঁহাদের নিকট এই খাজনা দেওয়ার সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহার উপর বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিম বাংলার কৃষির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-বাণিজ্যের অবস্থাও অনুকূল ছিল না পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের উৎপাতের জন্য। বাংলা দেশের দুর্গতির এই চরম অবস্থায় ইংরেজ বণিকগণ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিল। এই চেষ্টা বাণিজ্যের বটবৃক্ষে নয় রাজচক্রের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও; কারণ তাহারা জানিত বাণিজ্যের ভিত্তি তাহাদের সুদৃঢ় নয়।[২] সুযোগ-সন্ধানী ইংরাজ সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই।

২ 'The English Army of traders in their march, ravaged worse than Tartarian Conqueror. The trade they carried on more resemble robbery than commerce. Thus this miserable country was torn to pieces by the horrible rapacity of the foreign traders'—(Burk's Impeachment speech 15-2-1787).

রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতা এবং আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি রোধ করিতে নবাব আলিবর্দী খাঁ সচেষ্ট হইয়াছিলেন হিন্দু-সামন্তভূস্বামীগণের সহায়তায় এবং বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজদ্দৌলাও সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতায় এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বরং সমগ্র দেশের মধ্যে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের সেই ধূম্র-মলিন প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতায় ইংরাজ বণিকশক্তি আপনাকে রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই আক্রোশ এতই তীব্র ও আবেগচালিত হইয়াছিল যে বিদেশী বণিকের সহিত গোপন চক্রান্ত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ১৭৫৪ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল স্কট তাঁহার বন্ধু মিস্টার নোবেলকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"The Jentu (Hindu) rajahs and the inhabitants were disaffected to the Moor (Mohammadan) Government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke'.[৩] হিন্দু জমীদার বা সামন্ত শ্রেণীর এই উদগ্র ইচ্ছার সহিত স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান প্রধানের সহযোগ ইংরাজকে পলাশির যুদ্ধে বিজয়ীর সম্মান আনিয়া দিল। ক্লাইভ মাত্র দুইশত শেতাঙ্গ সৈনিক ও পাঁচশত দেশীয় সিপাহী লইয়া মুর্শিদাবাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন সভয়-কম্পিত বক্ষে। মুর্শিদাবাদের অগণিত অধিবাসিগণ সেই শোভাযাত্রার দর্শনাকাঙ্ক্ষী মূক জনতার ভূমিকায় না থাকিয়া শুধুমাত্র ইষ্টক-যষ্টির দ্বারাও যদি রুখিয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে ইতিহাসের গতিপথ রূপান্তরিত হইয়া যাইত। এ সম্পর্কে বিলাতে ক্লাইভ পার্লামেন্টের সমক্ষে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'The inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones'.[৪] প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধ প্রহসনেরই পর্যায়ভুক্ত একটি ঘটনা মাত্র।[৫] দেশের লোক তখন নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার ভার বহিয়া ক্লান্ত।

৩ History of Bengal, vol II—Dr. Jadunath Sarkar. P. 454.
৪ Rise of the Christian power in India—B. D. Bose. P. 96.
৫ The British Impact on India—Percival Griffiths.

স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যর্থ কার্য-কলাপে সাধারণ প্রজার মধ্যে স্বাদেশিক মমত্ববোধ উদাসীনতায় পরিবর্তিত হইয়াছিল। সেই জন্যই এই রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াও বাংলা দেশের বৃহৎ জনমণ্ডলী সামান্যমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন পর্যন্ত করে নাই। যাহার ফলে, ইংরাজ-চালিত অপদার্থ মীরজাফর বসিলেন মুর্শিদাবাদের মসনদে।

রাজশক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের ফলে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনেও রূপবদলের কাজ ধীরে ধীরে শুরু হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণের কাল তখন অতীত যুগের স্মৃতি-কথায় পর্যবসিত হইয়াছে, এমন কি ভারতচন্দ্রও তখন পশ্চিম দিগন্তের সমীপবর্তী। বিশেষ করিয়া ইংরেজ অভ্যুদয়ের পর রাজন্য-পোষিত সাংস্কৃতিক-ইতিহাসের গতিপথ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র-শক্তির দুর্বলতা এবং ইংরেজ-অভ্যুদয়কে কেন্দ্র করিয়া সুযোগ-সন্ধানী এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইল। তাহাদের স্মৃতিপটে রহিয়াছে নবাবীয়ানার বিলাস-উল্লাসময় কেলি-কৌতুক-কথনের জীবন-নাটক-সংবাদ। আকস্মিক বিত্তপ্রাপ্তির আনন্দে তাহারা নবাবীয়ানার সুখ-সম্ভোগ-বাসনাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। এই তো গেল বিশেষ এক শ্রেণীর আর্থিক ও মানসিক বনিয়াদের যথার্থ পরিচয়। রাজন্যবর্গের নৈতিক মানদণ্ডও তখন উন্নততর পর্যায়ের ছিল না। গ্রাম অপেক্ষা নগরগুলিই ছিল বিলাস-ব্যসনের লীলাকেন্দ্র। কামনার বাষ্পে নাগর-জীবনের এই জীবন-উল্লাস বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুগ-সাহিত্যে তাহার সাক্ষ্য আজিও অম্লান হইয়া রহিয়াছে।

'The vivid pages of the Seir Mutaqherin has already made familiar to us the depth of luxury, debauchery and moral depravity of the period, and Ghulum Hussain in one place offers a few better remarks on the ethicality of Murshidabad.'

'It must be observed', he says, 'that in these days Murshidabad wore very much the appearance of one of Loth's town : and it is still pretty much the same to-day...Nay, the wealthy and powerful, having set apart sums of money for these sorts of amours, used to show the way and to entrap and seduce the unwary, the poor, and the feeble and as the proverb says,—so is the king, so becomes his

people—these amours got into fashion.'* ইহাই হইল তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার অন্যতম অধ্যায়।

বাংলার রাজশক্তি তখন দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব। মীরজাফরকে সম্মুখে রাখিয়া ইংরেজ শোষণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা রচনা করিলেন। ইহার ফলে মীরকাসিম হইলেন নবাব। কিন্তু কোন ক্ষমতার ব্যবহার তিনি করিতে পারিলেন না। সেইজন্য এই নামেমাত্র নবাবী তাঁহার সহ্য হইল না। ইতিমধ্যে ক্লাইভ স্বদেশ হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। ক্লাইভের কৌশলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। রাজস্ব সংগ্রহ এবং দেওয়ানী মকর্দমার বিচার কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল, কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সীতাব রায়ের উপর ন্যস্ত করিলেন। বাংলায় রেজা খাঁ ও বিহারে সীতাব রায় হইলেন কোম্পানীর প্রতিনিধি। নবাবের শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল; তিনি কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিজামতের কার্যভারও রেজা খাঁ ও সীতাব রায় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলা দেশের দুর্গতির আর সীমা রহিল না। সেকালের রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা হইতেই উপলব্ধি হইবে।

১৭৬১।২ খৃস্টাব্দে	১৩৯৫৯৫৯ পাউণ্ড		১৭৬৬।৭	„	৩১৮১৭৬৩ পাউণ্ড
১৭৬২।৩ „	১৩০৫৬৫২ „		১৭৬৭।৮	„	২৯৯৬৫৩৮ „
১৭৬৩।৪ „	১৩৬৬৪৬৩ „		১৭৬৮।৯	„	৩৯৩৩২৫৫ „
১৭৬৪।৫ „	১৮৬১৭২৬ „		১৭৬৯।৭০	„	৩২৮৭৭০৬ „
১৭৬৫।৬ „	১৬৬৬৩৩৭ „		১৭৭০।৭১	„	২৭৯৭১০৬ „

দেশের এই দুরবস্থার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে নামিয়া আসিল ১১৭৬ সাল বা ১৭৭০ খৃস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল ১৭৭২ খৃস্টাব্দে। ইংরাজ কর্মচারিগণের উপর ভার পড়িল রাজস্ব আদায়ের।

Every British Collector had still a native officer, chosen by the Committee of Revenue and styled Diwan joined with him in the superintendence of the land tax. The actual collection was managed

* Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. S. K. De. P. 29.

by the farming system, according to which tenders were invited for each Pargana, or fiscal division of a district. A settlement for five years (1772—1777) was concluded with the highest bidders, whether they were the privous Zeminders or not.[৭]

এই নীলাম ব্যবস্থাতেও বিশেষ কোন সুফল পাওয়া গেল না। যাহার ফলে, ১৭৮১ খৃস্টাব্দে Board of Revenue স্থাপিত হইল। ইহার সাহায্যে প্রতি জেলায় সমস্ত রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ কালেক্টরের হাতে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

হৃতশ্রী মুর্শিদাবাদ লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইল। আর, অন্যদিকে কলিকাতা হইয়া উঠিল বাংলার নূতন রাজধানী। কলিকাতার সভ্যতা, সংস্কৃতি হইয়া উঠিল সমগ্র বঙ্গের আদর্শস্থল। এই নূতন রাজধানীর দেশীয়তন্ত্রের সচিব-স্থানীয় হইলেন রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং, কাশীনাথ, কান্তবাবু প্রভৃতি ইংরেজ অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ। মুর্শিদাবাদের নবাবীয়ানার দ্রুত ম্লানায়মান ঔজ্জ্বল্যের ব্যর্থ অনুকরণের পুরোধা ছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ। একদিকে তিনি ছিলেন ইংরাজ অনুগৃহীত, অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কারের পরিপোষক। এই দ্বিবিধ বিপরীতধর্মী মানস-বৈশিষ্টের মধ্যেই প্রাচীন সাহিত্য ও সঙ্গীতের পোষকতায় রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন প্রধানতম উৎসাহী। তাঁহার পোষকতার ফলেই কুলুইচন্দ্র সেনের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছিল পূর্ণমাত্রায়। যাহাই হউক, কলিকাতার প্রাধান্য তখন সমগ্র বাংলায়। নব্যতন্ত্রের নব-প্রকাশনায় কলিকাতা তখন সকলের লক্ষ্যস্থানীয়। সেকালের ছড়াতেও ইহার অভিব্যক্তি যথার্থভাবে রূপ লাভ করিয়াছে।

ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি, যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল ; নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে, ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।

'দিশি চাল' না ছাড়িলেও 'বিলেতি চাল' দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এহেন কলিকাতার জীবন-রঙ্গে কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গেল। তৎকালীন দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজকে কেহ বা লইয়াছিল ত্রাণকর্তা

৭ Bengal Ms. Record. Vol 1, Hunter, (London 1894). P. 18.

রূপে, কিন্তু কেহই স্বার্থহীন ভাবে বিদেশীর প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করে নাই। অন্তরের এই সত্যভাব বিরূপতায় পর্যবসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনায়। ইহার পর ইংরেজ বড় সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। এদেশের উন্নতি বিধানের জন্যও তাহারা সচেষ্ট হইল। এই চেষ্টার পরিকল্পনা দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের মুখ চাহিয়া রচিত হইল। পাশ্চাত্যশিক্ষায় এ দেশীয় জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে পারিলে ইংরাজের প্রতি তাহাদের বিরূপ মনোভাব সহৃদয়তায় রূপান্তরিত হইবে, অন্যদিকে এ দেশের কল্যাণকামীর ভূমিকায় ইংরে[illegible] ঘোষণা করিতে পারিবে। শিক্ষার জন্য ইতিপূর্বে হেস্টিংস স্থাপিত কলিকাত[illegible]ম হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃস্টাব্দের সনন্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রতি এক লক্ষ টাক[illegible]র উন্নতির জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণত, ঐ অর্থ সংস্কৃ[illegible]রবী, ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইত। এই সময় রাজা [illegible]মোহন রায় এবং খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লর্ড মেকলে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন পণ্ডিত উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যভাষার অনুরাগী কয়েকজন ইংরেজ। অবশ্য প্রাচ্য ভাষার প্রতি দরদীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের অন্তরে ভয় ছিল যে ইংরেজী ভাষায় এদেশীয় লোক শিক্ষিত হইলে তৎকালীন ইউরোপীয় স্বাধীনতা-বোধ এদেশের জনসাধারণের লুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ ঘটাইবে। এই শঙ্কা যে পরবর্তীকালের ইতিহাসে সত্য-বোধের স্বীকৃতি-লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে স্থির হইল যে সরকারী তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হইবে। ইহারই অন্যতম পরিণতি হিসাবে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিয়া ইংরেজ সরকার দেশের কিয়দংশের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করিয়াছিল। যুগ পরিবর্তনের সকল লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপী ইংরেজ শাসনের ফলে তখন বাঙালী জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্য-শাসনে বাঙালী ইহার বহু পূর্বেই ইংরাজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের পূর্বে আমাদের সমাজ বা চিন্তাধারায় য়ুরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরিই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন

হইতে বাঙালী-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহার শেষ আজিও হয় নাই।'[৮] এই পরিবর্তনের নব প্রবাহে বাঙালীর নূতন করিয়া আত্মপ্রত্যয় জন্মিবার চেতনা আসিল। এই চেতনা দ্বিমুখী ভাবধারায় তৎকালীন বাঙালীর মানস-জগতে আলোড়ন আনিয়াছিল। পুরাতনকে অস্বীকার করিয়া নয়, নূতনের সহিত তাহার সমন্বয় সাধন করিয়া, একদল তথাকথিত প্রাচীন ভাবধারার অনুগামী জন-সমাজ সাহিত্যের পথে, চিন্তার জগতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর অন্যদিকে রামমোহন বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর পন্থানুসারিগণ [illegible] সংস্পর্শে আসিয়া বাংলাদেশের মাটীতেই কি চিন্তার ক্ষেত্রে, কি সা[illegible] বা জীবনের ক্ষেত্রে এক উপপ্লবের সৃষ্টি করিল। এই যুগের সাহিত্যে এই দ্বৈত[illegible]বের স্পর্শ সর্বত্র। বাঙালীর রস-চেতনায় নূতনত্বের স্বাদ আকর্ষণীয় হইলেও পুরাত[illegible]কবারে অবহেলিত থাকে নাই। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে ও তৎকালীন বাঙাল[illegible]অন্তর্জীবনে এই চেতনার আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যের ধারা ও কবিগান

॥ ১ ॥

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশের মধ্যেই ইহা বিস্তৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দৃঢ়-গ্রন্থি যে ইহার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় শিথিল হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য-কথনই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তা ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর রাজ-বংশের গুণকীর্তন করা। কাব্যটি তিনটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত, কিন্তু উপাখ্যানের ক্ষীণসূত্রে কাব্যত্রয় এককাব্যে রূপলাভ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্রের কাব্যও আট পালায় বিভক্ত, তবে এই পালা-বিভাগ সকল ক্ষেত্রে আখ্যান অনুসরণ করিয়া চলে নাই। মুকুন্দরামের দৈবনির্ভরতার যুগ তখন অস্তায়মান। দুইশত বৎসরের ব্যবধানে বাংলার সমাজ-জীবনে তখন কালান্তরের সূচনা অতিমাত্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু নবাবী আমলের শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণনগর-চন্দননগর-মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার নাগরসমাজ তখন ভারতচন্দ্রের কাব্য পরিকল্পনার ভাবাকাশ। এই নাগরিক-জীবন, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরের দরবারী জীবন জটিলতার আবর্ত-মুক্ত। সেইজন্য নবাবী ঐশ্বর্যের লালসা-তপ্ত পরিবেশে জীবন-পরিক্রমা তখন জীবন-শিল্পে পরিণতি লাভ না করিয়া জীবন-সম্ভোগে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রূপান্তরিত জীবন-কথার সাহিত্যিক-রূপপ্রকাশ হইল 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যায়িকা। আদিরসের তরঙ্গ-কৌতুক তখন বাঙালীসমাজের একমাত্র আনন্দ-প্রবাহ! মদন-মঞ্জরীর রূপ-প্রকাশ তখন জীবন বিকাশের বিলাস-কেতন। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী মহিমার পাঁচালী-কথন তখন মহিমাচ্যুত হইয়াছে। জীবন-বিলাসের কাব্য তখন জন-জীবনেরই জয় ঘোষণা করিয়াছে। "ভারতচন্দ্র সেই সমাজেরই কবি—সাধারণ ভাবের ঊর্ধ্বে তিনি উঠেন নাই, তাই সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সমাজের ঊর্ধ্বে উঠিলে সমাদরের জন্য হয়ত দিন কতক অপেক্ষা করিতে হইত।"[১] অবশ্য তৎকালীন যুগচিত্রের পটভূমিকায় ভারতচন্দ্রের কবি-কৃতির পৌর্বাপৌর্য বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কালান্তরের পটভূমিকায় কবি-প্রতিভা মহৎসৃষ্টির প্রতি যতখানি সচেষ্ট তদপেক্ষা

১ ভারতচন্দ্র রায়—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তখন

খণ্ড এবং যুগানুগ সৃষ্টির প্রতি তাহার আবেগ অধিকতর সচল। ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা তাই সহজভাবেই সেকালের প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়াছে। সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় 'বিদ্যাসুন্দর' সেইজন্যই 'খেয়ালী সৃষ্টি'র পর্যায়ভুক্ত নয়; পুরাতন কাব্যজগতের মোহ ভারতচন্দ্রকে গ্রাস করিতে পারে নাই। তিনি নবতর সৃষ্টির আবেগে যে কাব্যজগতের সন্ধানে অগ্র-পথিক হিসাবে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যসংগীতের 'আস্থায়ী' হইতে 'অন্তরা'র প্রতি চালিত হইয়াছিল এবং তাহাই যে পরবর্তী কাব্যকারগণের কুশলতায় 'তান' ও 'বাটে'র কাজ দিয়া 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' সহযোগে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

He knew the world and its affairs as no predecessor of his ever did. He paints a harrowing picture of the limitless anarchy of his time, which proclaims loudly that the old order must change giving place to new, if the Bengali people were to live and grow. In a lyric[২] of rare beauty and sincerity, Bharatchandra addressing his God says that the game you play every day is not good for every day. So play something new after my heart. His prayer was heard and within a year of the poets' death (?), the battle of Plassey was fought and won by the English.[৩]

("ভারতচন্দ্র যে সুরে ঘা দিলেন, সে সুর কাকলীর সৃষ্টি করল! ছন্দের বৈচিত্র্য, গানের ভাণ্ডার যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠল। কবি, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, নানাছন্দে নানাবন্ধে গীতি-কবিতা, পল্লবে পল্লবে উঠল বিকশিত হ'য়ে। রাম বসুর কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রামপ্রসাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা—এই অনুবন্ধ আমাদের নিয়ে আসে ঈশ্বর গুপ্তের হাসির কবিতার মধ্যে দিয়ে একেবারে বঙ্কিম-যুগ পর্যন্ত। তারপর রবীন্দ্র-যুগেও কি তার রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না? গানের রাজত্ব বাঙালীর

২ গীতাংশ: নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাহ, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে, সে মত চাহ হে। —বিদ্যা

৩ The story of Bengali Literaturo—Pramatha 'দত্ত'.
৮ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বেই (১৭৬০ খৃঃ) ঘটিয়াছিল পলাশী

সেই দিন থেকে আরম্ভ হয়েছে, যেদিন অন্নদামঙ্গল রচিত হ'ল। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত একটানা ছুটেছে গানের প্রবাহ, যা বঙ্কিমের যুগে রূপায়িত হ'য়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে বাঙালীকে ভারতকে ও জগৎকে গীতি-কবিতায় ধনী করেছে।"[৪]

॥ ২ ॥

ভারতচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের রূপ বড় বিচিত্র রকমের। তৎকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বিদ্যাসুন্দর'-কে অতিক্রম করিয়া যাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারতচন্দ্রের প্রভাব তখন উন্নততর সাহিত্য-চেতনার প্রয়াসকে স্তব্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা কাব্যের প্রাচীন যুগ হইতে রোমান্টিকতার প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত আপনার সীমা রেখা প্রসারিত করিয়াছে। বৈষ্ণবযুগের রাধাকৃষ্ণ-বিরহ-মিলন-কথার আধারে প্রণয়ের পটভূমিকায় ইহার প্রকাশ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনার কল্প-লোক হইতে রোমান্টিক-কাহিনী-কাব্যের মৃত্তিকা-গন্ধী নব প্রয়াস কখন যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল তাহার সন্ধান লইতে হইলে প্রাচীন বাংলা কাব্যের মুসলমান কবি-মানসের পরিচয় লওয়া একান্ত আবশ্যক। 'রোমান্টিক কাহিনীকাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল।'[৫] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের এক মুসলমান কবি মুসলমানদের কবি-সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত বিশিষ্ট প্রণয়-মূলক কাহিনী-কাব্যের এক তালিকা পেশ করিয়াছেন।

খারাব করিল কত আশকের তরে
জেলেখা খারাব হইল ইউসুফ উপরে।
লায়লি উপরে মজনু হৈল আশক
সংসার বিখ্যাত যার আশকি সাদক।
শিরি ও খোসরু ফরহাদ তিন জনে
আশক হইয়া মরে প্রেমের কারণে।
দামন উপরে নল আশক হইল
তীর পরে মনোহর মজিল।

ৼ
সমা
পটভূমি
হয় যে কা… …শ্বর পটভূমিকায়

১ ভারতচন্দ্র রায়—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। …ন সেন।
…ব সেন।

বদরে-মনির উপরেতে বেনজীর
হাসেন বানুর পরে আশক মনির।
হাতেম তাহার লাগি ফেরে বার সাল
কত মুস্কিলেতে আনে সে সব সওয়াল।
গোলে-বকাওলি পরে তাজল-মুলুক
আশক হইয়া কত ফিরিল মুলুক।
কামকলা লাগি হৈল কুঙার বেহাল
সয়ফুল-মুলুক পরে বদি উজ্জামাল
মেহের-নেগার পরে আশক আমীর
লড়াই করিল হদ্দ এশ্‌কের খাতির।[৬]

আশক-খারাবির ক্ষীণ ধারার সহিত বিদ্যা ও সুন্দরের রতি-বিলাস কাহিনীর কাব্য-কৌতুক, ভারতচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা-কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণধর্মী প্রণয় কাহিনীমূলক আখ্যান-কাব্যের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। জনরুচির সঙ্গে এই কাব্যগুলির অন্তর . ধর্মের এক অপূর্ব যোগাযোগ ঘটিয়াছিল; যাহার ফলে, এই শ্রেণীর আখ্যান কাব্যের বহুল প্রকাশ সেকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সংবাদ। ভারতচন্দ্রের ভাষায় আরবী, ফার্‌সী শব্দের বহুল প্রয়োগ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান কবিগণের রচিত প্রণয়াখ্যায়িকাগুলির ভাষাতেও এইরূপ ভাষার ব্যবহার বহু পূর্ব হইতেই চালু ছিল। তাহার প্রভাব যে ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার পরবর্তীকালের কবি-সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর কাঠামো ঈষৎ বদল করিয়া রস বস্তুকে প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়া পরবর্তী-কালের অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয় ত বা সে সকল কাব্য প্রচুর জনপ্রিয়তাব অধিকারীও হইয়াছিল, কিন্তু, সাহিত্যের দরবারে তাহাদের স্থায়িত্ব বড় অল্পকালের। কালীকৃষ্ণ দাসের[৭] 'কামিনীকুমার', কাশীপ্রসাদ কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত', খলিলের 'চন্দ্রমুখী', রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' প্রভৃতি আখ্যায়িকা কাব্যগুলি উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থক।

কোন পণ্ডি

৬ ইসলামী বাংলা সাহিত্য—ডক্টর সুকুমার সেন।

৭ ১৭৮৩ শকাব্দে 'চিতপুর রোড বটতলা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।'

তিনজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা—কালীকৃষ্ণ দাস, বৈদ্যনাথ ... অর্জুন

॥ ৩ ॥

প্রণয় কাহিনীমূলক আখ্যায়িকা কাব্যের ধারার পাশাপাশি ভারতচন্দ্রের পরবর্তী-কালীন বাংলা সাহিত্যে অপর একটি শাখার ক্রমাভিব্যক্তি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই শাখা মূলত গীতি-প্রধান।

প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—গীতি-প্রধান্য। জয়দেব 'গীতগোবিন্দে'র মাধ্যমে কাব্যের লীলাভূমিতে গীতের নায়কত্ব অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। সমগ্র প্রাচীন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কোন যুগেই তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই গীতি-প্রাধান্য, মঙ্গল-নাট-গীত-পাঁচালীর মধ্য দিয়া কবিগানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আসিয়াছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ প্রভাব-বর্জিত বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানের গীতি-প্রাধান্য অনস্বীকার্য। ঐ যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি-নির্দেশ করিতে গিয়া পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহার অন্যতম ধারা হইল প্রণয় কাহিনী-মূলক আখ্যায়িকা কাব্যের ধারা। ইহা ব্যতীত অপর ধারাটি হইল গীতিপ্রধান কাব্যসাহিত্যের ধারা। গীতিপ্রধান কাব্য-সাহিত্যও সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষেত্রে দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। কাহিনীর সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত গীতিময় কাব্য, যথা—পাঁচালী কাব্য এবং গীত-সর্বস্ব শাখা যাহার সাহিত্যিক রূপ হইল কবিগান। কবিগানের গানই মুখ্য, কাহিনীর বৃত্ত ইহার কোন অংশেই সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। রাধাকৃষ্ণ কিংবা শিবদুর্গার বিচিত্র জীবন-নাটক-সংবাদের খণ্ডচিত্র এগুলির রসবস্তু, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এই খণ্ডচিত্রগুলি ক্রমিক রস-পর্যায়ের মধ্য দিয়া সামগ্রিক-আবেদন-ধন্য পরিপূর্ণ রসলোকের সৃষ্টি করে নাই। এই খণ্ডাংশ-কথনের মধ্য দিয়া এগুলির সহজ-বৈশিষ্ট্য সরলতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য-পোষিত বাংলা সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখী হইতে বাধ্য হইল। এখন হইতে সাহিত্যের পোষকতা সাধারণের মাধ্যমেই হইতে লাগিল। মঙ্গলকাব্যের বিদায়ী-সুর তখন অতিমাত্রায় স্পষ্ট ও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের বেড়াজাল ভাঙিয়া গীতিময় পাঁচালীর চলন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও তৎকালীন জনসমাজের [illegible]তনা তৃপ্ত হইতেছিল না। তাহাদের আত্মজগতকেই কাব্যের জগতে রূপ দিবার [illegible]ছিল। এই অন্তর্মুখী সাহিত্য-চেতনার রূপ-প্রকাশ ঘটিয়াছিল [illegible]য়, বৈষ্ণবপদাবলীর সূত্র ধরিয়া মানবজীবনের এক একটি [illegible] কলঙ্কে কলঙ্কী হইবার শ্লাঘা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে

বিশ্বমানবতার পরিকল্পনা—বৈষ্ণবপদাবলীকারগণের নিকট পরম-পূজ্যবস্তু। কবিগানের মধ্যে ধর্মের সেই মহনীয়তা নাই; কিন্তু প্রেমরসের স্নিগ্ধ দ্যুতি ইহার সকল স্থানে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যে এগুলি পরিকল্পিত এবং পরিবর্ধিত হয় নাই বলিয়াই জীবন-বেদনার রসরূপটি ইহার মধ্যে এত সুন্দর ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। জীবন-চেতনাই—ইহার কাব্য-চেতনা। আগমনী-গানের সূচনা-লগ্ন এই জীবন-বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত আর তাই অন্তর্মুখী জীবনবোধের সাহিত্যায়ন সুপরিকল্পিত কাহিনীর আবেষ্টনীতে বদ্ধ না থাকিয়া ভাবের তরণীতে ভর করিয়া রাধাকৃষ্ণের সুখ-দুঃখের কয়েকটি অধ্যায় মাত্র অবলম্বন করিয়া কবিগানের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজ-প্রভাব তখন দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসমাজ পুরাতনকেই সংস্কৃত করিয়া ইংরেজ প্রভাব বর্জিত অবস্থায় অপর কিছু সৃজনের আবেগে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই বলিয়াই অন্তর্মুখী-রসচেতনা বা জীবন-চেতনা লইয়া কবিগান সেকালের আসরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। তাই কবিগান, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে আসিয়া তৎকালীন সাহিত্যাকাশের মধ্যাহ্ন দীপ্তিকে পঙ্গপালের ধূম্রজালে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে নাই। সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই ইহার জন্ম।

॥ ৪ ॥

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' নামক প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩০২ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৮]

> বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালারদের গান! ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবিগানও সেইরূপ একসময় বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণ স্থায়ী গো- আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোন প- না, এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

৮ পরে এই প্রবন্ধটি 'কবি-সঙ্গীত' নামে 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্-

কবিগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানত প্রণাম জানাইয়া এই মন্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সাহিত্যের ক্রমবিকাশের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যতীত ফলশ্রুতি কোন ক্ষেত্রেই আকস্মিক হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কবিগানের যুগগত ভিত্তিভূমিতে ইহার উদ্ভব কি ভাবে হইয়াছিল তাহা আমাদের অজানা নয়। পঙ্গপালের মত ইহারা আসে নাই বা মধ্যাহ্ন আকাশকে অন্ধকারে ঘনীভূত করিবার পূর্বেও ইহারা অদৃশ্য হইয়া যায় নাই—তাহার প্রমাণ, বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। কবিওয়ালাদের নিকট হইতেই আধুনিক বাংলা কাব্য অন্তর্মুখী ভাব-চেতনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। উনিশ-শতকের অন্যতম যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেও কবিওয়ালাদের প্রভাব স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কবিগুরু কবিওয়ালাদের গানের ভাব ও ভাষার উপরেও যে ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহাও মানিয়া লওয়া যায় না। ঐ সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :

'......ভারতচন্দ্রের পরে যখন রাজসভার পণ্ডিতবর্গের প্রশংসার গণ্ডী ছাড়াইয়া বঙ্গভাষা জনসাধারণের দুয়ারে উপস্থিত হইল, তখন সংস্কৃতের তোড়জোর ও আসবাব তাহাকে কতকটা ছাড়িয়া আসিতে হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং জনসাধারণের ভাষাও আর তখন ময়নামতীর গানের ভাষার মত একেবারে পাড়াগেঁয়ে রকমের ছিল না।

এইবার সংস্কৃত ও বাংলা এই দুই ভাষার মিলন ঘটাইয়া বাংলা প্রাকৃতের জোর কোথায় তাহা নির্দেশ করিবার সময় হইল। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা—এমন কি পাঁচালীকার ও তর্জা রচকেরা—এইবার সেই সুযোগ সন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন; কারণ তাঁহারা এবার শুধু রাজা ও পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসাপত্রের প্রত্যাশী নহেন, এখন তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত। তাহারা ব্যাকরণ মানে না, ব্যাস বাল্মিকীর মর্ম তাহারা বোঝে না, তাহাদের কাছে 'বাহাবা' নিতে ...বিকে শুধু কথিত ভাষারূপ অস্ত্রই ব্যবহার করিতে হইবে। আগেকার ...ব ভাষাগ্রন্থে সংস্কৃত কোন কাব্য বা শ্লোকের ইঙ্গিত দিলেই পণ্ডিতেরা ... এখনকার বিচারকগণ এক হিসাবে শক্ত। তাহাদিগকে শুধু ...শ রাখিতে হইবে, পাণ্ডিত্য এ হাটে বিকাইবার নহে। এই

ক্ষেত্রে কবিরা অসামান্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপ্রাস লইয়া অনেক পণ্ডিত পরিহাস-রসিকতার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সংখ্যাতীত প্রণিপাত জানাইয়া আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই বাংলা-কবিদের অনুপ্রাসের জোরটা কোথায়, তাহা তাঁহারা সন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন কি ?

শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু কবিদের এই অনুপ্রাস দেওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"সঙ্গীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে, তখন তাহাতে রাগ-রাগিণীর যতই অভাব থাক্, তাল-প্রয়োগের খচ্‌মচ্‌ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। এক শ্রেণীর কবিতার অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার ফল। সাধারণ-লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় আর নাই।"

(এই শ্রেণীর লেখকদের……ভাষা আলোচনা করিলে এই অনুপ্রাসের রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইবে। (ইঁহাদের)……গানগুলি নানা রাগ-রাগিণীর লীলাক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে। কোন সময় তালের দ্রুত ছন্দ, কোথাও মন্থরগতি, লোভা ও দশকুসীর করুণ বিলাপাত্মক ছন্দ ও খয়রার বিদ্রুত চঞ্চলতা,—এ সমস্তই ভাবের অনুসরণ করিয়া বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে।) এই গানগুলি "সঙ্গীতের বর্বরাবস্থার" নহে, ইহা ভাবুক ও পণ্ডিতগণের পরম উপাদেয় হইয়াছে, সুতরাং এগুলিতে "অশিক্ষিত চিত্ত মাতিয়া উঠে নাই।"

……আমি একথা বলিতেছি না যে সব জায়গায়ই অনুপ্রাসগুলি খুব উচ্চাঙ্গের কবিত্বসূচক হইয়াছে, কিন্তু বহুস্থানে যে তাহা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; অনেক স্থলে সেগুলি এরূপ সহজভাবে আসিয়াছে যে কবি সেগুলি কোন চেষ্টা করিয়া আনেন নাই—তাহা অনুপ্রাস বলিয়া চোখে ঠেকিবে না, অথচ অনাড়ম্বরে সেগুলি ভাষায় লালিত্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

……কবিগণের প্রতি শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রবাবু যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই নিকট পীড়াদায়ক হইবে। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসুও একজন ছিলেন, যিনি নববধূর বিরহ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি ক'রে বলা হোল না,
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

এই কয়েকটি ছত্রে আধফোটা কলিটির সুবাসের ন্যায় বঙ্গীয় বধূর নবজাত সলজ্জ প্রেম যেন ভয়ের সহিত আধ-কথায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার পরের দুই ছত্র অতুলনীয়।

হাসি হাসি আসি যখন সে 'আসি' বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন-জলে।

—সে এরূপ নিষ্ঠুর, যে বিদায়ের সময়ও তাহার মুখে হাসি আসিয়াছিল। সেই হাসি দেখিয়া নববধূর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় রাখিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না
এ যে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

—এ যে বঙ্গ-কুটিরের সেই ফুল-কলিকার প্রেম। বাংলা ঘরের নববধূ অপর যাহাই হউন না কেন, তিনি বক্তৃতাদায়িনী ছিলেন না।

তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনী,
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।

তার হাসি মুখ দেখে কান্না আসিল; কিন্তু সে কান্না তাঁহাকে দেখিতে দিলাম না, মুখ ঢেকে চোখের জল সামলাইয়া লইলাম। এই কবিতার সমস্ত অপূর্বত্ব শেষ ছত্রের "অনায়াসে" শব্দটিতে। সে অনায়াসে চলিয়া গেল, অথচ আমার প্রাণ ছিঁড়িয়া গেল।

কবিদের এইরূপ শত শত পদ আছে, যাহার তুলনা নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"উপস্থিত মত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ উপন্যাস ও ঝুটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে; ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।"

কবি-সম্রাটের এই আদেশবাণী আমরা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলাম না। এই অপরাধে যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়—তাহা তিনি করিবেন।"৯

৯ কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর ভূমিকা অংশ পৃঃ ৪৪—৫৭

রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত আচার্য দীনেশচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন প্রতিবাদ করেন নাই। আচার্য দীনেশচন্দ্রের সত্যদৃষ্টিতে যাহা যথার্থ বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই। কবিগানের ভাব, ভাষা এবং প্রকৃতি—আধুনিক বাংলাকাব্যের উৎসমুখ। যে যুগে ইহাদের আবির্ভাব সে যুগ বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের খর দীপ্তি লইয়া বিরাজমান ছিল না, আর, কবিগানও অতর্কিতে পঙ্গপালের মত আকাশ মসীলিপ্ত করিয়া ফেলে নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুস্পষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া এগুলি বিকাশলাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইহার যৌবনকাল। এই সময়কার সৃষ্টিকে পঙ্গপালের সহিত তুলনা করিলে নিতান্তই অবিচার করা হয়। কবিগান নিঃশেষে 'অদৃশ্য'ও হইয়া যায় নাই। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাকালে বসিয়া আজিও আমরা কবিগানের ক্ষীণধারার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। গ্রামে গাঁথা বাংলা দেশের জীবন-চর্যায় এগুলি নিম্নমূল্যের বলিয়া স্বীকৃত হইলেও সমগ্রদেশের যুগ-জীবনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এগুলি অবহেলার সামগ্রী নয়। তা ছাড়া উনিশ শতকের যে যুগে এগুলি পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল সে যুগটির প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

রাজন্য-পোষিত বাংলা সাহিত্যের কাল তখন বিদায় লইয়াছে। সাধারণের আসরে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' রচনার তাগিদ কবিওয়ালারা অনুভব করেন নাই, গণদেবতার পূজার উপচার হিসাবে অন্তরের ভক্তি-চন্দনে সঙ্গীত-কুসুমের অর্ঘ্য তাঁহারা সাজাইয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের মত 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র গঠন-পরিপাট্যের বিন্যাস ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল না। পরিপূর্ণ কাহিনীর আধারে এগুলি রচিত হয় নাই বলিয়া বাংলার কাব্যকাননে ইহাদের জীবন-মর্মর কখন যে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে তাহা দুর্নিরীক্ষ্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পাঁচালী এবং কবিগান উভয়ের মধ্যেই গীতি-প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কিন্তু পাঁচালী, কাহিনীর আধারে রচিত বলিয়াই ইহার অস্তিত্ব-রক্ষণ অসম্ভব হয় নাই। গীতি-সর্বস্ব কবিগানের স্বধর্মানুযায়ী ইহার ভাগ্যচক্র পৃথকভাবে আবর্তিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে। যাহাই হোক্, যথার্থ বিচারের ক্ষেত্রে, কবিগানের যুগ—আধুনিক বাংলা কাব্যের জীবন-ভূমি। বিদ্যাসুন্দরের রতি-বিলাস-কূজনের উল্লাসময়তা অবলম্বন করিয়া প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্যের যে ধারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবহমান ছিল, তাহার পাশাপাশি যদি কবিগানের কলস্বন না জাগিয়া উঠিত তাহা হইলে ইংরেজপ্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

পর্যন্ত এই রতি-বিলাপ বা মদন-মঞ্জরীর উল্লাসময়তা সহ্য না করিয়া উপায় ছিল না। তৎকালীন যুগের সৎ-চেতনা হইতেই কবিগানের জন্ম। ইংরেজ প্রভাব-বর্জিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাসাহিত্যের উৎকর্ষতার সামগ্রিক পরিচয়ের অনুসন্ধান করিলে কবিগানের রাজ্যে না আসিয়া উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের উত্তরকালীন ইংরেজ-প্রভাব-বর্জিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—কবিগান।

কবিগানের সঙ্গীততত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিত মতো জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহার উপরে আবার চার জোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার—বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারেন না।'

কথার কৌশল এবং অনুপ্রাসের ছটা সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্পর্কিত বিষয় এবং ইহার সঙ্গীত-সার্থকতা সম্পর্কে গতযুগের কবি-সমালোচক আনন্দচন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

"কবির গানের সম্বন্ধে বাবুদিগের ধারণা বা সংস্কার অতি অদ্ভুত। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অবধি আর ভাল কবির গান শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাতেই বাংলার বর্তমান কৃতবিদ্যগণের অধিকাংশ ব্যক্তি কবির গান কি তাহা জানেন না। তাঁহাদিগের দুইটি অদ্ভুত ধারণা আছে। একটি ধারণা এই যে, কবির গানে কেবল চেঁচামেচি। দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা এই যে, যদি কবির গানে কিছু ভাল থাকে, তাহা হইলে বাদ-প্রতিবাদ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও রসিকতা। চেঁচামেচি কবির গানের মিথ্যা অপবাদ। কবির গানে চিতেনটা খুব উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে হয়।......চিতেনের পর অন্তরাতে যখন সুর নামিয়া আসে, তখন সুগায়কের কণ্ঠে যে মধু বর্ষণ হয়, তাহা সম্ভোগ করিয়া তাঁহারা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।......কবিগানের কোন কোন স্থলে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও রসিকতার পরিচয় দেওয়া হইত, তাহার তুলনা নাই; কিন্তু কোন তাদৃশ রসিকতাই কবির গানের একমাত্র ভাল জিনিস নহে। উহাতে এত ভাল জিনিস আছে যে, ভাল একখানা গান শুনিলে, শ্রোতার মত শ্রোতা হইলে, গান শুনিতে শুনিতে তিনি কখনও ভক্তিতে বিগলিত, কখনও করুণাশ্রুসিক্ত, কখনও উৎসাহে উদ্দীপ্ত, আবার কখনও হাস্যরসে প্লাবিত হইতে পারেন।"[১০]

[১০] সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১২ সাল।

আভিজাত্য-পরিবর্ধিত গৌরব-শিখরাসীন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লইয়া আশ্চর্য-সুন্দর ভাষায় আবেগভরে কবিগানের ললাটে যে কলঙ্কের তিলক পরাইয়া গিয়াছেন তাহার রেশ আজিও মিটে নাই। কিন্তু সত্যের আলোক চির-সমুজ্জ্বল। সে আলোক-স্পর্শে ব্যক্তিত্ব মহিমার আবরণে কোন কিছুরই সত্যমূল্য বা পূর্ণমূল্য অস্বীকৃত হইয়া অবহেলিত ভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে না। কবিগান পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে গতিমুক্ত করিয়াছে, ইহার প্রাণরসে পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য অভাবিত সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে; সেইজন্য সাহিত্যের ধারায় কবিগানকে সম্বর্ধিত না করিয়া উপায় নাই।

কবিগানের ইতিহাস

॥ ১ ॥

কবিগানের সূচনা-পর্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কবিগানের আদি সংগ্রাহক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে যে তথ্য আমাদের দিয়াছেন সর্বপ্রথমে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তিনি রামনিধি গুপ্ত প্রসঙ্গে এই বিষয়ের অবতারণা করেন ১লা শ্রাবণ সংখ্যার (১২৬০ সালের) সংবাদ প্রভাকরে। ১লা ভাদ্রের পত্রিকাতেও এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি নূতন সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন। যথাক্রমে দুই তারিখের তথ্যই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"১২১০ সালের পূর্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে 'আখড়াই' গাহনার অত্যন্ত আমোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখ্ড়াই বিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখ্ড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, অথচ এই মহাশয়কে তাঁহারদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান কহিতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে যুক্ত করত নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ঐ কুলুইচন্দ্র সেন ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল ছিলেন। আখ্ড়াই গীতের ইনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

"১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখ্ড়ায়ী আমোদে আমোদী হইলেন, তখন শ্রীদাম দাস, রামঠাকুর ও নসীরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই আখ্ড়াই সঙ্গীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

"১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখ্ড়াইদলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্র সন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটা নিবাসি ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও

তাহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন। আখ্‌ড়াই যুদ্ধের স্থিরতার নাম "বদী" ও পক্ষ প্রতিপক্ষের নাম "বাদী" এই উভয়দলে "বদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজনে গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সঙ্গীত সংগ্রাম শ্রবণ দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোকে অপর্যাপ্ত আনন্দ সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সখের আখ্‌ড়াই স্থাপিত হইল, ব্যবসায়ীদিগের আখ্‌ড়ায়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।

"সখের আখ্‌ড়ায়ের এতদ্রূপ সূত্র সঞ্চার হইলে কিছুদিন পরে অনেকেই তদ্বিষয়ে অনুরাগী হইলেন। পাতুরেঘাটাস্থ মহামান্য ঠাকুর বাবুরা যোড়াসাঁকো পল্লীস্থ সুবিখ্যাত সিংহ বাবুরা গরাণহাটা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ৺বাবুমোহন বসাখ, শোভাবাজারস্থ খ্যাতাপন্ন ৺কালীশঙ্কর বাবু এবং ৺দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু ইঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটা দল করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারদিগের সকলেরই সহিত বাগবাজারের দলের দুই একবার করিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এমত শুনিতে পাই, সেই সমস্ত সমরে বাগবাজারের পক্ষেই অধিক সংখ্যায় জয়লাভ হইয়াছে, কারণ এ পক্ষের সুর ও গীত বিষয়ে ৺রামনিধি গুপ্ত এবং গাহনা পক্ষে অদ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রভৃতি গায়ক, সুতরাং দুই দিক উত্তম হওয়াতেই বাগবাজারের জয়ের সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু ইঁহারা নিতান্তই পরাজয় হয়েন নাই, এমত নহে, গাহনা বাজনার জয় পরাজয় "হাওয়ার" উপরেই নির্ভর করে। গীত, সুর ও গায়ক, এই তিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও এক একদিন 'হাওয়ার' দোষে জমাট হয় না, ফাঁকে ফাঁকে উ[illegible] যায় [illegible] যাঁহারা সকল বিষয়ে অপকৃষ্ট দৈববশতঃ 'হাওয়ার' [illegible]র পাহারা এমত 'লগ্ন' করেন যে তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই সীমাশূন্য সন্তোষ-সাগরে ম[illegible]দৌড় [illegible] থাকেন, বিশেষতঃ রাগরাগিণীর খেলা ছেলেখেলা নহে, অতিশয় কঠিন। [illegible] সময়ের যে রাগ, সেই সময়টি না হইলে সে রাগের রাগ থাকে না, ইহাতে সময়ের [illegible] সাঙ্গ জন্য রাগের অনুরাগ না হইয়া সহজেই বিরাগ হইতে পারে। যাহা হউক [illegible]। [illegible]ই পরস্পর জয়ী ও যশস্বী হইবার জন্য যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সাধ[illegible] 'ঠাকুরালি' করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোন বার বাগবাজারের দল পরাভব হই[illegible] অবিকন্তু তাঁহারা কোনবারে সর্ব্বতোভাবেই পরাভব হয়েন নাই।

[illegible]? এই [illegible]র বাসী সর্ব্বত্র বিখ্যাত শ্রীমান্ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রথমেই আখ্‌ড়াই গা[illegible]ন সৃষ্টি [illegible] গায়কের পদে ব্রতী হয়েন নাই, যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন জাল [illegible]দশায় [illegible]হার কতিপয় বৎসর পরেই তিনি প্রধানের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালির

মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গলা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিধুবাবু ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, তাঁহার কৃত কি 'আখ্ড়াই' কি 'টপ্পা' ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন। মোহনচাঁদের স্বর শ্রবণে আহা, আহা শব্দে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। এই মহাশয় স্বয়ং আখ্ড়ারের সৃষ্টি করত বঙ্গদেশস্থ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন, এবং দাঁড়া কবির যে সকল সুর ও রথ, দোল এবং সঙ্কীর্তন প্রভৃতির যে যে সুর করিয়াছেন, তাহাই পীযূষ পরিপূর্ণ। যদি বীণাযন্ত্রের বাদ্য শ্রবণে লোকের অরুচি হয় যদি কোকিলকুলের সুমধুর কুলুধ্বনি শ্রবণে বিরক্তি জন্মে—যদি মধুকরের মধুমিশ্রিত ঝঙ্কার রব বিষ বোধ হয় তথাচ মোহনচাঁদ বাবুর সুর ও স্বর শুনিতে মুহূর্তকালের জন্য কাহারো মনে বিরক্তি জন্মে নাই, বরং ক্রমে লালসার বৃদ্ধিই হইয়াছে। কি কলিকাতা, কি তন্নিকটস্থ সমস্ত গ্রাম, কি দিল্লী, কি লাহোর ইত্যাদি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে যে স্থানে বাঙ্গালি বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই স্থানেই বসু বাবুর গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে ও নাম জাগরূক রহিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা তাঁহার প্রণীত সুর গাহিয়া সর্বদাই আমোদ করিতেছেন। এই মহাশয় কন্দর্পের ন্যায় অতি সুপুরুষ ছিলেন, ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র, কারণ পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে পূর্বে দেখিয়াছেন এবং এইক্ষণেও দেখিতেছেন। হায় কি দৈব-বিড়ম্বনা! রসের দোষে অধুনা তাঁহার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই, সে ভাবভঙ্গি কিছুই নাই যেন সে তিনি আর তিনিই নহেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কখনো শয্যাগত, কখনো কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেছে[illegible]
অবস্থাতেও যিনি তাঁহার গান শুনিবেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া সাধুবাদ | নিকট সম্বন্ধীয়
অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করি, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি | সেই প্রণালীই
পূর্ববৎ আরোগ্য প্রদান করুন।

"যদিও দৈবশক্তি দেবীর অনুগ্রহেই মোহনচাঁদ বাবুর এতদ্রূপ নাম স| ায়ী আমোদে
হইয়াছে, তথাচ ৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কেই তাঁহার সর্ববিষয়ের | তি কয়েকজন
হইবেক, কেন না তাঁহারি দ্বারা শিক্ষা ও তাঁহারি দ্বারাই সংস্কার। | বিশেষ পণ্ডিত
মোহনচাঁদ বাবুকে নিধুবাবুর 'খাস ভাণ্ডার' কহিয়া থাকে।

"এই স্থলে কেহ এমত আপত্তি তুলিতে পারেন যে, মোহনচাঁ| আখ্ড়াইদলের
যোড়াসাঁকোস্থ বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং পাতুরেঘাটার বাবু রা| সন্তান এবং
প্রভৃতি কয়েকবার 'হাফ আখ্ড়াই' করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কথাই | মহাশয় ও

কখনই হাফ-আখ্‌ড়াই বলা যাইতে পারে না, কেন না তাঁহারা 'পেসাদারি দাঁড়া কবির সুরে' গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন। মোহনচাঁদ আখ্‌ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ-আখ্‌ড়ায়ের নূতন ধরনের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবার রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধহয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটির থাম পর্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে যোড়াসাঁকো ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তনুসারে সুর প্রস্তুত করণ শিক্ষিত হইলেন, তথাচ তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

"আখ্‌ড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, যাঁহাদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়-পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাজিয়া আনন্দপূর্বক গমন করিতেন। উভয় পক্ষেই তিনটি করিয়া গীত গাহিতেন, প্রথমে এক একটি 'ভবানী বিষয়' পরে এক একটি 'খেউড়' সর্বশেষে এক একটি 'প্রভাতী' সর্বদাই দুই দলে যুদ্ধ হইত; কোন কো[illegible] বার ভিন্ন দলেও সংগ্রাম চলিয়াছে। 'ভবানী বিষয়ে'র মহড়ায় ২৬টি অক্ষরে [illegible]টি ত্রিপদী, চিতেনে ঐরূপ একটি ত্রিপদী এবং পাড়ঙ্গে দুইটি ত্রিপদী। ইহাতেই [illegible]বল সুর ও রাগ-রাগিণীর পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পারিপাট্য। সঙ্গতের বাদ্য 'পিড়ে [illegible]ন্দি' 'দোলন' 'দৌড়' 'সব-দৌড়' এবং গান সমাপন সময়ে যে বাদ্য, তাহার নাম [illegible]মোড়' কি 'মহড়া' কি 'চিতেন' ও কি 'পাড়ঙ্গ' সকল গাহনার বাদ্য প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ প্রভেদমাত্র, ত্রিপদীর একটি পদ যথা।

'নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা।'

"এই কএকটি কথা গাহিতে গাহিতে যেমন রাগ-রাগিনীর পরিবর্তন, অমনি তৎসঙ্গে [illegible]ই বাদ্যের পরিবর্তন হইয়া থাকে। সঙ্গত, যথা প্রথমে পিড়ে বন্দি, পরে দোলন, [illegible]রে দৌড়, সর্বশেষে সব-দৌ[illegible] প্রথমে মহড়া গাহিয়া গায়কেরা একবার বিশ্রাম ক[illegible]ন, ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া [illegible] সেই সাজ সাঙ্গ হইলে আবার চিতেন ধরেন। সময়ে[illegible] সাঙ্গ হইলে আবার স[illegible] [illegible] পাড়ঙ্গ গাহিয়া গান সমাপন হউক[illegible]।

সাধা[illegible]" 'ঠাকুরানী' বিষয় গাহনার নিয় [illegible] খেউড় ও প্রভাতী হইয়া[illegible]ম অবিকল সেইরূপ। এই সঙ্গত [illegible] সঙ্গত হওনে [illegible]? এই গীত ও বাদ্যের মিছিল [illegible] [illegible], একাই দল গঠন সৃষ্টি বলিলেই হয়, ইহাতে একরূপ সুকৌশল আছে যে, দুইবার দল [illegible]দেশীয় অদ্বিতীয় সঙ্গীত তৎপর গায়ক ও বাদ্যকার মহা[illegible]

সহজে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং নিয়ত এক বৎসর শিক্ষা না করিলে কখনই সঙ্গত করিতে সমর্থ হইবেন না। অপিচ কোন্ কোন্ তালের সহযোগে আখ্‌ড়াই তালের রচনা হইয়াছে তাহাও আশু অনুধাবন করিতে পারিবেন না, শ্রবণ মাত্রেই নূতন প্রকার বোধ হইবে।

[পুনশ্চঃ]

সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখ্‌ড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু তাঁহারা 'ভবানী বিষয়' গাহিতেন না, কেবল 'খেউড় ও প্রভাতী' গাহিতেন, সেই সকল গীতে 'ননদী এবং দেওড়া' এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পরিপাটী ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই 'আখ্‌ড়াই' নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন!

"শান্তিপুরের আখ্‌ড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতাস্থ সঙ্গীত বিদ্যোৎসাহীজনেরা সুর ও বাদ্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলা করত অনেকাংশে পরিবর্তন করিয়া আখ্‌ড়ায়ের আমোদে আমোদিত হইলেন। ইঁহারা প্রথমে 'ভবানী বিষয়' পরে 'খেউড়' তৎপরে 'প্রভাতী' এই তিন সঙ্গীতের সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমুদয় গীত ও সুর এবং বাদ্য শুনিয়া বিশিষ্ট লোক মাত্রেই সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন।

"চুঁচুড়ার দলেরা বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুদ্ধ করিতেন, ইঁহারা হাড়ী, কলসী প্রভৃতি ২২ খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে 'বাইসেরা' বলিতেন। ঐ সময়ে সখের আখ্‌ড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড়বাজার নিবাসী ৺কাশীনাথ বাবুর ফুলবাগানেই হইত, অন্যত্র হইত না। তৎকালে কেবল আড়াতালে বাদ্য হইত, অপর তাল ব্যবহৃত ছিল না।

"ঐ সময়ের কিছু পরে পেসাদার দিগের যে কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহার-দিগের সেই সকল দলের গীত যুদ্ধ এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্বদাই মোহনচ. ধনি ও সৌখীন বাবুলোকেরা ইহারদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া

"এই প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়গণের মধ্যে যোড়াসাঁকোস্থ পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত কথায় কথায় কতরূপ বিবাদ কলহ হইত। প্রভৃতি কয়েকবার 'হর মধ্যে 'বৈষ্ণবদাস' নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত গুণী ছিলেন, তিনি

আড়াতাল হইতে এক অত্যাশ্চর্য নূতনরূপ করত 'দৌড়, সব দৌড়, দোলন, পিড়ে বন্দি ও মোড়' প্রভৃতি অতি সুশ্রাব্য মনোহর মধুর বাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়া সকলকেই মোহিত করিলেন। সেই বাদ্য যিনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহারি শ্রুতি পথে সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দাসকে কত প্রশংসা করিতে হয় তাহা বাক্য দ্বারা বিস্তারিত রূপ ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।

" 'অনন্তর রামজয় সেন' নামক একজন বৈদ্য বৈষ্ণবদাসের সৃজিত সেই সমস্ত বাদ্য এবং তালকে সংশোধন পূর্বক আরো অধিক উত্তম করিয়া লইলেন। ইঁহারি নিকট ৺রসিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয় বাদ্য শিক্ষা করত অত্যন্ত বিখ্যাত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন।

"এই সময়ে জোড়াসাঁকোস্থ 'ন্যাটা বলাই' নামক একজন সুবর্ণ বণিক আখ্ড়াই বাদ্যে অত্যন্ত নিপুণ হইয়াছিল; 'নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং রূপচাঁদ' এই তিন জন স্বর্ণ বণিক ইঁহার নিকট বাদ্য শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইলেন।

"জোড়াসাঁকোতে যে আখ্ড়াই দল হয়, ৺দুর্গাপ্রসাদ বসু মহাশয় তাহার সুর ও গীত রচনা করিতেন, ইনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। এই দলে ন্যাটা বলাই ঢোল এবং হোগল কুঁড়ে নিবাসী ৺পার্বতীচরণ বসু মহাশয় বেহালা বাজাইতেন। পার্বতী বাবুর বেহালা শুনিয়া তাবতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, ইনি বাগবাজারস্থ ৺রাধানাথ সরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।

"এই সময়ের পূর্বে নিমতলার দত্তবাবু এবং রামবাগানের দত্তবাবুদিগের আখ্ড়ায়ের দুই দল ছিল, ও আর আর অনেক মহাশয়েরা দল করিয়া সর্বদাই আমোদ করিতেন।

"বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺কুলুইচন্দ্র সেন সুরের যে নূতন প্রণালী বদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিধুবাবু তাহা হইতে বিস্তর বাহুল্য করেন, এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

"মৃত গোলাম আব্বাস, যিনি অদ্বিতীয় বাদ্যকর ছিলেন, তিনি আখ্ড়াই বাদ্য শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইতেন, এবং কহিতেন 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি কিছুই বুঝিতে ও শিখিতে পারি না।'

'আমরা (পূর্বে) লিখিয়াছিলাম 'শ্যামপুকুরে একবার মাত্র আখ্ড়াই দল হইয়াছিল' অধুনা নিশ্চিত অবগত হইলাম, শ্যামপুকুরস্থ বাবুরা দুইবার দল করিয়াছিলেন।

"আমরা (পূর্বে) আখ্ড়াই গীতের আদর্শ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং 'খেউড় ও প্রভাতী' গীতের কথা যাহা উল্লেখ করি, তাহাতে ভ্রম হইয়াছিল, এবারে সেই ভ্রম সংশোধন পূর্বক নিধুবাবুর প্রণীত তিনটি গান অবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম সকলে দৃষ্টি করুন।

যথা ভবানী বিষয়

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদা শিবে শুভকরি,
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী। ১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞানবোধে সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিনী॥ ২
প্রণতে প্রসন্নাভাব, ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী। ৩
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব বারি,
পদ তরি দেহি গো তারিণী॥ ৪

যথা খেউড়

সাধের পীরিতি সুখে, দুখ পাছে হয়। ১
তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা এই ভয়॥ ২
গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে তত অসুখ,
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয়। ৩

তথা প্রভাতী

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। ১
হলে কিও, বিধুমুখ, হেরি হে মলিন॥ ২
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে, করে কি অরুণ॥ ৩

গাহনা ও বাজনার পদ্ধতি এবং আর আর ব্যাপার (পূর্বে) যাহা লিখিয়াছি তাহাই নিশ্চিত জানিবেন, যে কয়েকটি মূল বিষয় আমরা পূর্বে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, এবারে বহু যত্নে, বহু শ্রমে ও বহু কষ্টে তাহাই সংগ্রহ করিয়া পত্রস্থ করিলাম, (পূর্বের) সহিত সংযোগ করিয়া পাঠ করিলে সবিশেষ যথার্থ ব্যাপার জানিতে পারিবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শান্তিপুরকেই কবিগানের জন্মভূমি বলিয়া সম্মানিত করিয়া গৌরববোধ করিয়াছেন। কবিগানের সূচনা-পর্বের পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয়। [১]

……৮৭১ সালে স্বর্ণনদীর তীরবর্তী ভাটকলাগাছি গ্রামে প্রথম রথযাত্রার দিন দুইদলে মিলিয়া সঙ্গীত-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। প্রথম দলে হরিদাস ঠাকুর মূলগায়ক, স্বরূপদাস ও সনাতন দাস ধারক হন; দ্বিতীয় দলে নিত্যানন্দ কঠী মূলগায়ক, গোবিন্দ কঠী ও মাধব কঠী ধারক থাকেন। এই ছয় জনই পণ্ডিত চক্রবর্তী ভট্ট বিষ্ণুরাম বাগ্‌চীর ছাত্র ও শিষ্য।……
……হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া প্রথমেই গদাধর মুখুটির সাহায্যে ক্রমে মুখুটি বংশীয় প্রায় সকল যুবক ও বৃদ্ধ মিলিত হইয়া দলবদ্ধ হন এবং হরিদাস ঠাকুরের উপদেশানুসারে অদ্বৈত গোস্বামীর সাহায্যে বিষ্ণুরাম বাগ্‌চীকে শান্তিপুরে আনাইয়া, তাঁহার ব্যবস্থাক্রমে ফুলিয়ায় একটি ও শান্তিপুরে একটি, এই দুইটি সঙ্গীত-সংগ্রামের আখ্‌ড়া বসাইয়া দেন। মুখুটি বংশের আখ্‌ড়াধারী গদাধর পণ্ডিত এবং গোস্বামী বংশের আখ্‌ড়াধারী হইলেন অদ্বৈত গোস্বামী। হরিদাস ঠাকুর ও বিষ্ণুরাম বাগ্‌চী হইলেন দুই আখ্‌ড়ার দুইজন আচার্য।……

শান্তিপুর ও ফুলিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় আখ্‌ড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের অভিনয় সম্পূর্ণ উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়া গেল। …এইরূপে বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণলীলার অপূর্ব মাধুর্য আস্বাদ জন্য আখ্‌ড়াই-সঙ্গীত-সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কালস্রোতের কৌটিল্য ও রুচির পরিবর্তনে ঐ আখ্‌ড়াই-সঙ্গীত-সংগ্রাম স্বভাব কবিদিগের আজীবা হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া যদিও কথঞ্চিত পরিবর্তিতাকারে সম্পূর্ণ নিয়ম ও ভাব-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম থাকিল বটে; কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে আনিয়া সেই মহনীয় আখ্‌ড়াই সঙ্গীত সংগ্রামকে 'কবির লড়াই' করিয়া ফেলিল। তাহারই অনুকরণে সাধারণ অশিক্ষিত স্বভাবকবি মুসলমানগণ আবার একটা নূতন করিয়া বসিল; তাহার নাম হইল 'তর্জার লড়াই'।

দেশ-কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কবিগান শান্তিপুর হইতে নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্র

হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস

হুগলী-চুঁচুড়ার পথ ধরিয়া কলিকাতার নাগর-জীবনে আপনার স্থান করিয়া লইল। ইংরেজ অনুগ্রহ-পুষ্ট, নবাবীয়ানার ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াসী যে জনসমাজ তখন সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাদেরই সাহায্যে কবিগানের প্রসার হইতে লাগিল। 'মহারাজা বাহাদুর' নবকৃষ্ণদেব এই শ্রেণীর অন্যতম অগ্র-পথিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবিগানের সূচনা-পর্ব সম্পর্কে সীতারাম রায়ের জীবন-চরিত-লেখক যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতানুসারে জানা যায় যে, সীতারাম রাজধানীতে উৎসব-পর্ব উপলক্ষে অন্যান্য সঙ্গীত-অভিনয়ের সঙ্গে কবিগানও করাইতেন। সীতারাম রায় ১৬৫৭ কিংবা ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে কবিগান প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায়।

যে সকল কবিওয়ালার জীবন-বৃত্তান্ত এবং রচনার সহিত পরিচিত হওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইলেন গোঁজলা গুঁই। কেহ কেহ রঘু মতে এবং নন্দকে প্রাচীনতম কবির দলভুক্ত করেন, কিন্তু গোঁজলার পরবর্তীকালের কবিওয়ালা তাঁহারা।[২] রঘু সম্ভবতঃ রঘুনাথ দাস এবং নন্দ বোধ হয় লালু নন্দলাল। মতের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। যাহাই হোক্, এ দিক দিয়া দেখিলে গোঁজলার আবির্ভাবকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। গোঁজলার পর হইতেই কবিগানের বিস্তার পর্বের শুরু হইল এবং এই পর্বকেই কবিগানের গৌরবময় যুগ বলিয়া আখ্যাত করা যায়। এ সম্পর্কে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি বলেন,—'The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th but the most flourshing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830.' রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী প্রমুখ খ্যাতনামা কবিওয়ালাগণ প্রায় সকলেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লোকান্তরিত হন। 'After these greater Kabiwalas, came their followers who maintained the tradition of Kabi-poetry up to the fiftees or beyond it. The Kabi-poetry, therefore, covers roughly the long stretch of a century from 1760 to 1860, although after 1830 all the greater Kabiwalas one by one had passed away a Kabi-poetry had rapidly

---

২ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৪ সাল এবং গোঁজলা গুঁই-এর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

declined in the hands of their less gifted followers.'[৩] ১৭৬০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ একশত বৎসর হইল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুখ্যত কবিগানের যুগ। ইহার মধ্যে ১৮৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কবিগানের গৌরব ছিল সমধিক। কবিওয়ালাদের আবির্ভাবকাল এবং তাঁহাদের রচনার গুণাগুণের পরিপ্রেক্ষিতে কবিগানের তিনটি সুস্পষ্ট কালান্তর লক্ষ্য করা যায়। কবিগানের সূচনা কাল হইতে ১৭৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কবিগানের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় বা সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল হইল ১৭৬০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৩০ খৃস্টাব্দের পরবর্তীকালে কবিগানের ক্ষীণধারা ক্রমশই ক্ষীণতর হইতে লাগিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে য়ুরোপীয় ভাবধারার সহযোগে দেশীয় বুদ্ধিবাদী জনসমাজের ভাবাকাশে যে আলোক-বন্যার প্লাবন বহিয়াছিল তাহার আবেগ-প্রবাহে প্রাচীন ভাবধারার অস্তিত্ব রক্ষাই অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। খৃস্টীয় ধর্মমতকে তাহারা স্বীকার করে নাই সত্য, কিন্তু হিন্দুধর্মের দেবমন্দিরকেও মহিমাচ্যুত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। প্রাচ্যের সব কিছুই যেন নিম্ন-মূল্যের আকর হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য ধর্মের ক্ষেত্রে জন্মলাভ করিয়াছে নূতন একটি ধর্ম। শূন্য-প্রতিকা আবরণে যাহার নাম হইল—ব্রাহ্মধর্ম। সামাজিক জীবনেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মধুসূদন দত্ত, শ্রীমধুসূদন না হইয়া, হইয়াছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একদিকে পুরাতন ঐতিহ্য, অপরদিকে ইয়ং-বেঙ্গলের অস্বীকৃতিধর্মী নব্য-চেতনা। এই নব-চেতনার নিকট প্রাচীন কাব্য-কলার ক্ষীয়মান স্রোতাবলম্বী কবিগানের বংশীধ্বনি যে ক্ষীণতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ নব্য-বাঙালীর রস-চেতনা তখন নূপুর শিঞ্জন অপেক্ষা বিলাতী ব্যাণ্ড বাজনার অধিকতর পক্ষপাতী।

৩ Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De, P. 302.

কবিগানের কলাবিধি

আখড়াই গানের রীতি-নীতির কথা কবিগানের ইতিহাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যের উদ্ধৃতি হইতে সহজেই জানা যায়। "আখ্ড়াই গীতের উত্তর-প্রত্যুত্তর নাই, যাঁহারদিগের স্বর ও গাহনা ভাল হইত তাহারাই জয় পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাজিয়া আনন্দপূর্বক গমন করিতেন।"[১] স্বর এবং গানের উৎকর্ষের উপরেই আখ্ড়াই-এর জয়-পরাজয় নির্ভর করিত। কবিগানের জয়-পরাজয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথক রীতি অবলম্বিত হইত। "কবিগানের বিশেষত্ব হইতেছে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একদল যে বিষয়ের গান ('চাপান') গাহিবে সে গান শেষ হইলে অপর দল তাহার গান ('উতোর') গাহিবে। শেষ পর্যন্ত গানের বাঁধুনিতে এবং গাহনাতে যে দল উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন হইবে তাহারা বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করিবে।"[২] গানের বাঁধুনি'-র কথায় কবিগান রচনার নিয়ম-প্রসঙ্গে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। "দাঁড়া কবির প্রথমে চিতান ও পর-চিতান, তৎপরে ফুকা, ফুকার পর মেল্তা, মেল্তার পর মহড়া ও পরে শওয়ারি থাকিবে। শওয়ারির পর খাদ, পুনর্বার ফুকা, মেল্তা ও মেল্তার পর অন্তরা রচনার নিয়ম। অন্তরা সমাপনে দ্বিতীয় চিতান। পূর্বতন কবিগান রচয়িতাদিগের অন্তরা রচনার যে রীতি ছিল এক্ষণে সে রীতি উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ফুকার পরেই গীত সমাপন হয়। হাফ্-আখ্ড়াই গান রচনার নিয়মও অবিকল এইরূপ। কেবল ফুকার পর একটি ডবল ফুকা রচনা করিতে হয়। আর হাফ্-আখড়াই গানে অন্তরা থাকে না। কবি-গীতি রচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহড়া হইতে রচনা আরম্ভ করেন। কেহ বা চিতান হইতে রচনা আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু চিতান হইতে আরম্ভ করিলে সহজে রচনা করিতে পারা যায়। আসরে প্রত্যুত্তর প্রদানকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গান রচনা করা আবশ্যক; সুতরাং চিতান হইতেই রচনা আরম্ভ করিতে হয়। যে অক্ষরে চিতানের শেষ হইবে, পরচিতানের মিলও তাহার সমানাক্ষরে থাকিবে। ফুকার প্রথম ও শেষ পদে সমানাক্ষরে মিল। মেল্তার শেষ পদের সহিত মহড়ার শেষপদে সমাক্ষরে মিল। খাদেও ঐরূপ মিল থাকিবে। খাদের পর যে দ্বিতীয় ফুকা ও মেল্তা থাকে তাহারও মহড়ার মিলের

১ পৃঃ ২৫

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড—ডক্টর সুকুমার সেন। পৃঃ ৯৬৯

সহিত সমানাক্ষরে মিল।[৩] ভবানীপুর নিবাসী কবিবর জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একখানি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে চিতান, পর-চিতান, ফুকা, মেল্‌তা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মেল্‌তা এবং অন্তরা র ক্রমিক বিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত গীতটি দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভবানীপুরের সখের দলে গীত হয়।[৪]

মেনকার প্রতি উমার উক্তি

১ চিতান।	শরদ কালেতে, শিখরীর কোলেতে, বসিয়া সিংহ-বাহিনী।
১ পর-চিতান।	রাণীকে ভৎ'সনা ছলে, কহিছেন ভব ভাবিনী।
১ ফুকা।	হাঁগো মা, মা গো মা, তাই তোমারে গো সুধাই। মা বাপ থাকৃতে কি মা, কন্যার মুখ চাইতে নাই।
১ মেল্‌তা।	ভাবি তাই মনে সর্বক্ষণ, কেমন তোর কঠিন মন, এমন ত দেখি নাই মা জগতে।
মহড়া।	আমার দৈন্য ভেবে কি মা ভিন্ন ভাবিস্ মনেতে।
শওয়ারি।	শিবের থাকিলে বৈভব, বাড়িত গৌরব, দু বেলা তত্ত্ব করে পাঠাতে।
খাদ।	শুধাই তাই মন দুখেতে।
২ ফুকা।	নির্ধন স্বামী আমার শঙ্করের সম্পদ নাই। তাই কি বাৎসল্যতায়, তাচ্ছিল্য দেখ্‌তে পাই॥
৩ মেল্‌তা।	মায়ের মায়া নাই দুহিতায়, এ দুখ কব কায়, মরি মা এই মনের খেদেতে।
অন্তরা।	ভাল মা গো আমি যেন হয়েছি, দুখিনী জনার গৃহিনী, তা বলে তনয়ায়, মা হয়ে কোথায়, ভুলে রয় বল ওগো পাষাণী॥

রাম বসুর অনেক সঙ্গীতেই এই ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। পেসাদার কবিওয়ালাগণ বহুক্ষেত্রে এই ক্রমানুসরণ করেন নাই।

৩ প্রাচীন কবি-সংগ্রহ। পৃঃ ।০

৪ ঐ

কবিগানের সঙ্গে দাঁড়া-কবির পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কবিগানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উত্তর-প্রত্যুত্তর দানের মধ্যদিয়া আগমনী, সখী-সংবাদ, মান, বিরহ প্রভৃতি বিষয়কে উপজীব্য করিয়া রসসৃষ্টি করা। এই রসসৃষ্টির অনুকূলে কবিওয়ালাগণ বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিলে কোন আপত্তি ছিল না। দাঁড়া-কবির প্রকৃতি কিন্তু পৃথক-ধরনের বলিয়াই মনে হয়। দাঁড়াইয়া কবি-গাহনার রীতিকেই অনেকে দাঁড়া-কবি নাম দিয়াছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"পাঁচালী যেমন 'পা-চালি' থেকে হয় নি 'দাঁড়া-কবি'ও তেমনি 'দাঁড়ানো' থেকে আসে নি। দাঁড়া শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল আদর্শ 'বাঁধাধরা' যা ছিল আরবী তবজা শব্দের মূল অর্থ। যে কবিগানে উত্তর প্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা পালা বা গান ছিল তাতেই বলা হোত 'দাঁড়া-কবি।' আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিত মত রচনা করা হোত তাকে বলত সাধারণ কবি বা 'কবিগান'। কবিগানের প্রত্যুৎপন্ন বা extempore-পদ্ধতি চলিত বলেই তবে পূর্বতন-পদ্ধতি 'দাঁড়া-কবি' নামে পরিচিত হয়েছিল। উত্তর-প্রত্যুত্তর কবিগানের সবস্ব। উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোন কোন গানে আদি রসের আধিক্য এনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করা হলে সেই গানকে বলত 'খেউড়'। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শান্তিপুর অঞ্চলের কবি-গান বিশেষ ক'রে খেউড় গান বলে বিখ্যাত হয়েছিল—এ কথা ভারতচন্দ্রের উক্তি হতে জানা যায়।"[৫] কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তর-রীতি বীরভূম অঞ্চলে 'বোল গান' নামে আখ্যাত ছিল। পরবর্তীকালে ইহাই 'ডাক' নামে অভিহিত হয়।[৬]

কবি, দাঁড়া-কবি এবং হাফ্-আখ্ড়াই রীতি একই রকমের ছিল।[৭] ঢোল, তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি, জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা, বেণু, সেতার প্রভৃতি বাদ্যের সহযোগে এই সমস্ত গান গীত হইত।[৮] নিছক কবিগানের ক্ষেত্রে ঢোল এবং কাঁসীর প্রয়োজন সর্বাগ্রে, অপর যন্ত্র-সমূহের ব্যবহার অতি-প্রয়োজনীয় ছিল না। "মৃদঙ্গ না হইলে যেমন কার্তনীয়া ও ঢপওয়ালাদিগের চলে না, ঢোল ও কাঁসি না হইলেও তদ্রূপ কবির গান জমে না।"[৯]

৫ মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী। পৃঃ ৫১
৬ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত
৭ সংবাদ প্রভাকর। ১ কার্তিক ১২৬১ সাল।
৮ মনোমোহন গীতাবলী। পৃঃ ।৹
৯ সাহিত্য-সংহিতা। আষাঢ় ১৩১২ সাল।

"কবিগানের প্রথমে 'চিতেন', পরে 'মহড়া', সর্বশেষে 'অন্তরা' গাহিতে হয়, কিন্তু লিখনকালে অগ্রে 'মহড়া', পরে 'চিতেন' শেষে 'অন্তরা' লিখিতে হইবে।... ... কবির দলের কবিতা সকল 'পয়ার', 'ত্রিপদী' ইত্যাদি কোন গ্রন্থের ছন্দে বর্ধিত নহে। শুদ্ধ সুরের উপরেই নির্ভর করে। সুরানুযায়ী শব্দ বসিয়া থাকে, ইহাতে কথার ন্যূনাধিক হইলে কোন মতেই দোষ হইতে পারে না। কারণ সুরের অনুরোধে শব্দ সংযোগ করিতে হয়।..... যথা—কখনো, তখনো, বরণো, নীলো, কমলো, গমন্, ধর্, মান্, কর্, বল্, হাস্, বাস্, ধরো, করো ইত্যাদি।"[১০]

কবিগানের বিষয়গুলি খণ্ডচিত্রের পর্যায়ভুক্ত হইলেও এগুলি বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য এবং রসিকতার সার্থক সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। "সুর ও তাল, ভাষা ও বর্ণনার উপযুক্ত মিলন হইলে কবির গান সোনায় সোহাগা হয়। কবিতে প্রধানতঃ কয়েকপ্রকারের গান থাকে, যথা ;—মালসী, সখী-সংবাদ, গোষ্ঠ ও কবি। ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপক গানের নাম—মালসী। মালসীর মধ্যে যেগুলি বিস্তারিত ও নানা প্রকারের সুর তালের মিশ্রণে গীত হয়। তাহাদিগকে ভবানী-বিষয় বলে। আর যেগুলি বিস্তৃত নহে, একমাত্র তালে চম্‌কা সুরে গাওয়া যায়, তাহাদিগকে ডাক্-মালসী বলে। নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের আলোচনা যে গীতের বিষয়, উহারই নাম সখী-সংবাদ। বসন্ত, বিরহ ও ভোর প্রভৃতি গানগুলিকে সখী-সংবাদ করা গেল। নায়ক-নায়িকার বসন্তকালীন পূর্বস্মৃতি ও বিভ্রম এবং প্রভাতকালীন মিলন বা বিচ্ছেদ-জনিত সুখ দুঃখের বর্ণনা থাকে বলিয়াই এই সকল গানের এইরূপ বিশেষ নাম হইয়াছে। এই সকল গানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বভাবের শোভা বর্ণনার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। বাৎসল্য রসাত্মক গানের নাম গোষ্ঠ।"[১১] কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাখালগণের সঙ্গে গোচারণে যাত্রা এবং তদুপলক্ষে যশোদার কাতরতা অবলম্বন করিয়াই গোষ্ঠগান রচিত হইত। ব্যঙ্গোক্তিজনক হাস্যরসাত্মক গান যখন বিস্তারিতরূপে নানা সুরে গাওয়া হইত তখন তাহাকে বলা হইত লহর বা কবির লহর। ইহাই হইল কবিগানের বিষয় বিন্যাসের রূপ-বৈচিত্র্য।

কবিগানের সার্থকতা নির্ভর করে ইহার রস-সৃষ্টির উপর। বাক্ এবং সুর—এই উভয়ের উপর সমভাবে নির্ভর করিয়া শ্রোতার অন্তর জয় করাই কবিগানের কলাবিধির যথার্থ শিল্পকর্ম।

১০ সংবাদ প্রভাকর। ১ কার্তিক ১২৬১ সাল।

১১ সাহিত্য-সংহিতা। বৈশাখ ১৩১২ সাল।

কবিগানের অন্যান্য কথা

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা, সুন্দরের প্রতি এ-হে প্রলোভন দেখাইয়াছেন শুধুমাত্র সুন্দরকে নিজ-পিতৃগৃহে আরও কিছুদিন রাখিবার ড । এই খেঁড়ু< খেঁউড় বা খেউড়কেই পণ্ডিতগণ 'কবিগানের আদিরসাত্মক পূর্বরূপ' লিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] তৎকালীন খেউড়ের সাহিত্যিক-রূপের সহিত পরিচিত হ বার কোনই উপায় নাই, কিন্তু খেউড়ের স্তর অতিক্রম করিয়া কবিগানের রাজ্যে আ লে ভারতচন্দ্রের পটভূমিকায় অশ্লীলতার আরোহ বোধকরি উচ্চগ্রামের নয়। কবি নের পশ্চাৎপট হিসাবে
কেন, বৈষ্ণব সহজীয়া-সাহিত্য তথা সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেম-লীলা-কথনের বিরাট ব্যাপ্তি রহিয়াছে। গীত-গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী-সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের যে কাব্যকথা কবিগানের পূর্ব পর্যন্ত সুবিস্তৃত রহিয়াছে তাহা যে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে নাই তাহা বলা চলে না ; বরং, বহু ক্ষেত্রেই স্থূল-রুচির পরিচয় অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি, অশ্লীলতা-কলঙ্কের বাহিরে শুচি-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার যে প্লাবন সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা যে-কোন দেশের সাহিত্য-ইতিহাসে অতি বিরল দৃষ্টান্তের পর্যায়ভুক্ত।

"বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আদিরসের ন্য দো পাওয়া যায়। এজন্য বৈষ্ণব কবিগণকে আধুনিক কালের সমালোচকগণের নিকট গালি খাইতে হইতেছে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে দোষ কি শুধু বৈষ্ণব কবিদের ? না তাঁদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের দোষ ? জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচশত বৎসর ধরিয়া যখন সেই আদিরসের ধারা বহিয়াছিল, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা কোন কবি বিশেষের ব্যক্তিগত দোষ নহে, ইহা সময়গত দোষ। তাহার পর দেখিতে হইবে আমরা যাহাকে 'দোষ' বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা কবিগানের রচনার দোষ না পাঠকের অনুভবের দোষ। ইহার প্রমাণ জয়দেব হইতেই পাওয়া যাইবে। সকলেই জানেন, গীতগোবিন্দ আদিরসপ্রধান গীত-কাব্য ; কিন্তু সেই আদিরসাত্মক গানগুলি

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।—ডাঃ সুকুমার সেন। প্রথম খণ্ড—পৃঃ ৯৬৯

নির্দিষ্ট সুর তাল সংযোগে ভাল গায়কের কণ্ঠে যদি গীত হয়, তাহা হইলে দেখিবেন যে সেই সুরের মধ্যে আদিরসের গন্ধটুকু কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! এমন কি জয়দেবের 'নিভৃতনিকুঞ্জং গতয়া' বা 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' এই দুইটি গানে—যাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠা বোধ করিতে হয়—এই দুইটি গানেও শুধু একটা বিরহের আর্তনাদ, মিলনের ব্যাকুলতা ও সেই সঙ্গে একটা উদাসভাব সুরের মধ্যে লুটিয়া লুটিয়া পড়িবে—তাহার মধ্যে কামগন্ধের লেশও পাওয়া যাইবে না; সমস্ত লালসা ছাপাইয়া আধ্যাত্মিক ভাব আপনি জাগিয়া উঠিবে।

"বৈষ্ণবপদাবলীর সম্বন্ধেও এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে সেগুলি শুধু কবিতা নহে, সেগুলি সঙ্গীত। গীত-গোবিন্দের গানের মত সেগুলিও যদি নির্দিষ্ট সুরে গীত হয়, তাহা হইলে বিদ্যাপতির সম্ভোগবর্ণনার গানেও কেবল সৌন্দর্যটুকুই সুরের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আদি-রসের ভাবগুলি কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও কেহ পাইবেন না।......পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাংলার কবিগণ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, 'কামশাস্ত্রের মাল মসলা যোগানো' তাহার উদ্দেশ্য নহে; লালসার ভাব এত স্থায়ী নহে যে তাহাকে অবলম্বন করিয়া এত বৎসর ধরিয়া এত বড় একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে।"[২]

কবিগানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। (সঙ্গীত—ইহার প্রাণরস আর উপজীব্য বিষয়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-কাহিনীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কবিগান—দরবারী সাহিত্য নয়, কিংবা বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় গণ্ডীতেও ইহা বাঁধা নয়। কবিগান—তৎকালীন বাংলা দেশের জাতীয় সাহিত্য। সাধারণের জন্য, সাধারণ সুরে, সাধারণ পরিবেশে এগুলি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।) তাই বলিয়া স্থূল রুচিতে এগুলির সুর বাঁধা মনে করিলে এগুলির প্রতি অবিচার করা হইবে। এ সম্পর্কে তৎকালীন একটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল:

> বিশিষ্টজনেরা ভদ্র গানে এবং ইতর লোকেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্ত কালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি (নিত্যানন্দদাস বৈরাগী) সখী-সংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম

কাব্য-রত্নমালা—বিভূতিভূষণ মিত্র. পৃঃ ।৶৹

হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্বক কহিল "হ্যাদ্ দেখ লেতাই, ফ্যার্ ঝদি কাল্ কুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম্, খাড়্ গা।" নিতাই তচ্ছ্রবণে মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।[৩]

এই ভদ্রগানই—কবিগান এবং মোটা ভজনের বা স্থূল রুচির আদি রসাত্মক গানই—খেউড়। পূর্ববঙ্গে খেউড় গানের অপর নাম লাল-গান। সমগ্র কবি-সঙ্গীত-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিওয়ালারা বৈষ্ণব পদাবলীকারদের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। সহজীয়া সাহিত্যের তত্ত্বগন্ধী স্থূলত্ব কবিগানের কাব্যের বিষয় না হইয়া পদাবলীর শুচিস্নিগ্ধ মাধুর্যের অমৃতধারায় কবিগানের অঙ্গন সিক্ত হইয়াছে। "কৃষ্ণ কলঙ্কে কলঙ্কী হইবার শ্লাঘা, এই যে রসের সাধনায় বিশ্বমানবতার পরিকল্পনা—ইহা বাঙালীর নিজস্ব। বাঙালীর প্রাণের কথা হইলেও আজ বাঙালী পাঠককে তাহা বলিবার যো নাই! সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনা-পুলিন, সেই অভিসার, যাহা বৈষ্ণব কবিগণ প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে এতই সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে এখনকার সমস্ত কবিরই হৃদয়ে যমুনা বহিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে আর তাঁহাদের মানস-সুন্দরী সেখানে অভিসার করিতেছেন।"[৪] কবি-গানের রাজ্য—প্রেমের রাজ্য। প্রেমের প্রকৃতি—বিচিত্র। এই বিচিত্রতার আস্বাদে কবিগান কখনো হইয়াছে আনন্দে উদ্বেল, আবার কখনো বা অশ্রুতে উচ্ছ্বসিত। তথাপি এই প্রেমের সুরে হৃদয়ের গভীর আর্তিই নয়নাশ্রুর মুকুতা-মালায় উজ্জ্বল ও মহনীয় হইয়া উঠিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে কবিওয়ালাদের যোগাযোগ বড় স্পষ্ট। "বৈষ্ণব কবিদিগের সুধাসিক্ত কণ্ঠের কাব্যরাগিণী নিঃশেষ হইবার অব্যবহিত পর হইতে এক অভিনব শাখা বহির্গত হইয়া বঙ্গবাসীকে প্রেম-তরঙ্গে ভাসাইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই 'কবিওয়ালা' নামে সুপরিচিত।"[৫] সাহিত্যের ধারায় কবিগানের সঙ্গতি ও ইহার

৩ সংবাদ প্রভাকর। ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।
৪ কাব্য-রত্নমালা—বিভূতিভূষণ মিত্র। পৃঃ ১৲
৫ সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১২ আষাঢ়।

প্রকৃতি-বিশ্লেষণ পূর্বেই করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালের সাহিত্যজগৎ—কবিগানের জগৎ। "কবিওয়ালাদের গানে বাংলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই যুগকে বাংলার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ। যে বাঁশী একদিন বাংলাকে জাগাইয়াছিল, যাহার সুরে বাংলার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া জড়াইয়া দেশের জীবন-মরণের প্রাণ হইয়াছিল, সেই সুরেই আবার বাঁশী ডাকিল। তাহাতে বিচিত্র সুরের মেলা। মুসলমানী কেচ্ছার আবিল স্রোতে বাংলা সাহিত্য ঘোলা হইয়া পড়িয়াছিল, ...নিধু, হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন। গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল।"[৭] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিগানের দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে। কবিগানের প্রতি তৎকালীন গণ-মানসের এই অবজ্ঞারও কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণায় কবিগানের জন্ম হইলেও ইহার না আছে বৈষ্ণব কবিতার মত ধর্মীয় পরিবেশ, না আছে বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রেণীর ধর্মীয়-মানুষ,—যাঁহারা কেবল কবিতাকার হইয়া থাকেন নাই, দেখা দিয়াছিলেন মুখে কবিতা এবং গাত্রে নামাবলী লইয়া বিপরীতধর্মী বিচিত্র ধরনের একক মূর্তিতে। এবং যেখানেই এই দ্বৈত সত্তা হইতে কোন না কোন একটি রূপ স্খলিত হইয়াছে সেইখানেই হয় ধর্ম নয় কবিতা আপনাকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কাব্যের এবং ধর্মের শ্রেণীগত পার্থক্য অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই; তেমনি পার্থক্য —জীবনভূমির এবং ধর্মভূমির। ধর্মের ভূমিতে জীবনের গান,—ভাবদর্শনের ক্ষেত্রে পৌঁছায়; আর জীবনের ভূমিতে ধর্মের গান,—ধর্মের কথায় পূর্ণ না হইয়া জীবনের জয় ঘোষণা করে। জীবন-কাব্যের বেদনা-রঙীন যাত্রাপথের প্রান্ত-সীমায় নৈর্ব্যক্তিক রসলোকের নিমন্ত্রণ—নিরাভরণ সত্য এবং সর্বকালীন অমৃতত্ত্বের প্রতীক। জীবনাতীতের প্রতি এই আবেগ-নিক্ষেপ একান্ত ধ্রুব এবং অভেদ-সত্য হইলেও জীবন রসিক এবং ধর্মপথিকের নিকট এই একই সত্যের রসরূপটি যে অভিন্ন নয় তাহা অনস্বীকার্য। চূড়ান্ত ভাবে রস এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও গ্রহণ-ভৌমিকের অন্তরাভিলাষের জ্যোতিপ্রভায় ইহার বর্ণবিভূতির পৃথকীকরণ বোধ করি অস্বাভাবিক নয়। সেইজন্য, একই বিষয়বস্তু ধর্মের ভূমিতে দর্শনের সারকথারূপে হইয়াছে 'চৈতন্যচরিতামৃত' আর জীবনের ভূমিতে সচল অনুভূতিময় কাব্যকথা। জীবনের

৬ সাহিত্যের ধারা ও কবিগান প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
৭ বাংলা গীতি-কবিতা—চিত্তরঞ্জন দাস।

বেদীতে বৈষ্ণব কবিতার লীলা-কমল সাহিত্যরসিককে নিত্যদিন আমন্ত্রণ করিতেছে। সাধারণের নিকটও ইহা কম আকর্ষণীয় নয়। কারণ, ইহার পশ্চাৎপট হিসাবে সমগ্র বৈষ্ণব জগতের মুক্তিকেন্দ্রিক আরাধ্য-আহ্বান আপনাকে বৃহৎরূপে উপস্থাপিত রাখিয়াছে। কবিওয়ালাগণের পশ্চাৎপট হিসাবে এরূপ কোন ধর্মজগতের উপস্থিতি নাই। রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা কিংবা শিবদুর্গার জীবন-নাটক সংবাদ, ধর্মের ওড়না গায়ে দিয়া কাব্যের আসরে প্রবেশ করিয়াছে। কবিতা-কলার শিল্প সংস্থাপনে কখন যে সেই আবরণ মুক্ত হইয়া যায় তাহা বোঝা যায় না। কারণ, মর্তমানব আপনার আনন্দ-বেদনাময় আশা-হতাশাদীর্ণ জীবন-কাব্যের বিচিত্র অধ্যায়গুলির সহিত সকলের অজ্ঞাতে আপনাকে কখন হারাইয়া ফেলে তাহা জানিতেও পারে না, যখন জানিতে পারে তখন আনন্দ-বেদনার অশ্রু-ধারায় তাহার জীবন-গঙ্গার দুইকূল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

কবিগানের জগতে ধর্মের পরিধি কতটুকু তাহা বিবেচিত হইয়াছে। ধর্মপ্রবণ জনসমাজের অবজ্ঞা তো ইহার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর সেইকালে, য়ুরোপীয় ভাবধারায় আন্দোলিত-আলোড়িত আর একদল জন-সমাজের কথাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। কবিগানকে তাঁহারা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় চিন্তা যেদিন বাঙালীর মানস-চেতনায় প্রভাব বিস্তার করিল সেইদিন দেশীয় সংস্কারের বেড়াজাল ভাঙিয়া, প্রাচীন কৌলিন্যের সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া, ধর্মানুগ সাহিত্যের ভাবভূমি হইতে বাহিরে আসিয়া বাঙালীর জীবন-বাদে নবতর জীবন-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-পিপাসার উদ্রেক ঘটিল। ঐতিহাসিকের ভাষায় "Such a renaissance has not been seen anywhere in the world's history,......On our hopelessly decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force."

তারপর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রবাহ নূতন ধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দিল। এই নূতন যুগের সাহিত্যে ধর্মপ্রবণ সাহিত্যের বিদায়-চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পদাবলী সাহিত্য কিংবা মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীর যুগ তখন বিদায়-পথযাত্রী। কবিগানও স্বাভাবিক নিয়মেই পরবর্তী সাহিত্য-বিকাশকে স্বাগত জানাইল। কবিগানের মধ্যে যে অন্তর্মুখী সাহিত্য-চেতনার উদ্গম লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহাই পরবর্তীকালের সাহিত্যে মঞ্জুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কালের নিয়মে সকল সাহিত্যকেই নবযুগের জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া যাইতে হয়। পদাবলী-সাহিত্য, মঙ্গল-কাব্য এই ভাবেই আপনাকে নিঃশেষ করিয়াছে। বৃহতের প্রয়োজনে কবিগানের ইতিহাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, সেইখানেই ইহার সার্থকতা।

কবিওয়ালাদের জীবন-কথা ও কাব্য-সাধনা

গোঁজলা গুঁই

গোঁজলা গুঁই—কবিগানের আদি প্রবর্তক কিনা বলা দুরূহ, কিন্তু প্রাপ্ত কবি-সঙ্গীত রচয়িতাগণের মধ্যে যে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১২৬১ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রের ১লা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় গুপ্ত-কবি যে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহাই এই কবির সম্পর্কে জানিবার একমাত্র অবলম্বন।

> ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল 'গোঁজলা গুঁই' নামক এক ব্যক্তি 'পেসাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তৎকালে 'টিকেরার' বাদ্যে সংগত হইত। লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী—এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন।'

গুপ্ত-কবির সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে গোঁজলা গুঁই বর্তমান ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে 'বাঙ্গালীর গান' সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন,—'গোঁজলা গুঁই—রাসু-নৃসিংহ, লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবিগীতির প্রথম প্রবর্তকগণের সমসাময়িক ছিলেন।'[১] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যের যে কোন সারবত্তা নাই তাহা অনস্বীকার্য। রাসু-নৃসিংহ এবং লালু-নন্দলাল এই দুই কবির আবির্ভাবকালের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, পরন্তু গুপ্ত-কবি তো লালু-নন্দলালকে গোঁজলা গুঁই-এর অন্যতম শিষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বোপরি, 'কবি গীতির প্রথম প্রবর্তকগণের' পর্যায়ে রাসু-নৃসিংহ বা লালু-নন্দলাল কেহই পড়েন না। বীরভূমের আঞ্চলিক কবিওয়ালাগণ বলহরি রায়কে 'কবির গুরু' হিসাবে আখ্যাত করিলেও তিনি যে 'কবিগীতির প্রথম প্রবর্তকগণের' পর্যায়ে পড়েন না তাহাও অনস্বীকার্য। বলহরি রায়, আনুমানিক ১১৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১২৫৬ সালে।[২] মোটকথা, প্রাচীনতম কবিওয়ালা হিসাবে গোঁজলা গুঁইকে অভিনন্দিত করিতে কোন দ্বিধা নাই।

১ বাঙ্গালীর গান। পৃঃ ১৮৪

২ বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত।

গোঁজলা গুঁই-এর কবিখ্যাতি বা তাঁহার রচনার বিস্তৃত পরিচয় লাভ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেই হয়। এ সম্পর্কেও গুপ্ত-কবির সংগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। গুপ্ত-কবি গোঁজলা গুঁই-এর 'কোন বিশেষ বন্ধুর করুণায় তাঁহার দুইটি গীতের কিয়দংশ লাভ করতঃ সাধারণের গোচরার্থ প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকটন' করিয়াছেন।

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরসো কোরো না ধনী ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি। ১
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥ ২

তথা—

প্রাণ তোরে হেরিয়ে, দুখো গেল মোর।
বিরহ অনল হইল শীতলো,
জুড়াল প্রাণ-চকোর ॥

গোঁজলা গুঁই স্বতন্ত্র কোন পালা-গান রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তাঁহার কবিত্ব আলোচনার পক্ষে উদ্ধৃত অসম্পূর্ণ সঙ্গীত দুইটি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তথাপি পরবর্তীকালের টপ্পা গানের সঙ্গে ইহার অভাবিত সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। টপ্পার রাজ্যে রামনিধি অদ্বিতীয়। প্রেম-মূলক আখ্যায়িকাহীন শুদ্ধ সঙ্গীত—যাহা টপ্পার মধ্যেই সহজলভ্য, সেইরূপ অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভায় উধৃত সঙ্গীত দুইটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। গুপ্ত-কবি, কবিগানের এই সুপ্রাচীন কবির উদ্দেশে আপনার ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গীতে ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ রহিলাম।" এই ঋণ-স্বীকৃতির গৌরব বাঙালী-সমাজের চিরকালের সামগ্রী।

রঘুনাথ দাস

বাংলা সাহিত্যে রঘুনাথ দাস নাম লইয়া সহজেই বিভ্রাট বাধানো চলে। এক মল্লভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একাধিক বৈষ্ণব-পদকর্তা রঘুনাথ দাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে।[১] আলোচ্য রঘুনাথ—বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রেণীর নহেন, ইনি কবিওয়ালা কিন্তু বৈষ্ণব-প্রাণতার অভাব ইঁহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইবে না। প্রচলিত সিদ্ধান্তানুযায়ী কবিগানের আদি প্রবর্তক,—গোঁজলা গুঁই। গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য-ত্রয়ের অন্যতম হইলেন রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ দাসের জীবনকথা সম্পর্কে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কেহ বলেন রঘুনাথ সৎশূদ্র, কেহ বলেন কর্মকার। কেহ বলেন কলিকাতায়, কেহ বলেন,—সালিখা,—কেহ বলেন গুপ্তিপাড়ায় রঘুর বাস ছিল। রঘুর নিকটেই 'রাসু-নৃসিংহে'র 'কবি' শিক্ষা।" রঘুনাথের জীবনকাল সম্পর্কেও নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। তবে তাঁহার সুখ্যাত শিষ্যত্রয়ের (রাসু [১৭৩৪-১৮০৭], নৃসিংহ [১৭৩৮-১৮০৯], হরু ঠাকুরের [১৭৩৮-১৮২৭]) জীবনকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বলিয়া ধরিলে অযৌক্তিক হইবে না। সম্প্রতি বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে রঘুনাথ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারিয়াছি। ইঁহার নিবাস ছিল ছিল,—চুঁচুড়া। তন্তুবায় বংশীয় এই কবি কল্পনার কুঞ্জচ্ছায়ায় যে ভাবে ভাবচারণা করিয়াছিলেন তাহারই পথ ধরিয়া পরবর্তীকালের কবিওয়ালাগণ অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহার জীবনকাল হিসাবে ১৭২৫ খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা যায়। রঘুনাথের দুই পুত্র—মাধবরাম এবং নীলাম্বর। এই রঘুনাথ দাসেরই অন্যতম বংশধর ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস।[২] রঘুনাথের বর্তমান বংশধরদের

১ মল্লিখিত 'বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়ার বৈষ্ণব-গীতিকা'—রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ২।৬।৫৭ তারিখের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ "যাঁহার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পায়ু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতি প্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০৲ বেতনে (বয়স ২৮) নব প্রতিষ্ঠিত বীরভূম স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।..." ("বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" —সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিবাস বর্তমানে হাটখোলা চন্দননগর।[৩] রঘুনাথের রচিত তিনটি গান পাওয়া যায়। একটি ভণিতাযুক্ত এবং অপর দুইটিতে রঘুর নামোল্লেখ নাই। 'কবিওয়ালার গীত' গ্রন্থের সংকলক ঐ দুইটি সঙ্গীত রঘুর বলিয়া মনে করিলেও কবিগানের আদি সংগ্রাহক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঐ গান দুইটিকে হরু ঠাকুরের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। রঘুর নামযুক্ত গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'বঙ্গভাষার লেখক' এবং 'প্রীতি-গীতি' গ্রন্থের সঙ্কলকগণ নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিকেই রঘুর একমাত্র রচনা বলিয়া স্বীকৃতি জানাইয়াছেন।

ধিক ধিক ধিক তার জীবন-যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন, সে চাহে না, আমি তার যোগাই মন॥
যেখানেতে না রহিল মানী জনার মান, সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ,
সেধে কেঁদে হ'য়ে গেছে কলঙ্কভাজন।
একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন, কেহ সুখে থাকে কেহ দুঃখে জ্বালাতন।
শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায়, সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ॥
সখি পীরিতি পরম ধন জগতের সার, সুজনে কুজনে হলে হয় ছারখার,
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই! কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছনা।
যারে ভাবিব আপন সই তার এ বোধ নাই, এমন প্রেমের মুখে তারো মুখে ছাই,
হেন অরণ্য রোদনে ফল আছে কি, এ হ'তে সুখী একা যে থাকি,
ধরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জন॥
যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ আছে, কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন, এজন-মিলন না দেখি কখন,
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন॥

[৩] The social philosophy of 'Swami Vivekananda' গ্রন্থের লেখক শ্রীত্রিলোচন দাস মহাশয় রঘুনাথের বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। রঘুনাথ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ আমাকে তিনি জানাইয়াছেন। রঘুনাথ সম্পর্কে Dr. S. K. De লিখিয়াছেন—'Of Raghunath no trustworthy account remains.' ত্রিলোচনবাবুর নিকট হইতে সংগৃহীত উপযুক্ত তথ্য সেদিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রঘুনাথের উপর নানারূপ সন্দেহপাত করা হইয়াছে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। বর্তমান গ্রন্থের তথ্যসমূহ ঐরূপ সন্দেহের নিরসন ঘটাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিরহী-চিত্তের অপরূপ চিত্র রঘুনাথ আপনার অনুভূতির নিগূঢ় সংযোগে কাব্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য-কথার মর্মবাণী পরবর্তীকালে কবিগানের উপর যে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাসুনৃসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলেও হরু ঠাকুরের কাব্য-কথা অন্ততঃ উপর্যুক্ত মন্তব্যের সার্থক প্রমাণ।

রামজী দাস

গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্যত্রয়ের অন্যতম হইলেন রামজী দাস। রামজী দাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তিনি কোন এক সময়ে বীরভূম অঞ্চলে কবিগান গাহিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়।[১] তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন কবিওয়ালা হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন নিতাই দাস বৈরাগী, ভবানী বণিক, রাম বসু প্রভৃতি। রামজী দাসের নামাঙ্কিত যে বিরহ-সঙ্গীতটি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

মহড়া

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী করে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখী, শ্যামের এ লীলে॥
দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে॥

১ম চিতেন

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করে সই, যে জন গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আরো মায়াতে,
ব্রহ্মার মন ভুলালে॥

অন্তরা

হায়, দেখ প্রাণসখি,
যোগীজন যারে সদা করে ধ্যান।
যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান॥
যার বেণু-রবে, ধেনু সব ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে, হর-পার্বতী,
আসিতেন এই গোকুলে॥

অন্তরা

হায়, ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশুপক্ষীর ঝুরি ও দুটি নয়ান

১ম চিতেন

সীতা উদ্ধারিতে যে জন,
জলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদ-রেণু পরশে দেখ,
অহল্যা-পাষাণী মানবী-দেহ পেলে॥

১ 'সংবাদ প্রভাকর'—১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।

হায়, সবে বলে দয়াময়,
পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হলেন বলি রাজার
দ্বারেতে দ্বারী

২য় চিতেন

হিরণ্যকশিপু বধিতে যে জন,
নৃসিংহ-রূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ-ভক্তের কারণে হরি,
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে॥

অন্তরা

হায়, ত্রিপুরারি যার নাম জপে অবিশ্রাম,
দিবা রজনী।
বীণা যন্ত্রে গান গায়, সেই নারদ মুনি॥

৩য় চিতেন

শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে
বলে।
মৈত্র ভাবে যে জন করেছিল কোলে,
গুহকচণ্ডালে॥

কেষ্টা মুচি

এক শতাধিক বর্ষ পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের রচনা সংগ্রহের জন্য যখন চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন তিনি কেষ্টা মুচির বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আজ পর্যন্ত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। গুপ্ত-কবি লিখিয়াছেন,[১] —"যে কালে লালু-নন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সেকালে 'কৃষ্ণ' নামক একজন চর্মকার, যাহাকে সাধারণে 'কেষ্টা মুচি' বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদর পূর্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড় বড় 'ওস্তাদি' দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ মুচি হরু ঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার গীতের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, দেশটা ভ্রমণ করিয়া শেষটা কেবল একটা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা—

মহড়া

হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

১ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত।

চিতেন

শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষিকেশ,
রাখালের বেশ, এখন কোথা লুকালে।
মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে, গোপ গোপীকুলে,
গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে॥”

গুপ্ত-কবি গানটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া অপেক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সময়ে সঙ্গীতটিকে আনুমানিক সত্তর বৎসর পূর্বের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নিমে শুঁড়ি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিমে শুঁড়ি সম্পর্কে লিখিয়াছেন[১]—‘নিমে শুঁড়ি একজন গননীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি, হাড়ি এতদ্রূপ সৎকবি, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরও কত উত্তম হইবেন।’ ইহা ব্যতীত নিমে শুঁড়ির পরিচয় বা তাঁহার চেনার নিদর্শন আজিও পাওয়া যায় নাই। গুপ্ত-কবির সংগ্রচেষ্টার প্রভাবে নিমে শুঁড়ি আজ নামে মাত্র রহিয়াছেন। তাঁহার কাতির খ্যাতি জাগিয়া আছে কিন্তু কীর্তির চিহ্ন কালের কুটিল গতিতে সম্ভবতঃ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

লালু-নন্দলাল

রাসু-নৃসিংহের সমসাময়িক কবিওয়ালা—লালু-নন্দলাল। প্রাপ্ত-কবিওয়ালাগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবিওয়ালা হইলেন—গোঁজলা গুঁই। “গোঁজলা গুঁই-এর তিন সঙ্গীত, শিষ্য—লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী। পরবর্তীকালের কবিওয়ালদিগের মধ্যে ‘হরু ঠাকুর রঘুর শিষ্য, ভবানে বেণে রামজীর শিষ্য এবং নিতে বৈষ্ণব লালু-নন্দলালের শিষ্য।”[১] নিতাই দাসের ওস্তাদ লালু-নন্দলালের জীবন কথা সম্পূর্ণভাবে আজিও জানা যায় নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’ লালু-নন্দলালকে চুঁচুড়ার বলা হইয়াছে। ইনি বীরভূমের লোক ছিলেন বলিয়াও অনেকে মনে করেন। “প্রবাদ শুনিয়াছি কবিওয়ালা লালু-নন্দলাল বীরভূমের অধিবাসী এবং কচুজোড়ের নিকটবর্তী মুড়মাঠ গ্রামে তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার নাম

১ সংবাদ প্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।

কাল পাল (হরিধন), জাতি সৎগোপ।'[২] হরিধন প্রায় ৯০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'বীরভূম বিবরণ' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থের অপরাপর মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণযোগ্য। 'লালু-নন্দলাল একজনের নাম কিংবা রাম-নৃসিংহের মত দুইজনের নাম, ঠিক জানা যায় না,—লালুর অনেক গানে 'কবি লালু ভণে, নন্দলাল ভণে' এইরূপ ভণিতাও আছে। অনেকে বলেন, নিতাই বৈরাগী ইঁহার শিষ্য; বরুলের বলহরি রায়ও লালুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লালুর কোন গানই কেহ আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পান নাই, কিন্তু আমরা লালুর নানা রকমের পঞ্চাশটি সম্পূর্ণ গান পাইয়াছি।"[৩] লালু-নন্দলালের সঙ্গীতসমূহের পরিচয় সম্পাদক দেন নাই। লালু-নন্দলাল দুই পৃথক ব্যক্তি কি না—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে। বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডের সম্পাদকের বিবৃতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কবি লালু ভণে, নন্দলাল ভণে' এইরূপ ভণিতা তাঁহারা পাইয়াছেন। ইহা হইতে লালু এবং নন্দলাল—দুই পৃথক বলিয়া অনুমান করিলে অযৌক্তিক হইবে না। বিশেষতঃ এবিষয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা কাগজ-পত্র হইতে লালচন্দ্র এবং নন্দলাল—দুই পৃথক নামের ভণিতাযুক্ত একটি সঙ্গীতের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আচার্য শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—'লালচন্দ্র এবং নন্দলাল দুইজনের ভণিতা দেওয়া।' সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ওকি অপরূপ দেখি ধনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত
কিম্বা ফণী কিম্বা বেণী ॥
অলকা বেষ্টিত কনকে রচিত
শিতি কিম্বা সৌদামিনী!
তার অধ দেশে অন্ধকার নাশে
সিন্দুর কি দিনমণি ॥১
খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল
কি সফরী অনুমাণি।
কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর
কিছুই না জানি ॥২॥

২. বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত।
৩ ঐ

কিবা কামকুকহ কি তড়িতপুচ্ছ
কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি
কি কোক বিহীন পানি ॥৩॥
কি মৃণালদণ্ড কিবা করিশুণ্ড
কিবা বাহুর সুবলনী।
ত্রিবলি ত্রিগুণ কি কাম-সোপান
কিবা নাভি তরঙ্গিনী ॥৪॥
কিবা কটিদেশ কিবা পযুইয
মধ্যে শোভিছে কিঙ্কিনী।
কিবা রম্ভাতরু কিবা যুগ্যউরু
কিবা মরাল চলনি ॥৫॥
লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায়
চল্যাছ লো বিনোদিনী।
নন্দলাল ভণে চায়া আমাপানে
হাস্যা কথা কহ শুনি ।৬॥[৪]

গুপ্ত-কবি লালু-নন্দলালের একখানি মাত্র সঙ্গীত-সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' সংগ্রহ-গ্রন্থে যে দুইটি সঙ্গীত লালু-নন্দলালের নামাঙ্কিত রহিয়াছে তাহাকে নির্ভরযোগ্য রচনা বলা চলে না। কারণ ঐ সঙ্গীত দুইটি অপরাপর রচনাকারদের ভণিতায় সহজলভ্য। গুপ্তকবির সংগৃহীত লালু-নন্দলালের অপর সঙ্গীতটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহড়া

হোলো এই সুখো লাভো পীরিতে
চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥

চিতেন

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতালো কত দূর ॥

৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ সাল।

শেষে এই হোল, কাণ্ডারী পালালো,
তরণী লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে, শরণো লইলাম যার।
তবু তার মন পাওয়া সখি, আমারে হলো ভার ॥
না পুরিলো সাধো, উদরে বিচ্ছেদো,
মিছে পরিবাদো জগতে।

গুপ্ত-কবি এই সঙ্গীতটিকে তাঁহার সময় হইতে আশি বৎসর পূর্বেকার রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

রাসু-নৃসিংহ

ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া গ্রামের কোন কায়স্থ বংশে রাসু ১১৪১ সালে এবং নৃসিংহ ১১৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁহাদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায়। আনন্দীনাথের শ্বশুরবাড়ী চুঁচুড়া। গোন্দলপাড়ার গ্রাম্য পাঠশালাতেই রাসু-নৃসিংহ বাল্য শিক্ষা লাভ করেন।

চন্দননগর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে কবিগানের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রাসু এবং নৃসিংহ দুই ভাই কবিগানের প্রতি অল্প বয়স হইতেই অনুরাগী হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুই ভাই-এর একজন গান রচনা করিতেন ও অপরজন সুর সংযোগ করিতেন। রাসু এবং নৃসিংহ কে কোন্ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।[২]

ফরাসী সরকারের তৎকালীন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেকালে কবিগানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন কবি-দল আমন্ত্রণ করিয়া 'কবির লড়াই' উপভোগ করিতেন। রাসু ও নৃসিংহ, চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে রাসু-নৃসিংহ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শোনা যায় যে, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে রাসু-নৃসিংহের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।[৩] ভারতচন্দ্র যখন বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি কয়েকদিন গোন্দলপাড়ার কোন

---

১ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৪ সাল।

২ সংবাদ প্রভাকর। ১ মাঘ ১২৫১ সাল।

৩ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৪ সাল।

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অবস্থান করেন। সেই সময়েই ইঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের তখন প্রৌঢ়াবস্থা, রাসু-নৃসিংহ তখন যৌবনে উপনীত হইয়াছেন।

রাসু-নৃসিংহের মাত্র নয়টি সঙ্গীত সংগ্রহ করা গিয়াছে। সঙ্গীতগুলি সখীসংবাদ এবং বিরহ ভাবাশ্রয়ী। সংখ্যায় অল্প হইলেও ভাব-গুণে সঙ্গীতগুলি উচ্চমানের।

প্রাণোনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।......ইত্যাদি

উদ্ধৃত সঙ্গীতটি সহিত রাম বসুর বিখ্যাত 'হর নই হে আমি যুবতী, কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি' সঙ্গীতটির ভাব-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সেকালের প্রায় সকল কবিওয়ালার মধ্যেই শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির সহিত গভীর পরিচয়ের ভাব এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কাব্য-জগতের যে প্রভাব ছিল তাহা অবিসম্বাদিত ভাবে সত্য। রাসু-নৃসিংহ সে নিয়মের ব্যতিক্রম নন। কবিত্ব এবং ভাবের নূতনত্বে তাঁহাদের রচনার মূল্য যে অধিকতর উচ্চমানের হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

হরু ঠাকুর

গুরু-গৌরবে গৌরবিত হরু ঠাকুর কবিওয়ালা-সমাজে চিরস্মরণীয়।

হরু ঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গি। ইঁহার পিতা ছিলেন কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গি।[১] ইঁহার জন্ম হয় ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে। শৈশবকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কোন ভাষাতেই তাঁহার দক্ষতা ছিল না। অল্প বয়সেই শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া ৮।১০ বৎসর বয়স হইতেই শখের দলে জীল দিতেন। এই সময় হইতেই তিনি গোঁজলা গুঁই-এর অন্যতম শিষ্য কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকটসান্নিধ্য লাভ করেন। ধীরে ধীরে শখের কবি-দলে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। নিজেই সঙ্গীত রচনা করিয়া সুর সংযোগ করিতে লাগিলেন, "এবং যে সময়ে যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতেন। কিন্তু কবিতাকরে তাঁহাকে বড় অধিককাল রঘুর সাহায্য

১ 'বঙ্গভাষার লেখক,' 'বাঙ্গালীর গান', 'কবিওয়ালার গীত' এবং 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' গ্রন্থে হরু ঠাকুরের পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গি বলা হইয়াছে। গুপ্তকবির মতটি এখানে অনুসৃত হইয়াছে।

গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ পরমেশ্বরের পূর্ণ অনুকম্পায় তিনি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই গুরুর নিকট এমত গুরু হইলেন যে, গুরু হইয়াও রঘু তাঁহার নিকট লঘু হইল। কিন্তু হরু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সজ্জন ছিলেন, এজন্য গুরুর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া নিজ লঘুত্ব প্রচারে ত্রুটি করেন নাই। অর্থাৎ প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত যে যে গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আপন নাম গোপন রাখিয়া সর্বশেষে রঘুর নামে ভণিতা দিয়াছেন।[২] বর্তমান গ্রন্থে এরূপ ভণিতাযুক্ত সঙ্গীতসমূহ হরু ঠাকুরের বলিয়াই গৃহীত হইল।

শখের দল হইতে পেশাদারী দল গঠনের এক বিচিত্র ঘটনা হরু ঠাকুরের জীবনে ঘটিয়াছিল। শোভাবাজারের মহারাজ বাবু নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে একবার হরু ঠাকুরের শখের দলের কবি-গীত হইয়াছিল। হরু ঠাকুরের গীত বাবু নবকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই তিনি একজোড়া শাল হরু ঠাকুরকে বকশিশ স্বরূপ দিয়াছিলেন। "হরু তাহাতে অপমান ও লজ্জা বোধ করতঃ অভিমানে ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শাল ঢুলির মস্তকে অর্পণ করিলেন। মহারাজ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত অথচ কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া "ঐ গায়ককে এখানে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়" পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ উল্লেখ করাতে ঠাকুর অতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত ত্রাসিত ও কম্পিত কলেবর হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া ক্রোধভাব পরিহার পূর্বক সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; হরু আত্ম-বিবরণ জ্ঞাত করিলে মহামতি শোভাবাজার-পতি অতি সন্তোষচিত্তে তাঁহার প্রতি প্রীতি-পূর্বক নিজ নামে দল করিতে উপরোধ করিলেন।"[৩] শখের দলের হরু ঠাকুর সে উপরোধ রক্ষা করিয়া পেশাদার কবিওয়ালা হইলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত হরু ঠাকুরের সম্পর্ক বড় নিবিড় হইয়াছিল। মহারাজের মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর কবির দল বন্ধ করিয়া দেন। বাবু নবকৃষ্ণের পুত্র মহারাজ রাজকৃষ্ণ হরু ঠাকুরকে দল রাখিবার জন্য ও গান চালাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হরু ঠাকুরকে রাজী করাইতে পারেন নাই।

পাদপূরণ ক্ষমতায় হরু ঠাকুর ছিলেন অদ্বিতীয়।

একবার মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁহার সভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট 'বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে' পংক্তিটি রচনা করিয়া এই পংক্তিটিকে শেষ পংক্তি ধরিয়া একটি শ্লোক রচনা করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। পণ্ডিতগণ নানারূপ শ্লোক রচনা করিলেন, কিন্তু

[২] সংবাদ প্রভাকর, ১ পৌষ, ১২৬১ সাল।
[৩] ঐ

রাজার মনঃপুত হইল না। হরু ঠাকুর তখন গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন। রাজার আদেশে সেই বেশেই রাজসভায় আসিয়া পাদ-পূরণ সমস্যার সমাপ্তি ঘটাইলেন নিম্নোক্ত শ্লোকটি রচনা করিয়া,—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে॥

এই ধরনের পাদ-পূরণের দৃষ্টান্ত আরও আছে :

যথা

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।

পূরণ

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো দাসী বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুণো,
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে॥ ইত্যাদি।

তথা

তোমার আশাতে এ চারি জন।

পূরণ

তোমার আশাতে এ চারি জন।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্বক্ষণ॥
দরশো, পরশো, শুনিতে স্বভাষো,
করিতেছে আরাধন॥ ইত্যাদি।

হরু ঠাকুর ভবানী বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর প্রভৃতি সকল রকম গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেকালে হরু ঠাকুরের আখ্যা ছিল 'কবির গুরু হরু ঠাকুর।' হরু ঠাকুরের খেউড় এবং লহর গান ছিল সর্বোত্তম। কিন্তু অশ্লীলতার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই। তাহার ফলে, সেগুলির স্বরূপ নির্ণয় বর্তমান কালে অসম্ভব। হরু ঠাকুরের ভবানী বিষয়ক এবং সখীসংবাদ ও বিরহগীতি সমূহ যে

নিকৃষ্ট ধরনের ছিল না, তাহা বলিলে অন্যায় হইবে না। ভক্তিভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া যে কাব্য-অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই আনন্দের সামগ্রী।

হরি বোল্ বলিয়ে প্রাণো যাবে।
আমার এমন দিন কি হবে॥
অন্তিম সময়ে বন্ধুগণে,
আমার শ্রবণে হরিনাম শুনাবে।
পুরাণে শুনেছি করুণাময়ো,
হরি আমায় কি করুণা করিবে॥

তথা

হরিনাম লইতে অলস কোরো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি
ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥

বাবু নবকৃষ্ণের নগর-কীর্তন কালে এই সঙ্গীতটি হরু ঠাকুর রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি-প্রাণতার সহিত হরু ঠাকুরের যে নিবিড় স্বভাব-সম্পর্কের পরিচয় তাঁহার রচিত সঙ্গীত-বীথিকার ছায়া কুঞ্জের মধ্যে ধরা দেয়, তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবিওয়ালা হিসাবে হরু ঠাকুরকে অভিনন্দিত করিতে চাই না, কিন্তু তাঁহার রচনায় যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন তাহাতে কবির মনোজগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সখীসংবাদ-এর ক্ষেত্রে কবি যখন লাজ-ভয় শঙ্কিতা সখীর বিধুরা মনের মর্মকথা জানাইয়াছেন, তখন মনে হয় এই কাব্যকথা বৈষ্ণব কবিতারই নূতনতর সংস্করণ।

শ্যাম, শুন শুন যাও কেন রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি কুলবতীর মন
কুল সহিতে হে করিলে হরণ,
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী
সাক্ষাতে বাজাও শুনি আমার মাথা খাও॥

নিত্যদিনের ভাষায় সহজ সরল ধূলি-মলিন বাঙালীর মানস-আঙিনায় এই আবেদনের মূল্য চিরকালীন সম্পদের সমতুল্য। 'কথিত আছে, হরু ঠাকুর একদিন গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমি যদি গান ধরি আর দীনে ঢুলি ঢোল বাজায়, তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাত করিয়া ফেলিতে পারি। উত্তম রচক এবং অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন বলিয়াই হরু ঠাকুর সাধারণ লোকের মধ্যে 'কবির গুরু হরু ঠাকুর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।'[৪]

হরু ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে ভবানে বেণে, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা বিখ্যাত। ইঁহারা প্রত্যেকেই হরু ঠাকুরের দলে জীল দিতেন এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেকেই নিজের নিজের কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। ভবানে বেণে অল্পকাল পরেই রামজী দাসের অনুগত হন। ইঁহাদের প্রত্যেকের দলেই হরু ঠাকুর গান রচনা করিয়া দিতেন। ভোলা ময়রার প্রতি হারু ঠাকুরের পক্ষপাতিত্বের কারণে নীলু ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

হরু ঠাকুর ৭৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন,[৫] বলিয়া যে সংবাদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। তৎকালীন 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের ২১শে আগস্ট ১৮২৪ খৃস্টাব্দের সংখ্যায় যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। "২৩শে শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যা নিবাসী হরু ঠাকুর পরলোক-গামী হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতি সুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাংলা কবিতাতে ও গানেতে অতি খ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।" এই 'অতিখ্যাতির' কথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাষায় আরও মধুর হইয়া উঠিয়াছে—"হরু ঠাকুর স্বীয় ক্ষমতা ও গুণের প্রভাবে স্বয়ং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ সর্বপ্রিয় ও মান্য হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের কথা অধিক কি উল্লেখ করিব, তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গীতে গুরু রঘু প্রভৃতি প্রাচীন কবি কদম্বের উচ্চনাম প্রচ্ছন্ন করতঃ আপামর সাধারণ সর্ব সমাজে পূজ্য হইয়া 'ঠাকুর' শব্দে বাচ্য হইলেন।'[৬]

---

৪ কবির গান—আনন্দচন্দ্র মিত্র (সাহিত্য সংহিতা, ১৩১২ সাল)

৫ বাঙ্গালীর গানে ৭০ বৎসর বয়সে দেহান্তর ঘটে বলিয়া উল্লেখ আছে। এইরূপ মতের প্রকাশ ঘটিয়াছে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উক্তিতে—'Haru Thakur lived upto 1812' Bengali Literature in the 19th Century, Page 302.

৬ সংবাদ-প্রভাকর, ১ পৌষ, ১২৬১ সাল।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী সেকালের জনসাধারণের নিকট 'নিতে বৈরাগী' বা 'নিতাই দাস' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে কৃষ্ণদাস বৈরাগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় কবিওয়ালা নিতাই বৈরাগী সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"Nityananda-das Bairagi, popularly called Netai or Nite Bairagi, younger than Haru Thakur, but much older than Ram Basu, was one of the famous and popular kabiwalas of his time; but his fame rested more upon his sweet and melodious singing than upon his poetical composition."[১] কবিতা রচনা অপেক্ষা সঙ্গীতে তাঁহার পটুত্বের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁহার দলের সঙ্গীত-রচক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন গৌর কবিরাজ, নবাই ঠাকুর, লক্ষ্মীকান্ত যুগী (বা লোকে যুগী) এবং প্রধান গায়ক হিসাবে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলু ঘোষ। নিতাই-এর বিরহ সঙ্গীত ও খেউড় সেকালের জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়াছিল। "নিতাই দাস যদিও কোন শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই, অথচ সভ্যতা ও বক্তৃতাগুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না। কারণ, বাক্‌পটুতা তাঁহার ভাল ছিল এবং তিনি নিজে যে যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না। বিশেষতঃ অপরের আনুকূল্যে যে সকল কবিতা গান করিতেন, প্রায় সকলেই তৎসমুদয় তাঁহার কৃত বলিয়া জানিত। সেই গীতাবলীর শব্দ-পরিপাট্য ও বিশুদ্ধ-ভাব জন্য পণ্ডিতেরাও নিতাইকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন।....এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলেই ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন; পরাজয় হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকিত না। যেন হৃত-সর্বস্ব হইলেন এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার-নিদ্রা রহিত হইত, কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি ও কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে "নিত্যানন্দ প্রভু" বলিয়া

১ Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. S. K. De, P. 364

সম্বোধন করিতেন। ইঁহার গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠ্‌ছেন" বলিয়া গোঁড়ারা ঢল ঢল হইত। নিতাইয়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে, ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্বক কহিল, "হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, ফ্যার্ ঝদি কাল্ কুকিলের গান্ ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড় গা।" নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহাদিগের অস্থির চিত্ত সুস্থির করিলেন।[২]

'নিতে ভবানের লড়াই' সেকালের কবিগানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিকের কৃতিত্ব ছিল সমধিক। নিতাই বৈরাগীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কোন মন্তব্য করা কঠিন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"এই নিতাই দাস ১২২৮ সালে কাশিমবাজারের রাজভবনে দুর্গাপূজার সময়ে গাহনা করতঃ প্রত্যাগত হইয়া সাংঘাতিক রোগে তনুত্যাগ করিলেন।"[৩] কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যতম কবিগান সংগ্রাহক জানাইয়াছেন,—"১২৪০ বা ১২৪২ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০।৬৫ বৎসর হইয়াছিল।"[৪] অপর একজন সংগ্রাহকের মতে,—"ইনি ১১৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ সালে দেহত্যাগ করেন।"[৫] 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় এবং আচায সুশীল কুমার দে মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তারিখটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে ভাবে তাঁহার তথ্যটিকে পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে গুপ্ত-কবির মতামতটির উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

কবিগানের আদি সংগ্রাহক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে ১লা অগ্রহায়ণ, ১লা পৌষ এবং ১লা ফাল্গুন ১২৬১ সালের সংখ্যায় নিতাই দাস বৈরাগীর

২ সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১ সাল।

৩ ঐ

৪ প্রাচীন কবি-সংগ্রহ। ১ম খণ্ড—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত। পৃঃ ।০

৫ প্রাচীন কবিওয়ালাদের গীত। পৃঃ ১১০ [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৭৮ সংখ্যক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

নামাঙ্কিত যে সমস্ত সঙ্গীত সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি এবং এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিতাই দাসের অন্যান্য সঙ্গীত সকল বর্তমান গ্রন্থের সঙ্কলন অংশে সংযোজিত হইল। নিতাই দাসের বৈষ্ণবতা তাঁহার কাব্য-সংগীতের প্রাণরস। সংগৃহীত সকল গানেই এই পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া রহিয়াছে।

বলহরি রায়

কবির গুরু সেই বলহরি
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে,
যাই বলিহারি।

বীরভূম অঞ্চলের কবিওয়ালাগণের এই ছড়া আজিও লুপ্ত হয় নাই। 'কবির গুরু হরু ঠাকুরের' কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। কবিগানকে বিচিত্র শাখায় বিস্তৃত এবং জনপ্রিয় করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল হরু ঠাকুরের। বলহরির সেই রকম কোন গুণের সংবাদ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই।

বলহরি জাতিতে রাজপুত। তাঁহার পিতার নাম আলমচাঁদ রায়। আনুমানিক বাং ১১৫০ সালে অর্থাৎ ১৭৪৩-৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় বাং ১২৫৬ সালে অর্থাৎ ১৮৪৯-৫০ সালে।[১] বলহরির কনিষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ কবিগানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৩০১ সালে দশহরার দিন রাধাচরণ লোকান্তরিত হন। বলহরির একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল : বলহরি ভণিতায় নিজেকে 'দাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণবধারার অনুকৃতি বলিয়াই মনে হয়, কারণ তাঁহার বংশগত উপাধি ছিল 'রায়'। বলহরির নিবাস ছিল বীরভূম জেলার বরুল গ্রামে। 'কেহ কেহ বলেন বলহরি রায়, লালু-নন্দলালের শিষ্য'।[২] তাঁহার রচিত কবি-সঙ্গীতের অল্পতার জন্য তাঁহার কবি-প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা ঠিকমত সম্ভব হয় না তবে স্বাভাবিক কবিত্বের প্রভায় তাঁহার নামাঙ্কিত কবি-সঙ্গীতগুলি যে উজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহ নাই।

একি শুনি বংশীধ্বনি রাধে, বাজে গহন কাননে,
শ্যামের বাঁশীতে ডাকিছে বারে বার চল নিকুঞ্জ বনে,

১ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত
২ ঐ ঐ

আগুসারি সুকুমারী চল ওগো রাই,
রাধা রাধা রাধা বোলে ডাকিছে শ্যাম রায়,
তোমা বিনে সে গহন বনে,
তোমার পথ নিরখিয়া আছেন শ্রীহরি।

নিকুঞ্জে চল কিশোরী,
রাই গো হবে মহারাস, মনে অভিলাষ
অই বাজিল সঙ্কেতে বনে শ্যামের বাঁশরী ॥

শ্যামের মনমোহন বেশ কর ওগো প্যারী,
কুলনারী সুমাধুরী শুনে বংশী রব,
ঘর হ'তে আকুল হ'ল ব্রজের গোপী সব,
ত্যজে লোক-লাজ, গৃহ-কাজ,
ওগো চল ভেটি গিয়া সে বংশীধারী।

রাই জাতি যূথী মল্লিকা মালতী নানা ফুলে,
কমল অপরাজিতা করবী বকুলে,
হার গাঁথ মনোমত আজ কুতূহলে,
শ্যাম গলে দিব কুসুমের হার,

রাই ত্বরিতে কুঞ্জে চল আশা হরাইতে
গোপীকার,
ওগো শীঘ্রগতি রসবতী ছাড়ি কুললাজ,
রাসস্থলে ভেটি গিয়া নবীন রসরাজ,
মনের আমোদে ওগো শ্রীরাধে,
নয়ন ভরে হেরব আজ কুঞ্জ-বিহারী ॥
আর কৃষ্ণদরশনে রাই বিলম্বে কি আজ
চল নিধু বনেতে।
কি করিবে গুরু-গঞ্জনা, কি করিবে
কুল-লাজেতে ॥
কৃষ্ণসনে একাসনে রঙ্গে হবে প্রেমের সঞ্চার,
মনের আনন্দে গোবিন্দে লয়ে মহানিশি
করিবে বিহার ॥
শারদ পূর্ণিমায় শশী কিরণ বিলায়।
আনন্দে উল্লাসে গোপী কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
বলহরি দাস করে প্রতি আশ,
আজ হেরব দোঁহার রূপ-মাধুরী ॥

কৈলাসচন্দ্র ঘটক

বীরভূম জেলার কচুজোড়ের সর্বানন্দ সরস্বতী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং কুলপরিচয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজা রুদ্রচরণ ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। এ সম্পর্কে একটি ছড়া প্রচলিত আছে :

ঘাদবিন্দ সর্বানন্দ মল্লশরণ রামভদ্র
আর কচ্চিকাচরণ পাঁচে রুদ্রচরণ
বর্গীরে হলেন সদয়া রুদ্রে হলেন বৈমুখী।
ভাস্কর কল্লে ব্রহ্মহত্যা কাঁদল গাছের পালা পশুপক্ষী ॥

সর্বানন্দের পূর্ব-নিবাস ছিল বীরভূমের অন্তর্গত মল্লিকপুরে। ইঁহার পিতার নাম হরমোহন। হরমোহনের পুত্র বীরভূম অঞ্চলের কবিওয়ালা কৈলাসচন্দ্র। ইঁহার

জন্ম হয় ১২০৫ সালে এবং মৃত্যু ১২৮০ সালে। বরুলের কবিওয়ালা বলহরি রায় ইঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী; তবে ইঁহারা দুইজনে যে একই আসরে গান করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ পাওয়া যায়।[১] কৈলাসচন্দ্রের সহিত নিতাই দাস এবং স্বষ্টিধর ঠাকুরের একত্র গানের সংবাদও দুর্লভ নয়। কৈলাসচন্দ্রের একটি ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

গিরি পাষাণ হ'য়ে কি রবে, কবে অভয়া আনিতে যাবে।
হারা হ'য়ে তারা ধনে এ ছার প্রাণে নাইক প্রাণ তারা অভাবে॥
মণিহারা ফণির মত, নিরখিয়া আছি পথ
প্রাণ হয়েছে উমা-গত, যাও হে দ্রুত, গেলে নয়নতারা পাবে।
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্রে ভণে, জীবন-শূন্য গৌরী বিনে,
আন গিয়া উমাধনে, নাই কি মনে, দু'দিন বই সপ্তমী হবে॥

কবি কৈলাসচন্দ্রের ভক্তিভাব আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের দুই পুত্র—চণ্ডীকালী এবং অন্নদাচরণ। চণ্ডীকালী কিছুদিন কবির-দল চালাইয়া ছিলেন এবং অন্নদাচরণ নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালার দলে যোগ দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বষ্টিধর ঠাকুর

স্বষ্টিধর ঠাকুর বা ছিরু ঠাকুর বীরভূম জেলার কাঁকুটিয়ার বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। "যে বংশে চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন বিবাহ করিয়াছিলেন, ইনি সেই বংশের লোক। ইনি বাড়িতে ঝগড়া করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন, এবং কোন ভক্ত শিষ্যের অনুরোধে কচুজোড়ের নিকটবর্তী জান্দরী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বৈদ্য হইলেও এই বংশ বহুকাল হইতে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন। ছিরুরও অনেক শিষ্য ছিল। কবিওয়ালাদের মধ্যে কৈলাস ব্রাহ্মণ এবং ছিরু গুরুবংশীয় বলিয়া সকলেরই সম্মান-ভাজন ছিলেন। পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্ আবার ভাল বাঁধনদার বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। একটা কথা আছে যে, ছিরু যদি গান লিখিতেন, বলহরি তাহাতে সুর দিতেন এবং সে গান কৈলাসচন্দ্র যদি গাহিতেন তবে তাহার আর তুলনা মিলিত না।"[২] কৈলাসচন্দ্র, নিতাই দাস এবং ছিরু ঠাকুর একবার বীরভূমের এক আসরে গান করেন। তাঁহাদের

১ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত।

উত্তর প্রত্যুত্তরের ধারা হইতে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

প্রথমে কৈলাসচন্দ্র গাহিলেন—

বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান।
কাজ নাই বেশভূষণে কৃষ্ণ বিনে এখনি তেজিব প্রাণ॥
ব্রজেতে নাই বংশীধারী, নীরবেতে শুকসারী,
শূন্যময় হেরি যত পশুপাখী মুদে আঁখি
সকলে মৃত সমান।
বিনে বাঁকা মদনমোহন, শূন্য দেখি বন-উপবন, ঝরে দু'নয়ন;
আর কি দেখতে পাব, সেই মাধব কার কাছে করিব মান॥

নিতাই প্রশ্ন করিলেন,—

কাল অঙ্গে ধূলা কে দিলে বাপধন,
কেন কেন্দে এলি বনমালী মলিন তোমার চাঁদবদন।
ছল ছল যুগল আঁখি, বুক মাঝে ধারা দেখি কি দুখের দুলী;
আমার প্রাণ বিদীর্ণ জীবন শূন্য এখনি তেজিব জীবন।
মা হ'য়ে কি দেখতে পারি, ধূলা ঝাড়ি কোলে করি, আ মরি মরি;
কার গৃহে গেলে কে কাঁদালে, তার হিয়ে বটে কেমন।

হৃষ্টিদর এই প্রসঙ্গে উত্তর দিলেন—

যশোদে গো রব না আর গোকুলে।
গোপীরা সব ধূলা দেয় কাল বলে॥
তোমায় আমি জিজ্ঞাসিলাম,
রাণী গো কেন কাল হ'লাম,
জিজ্ঞাসিলাম, গৌরী পূজেছিলে তুমি কোন্ ফুলে।

(দশকুশী)

গোকুল ছাড়িয়ে এলাম, তোমার তরে বিকাইলাম,
তবে কেন অঙ্গে ধূলা দেয়—কেন কাল হ'লাম গো—

(ছোট)
ক্ষীর, সর নবনীর তরে, জনমিলাম তোমার ঘরে,
তুমি কি দিয়েছিলে জবা বিল্বদল, সেই গৌরী পায় গো—
দিয়েছিলে পদমূলে ॥

ইহা ব্যতীত কৈলাসচন্দ্রের মাত্র একটি গান সংগৃহীত হইয়াছে :

বিচ্ছেদ শেল হেনে গেছেন সেই বংশীধর,
তার উপরে পঞ্চম স্বর,
কোকিল করে সুমধুর স্বরে,
শুনি কুহুরব যত সখী সজল আঁখি সবে নীরব,
শবাকৃত সব, ব্রজে নাহি মাধব,
কেন্দে কন সেই কেশব বিনে শূন্য এসব,
এলি হ'য়ে কৃষ্ণের পক্ষ,
তুই রে কোকিল পক্ষ, রাধার পক্ষে,
কি দুর্দশা তা তো চক্ষে দেখিস্ না !

এখন যারে, যা যারে বিহঙ্গ,
বৈরঙ্গ রাই-অঙ্গ দগ্ধ করিস না,
সোনার কমলিনী কৃষ্ণ বিরহিনী,
মণিহারা ফণী শ্যাম কাঙ্গালিনী,
কোকিল তুই এখন কুহুরব যেন ডাকিস্ না ॥

দেখে দুখ দয়া হল না,
কোকিল পেয়ে মাধবী প্রিয়ে মত্ত হয়ে পিয়ে,
সৌরভ কর কুহুরব বেড়েছে গৌরব,
আবার ভ্রমর তায় দ্বিগুণ জ্বালায়
করি গুণ গুণ রব,
সাধের গোকুল শূন্য করি,
মথুরায় গেছেন হরি,
আকুল হ'য়ে কান্দছেন প্যারী জেনে তুই জানিস্ না ।

সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাই অধরা,
কুহুরব শুনি আকুল হ'য়ে কমলিনী চক্ষে বয় সহস্রধারা,
এখন দেখি না কোনো আধার শ্রীরাধিকার নাই অন্য বল,
এই বিচ্ছেদ অনল তাই তাহে দুর্বল,
বলের মধ্যে আছে শ্রীকৃষ্ণের নামটি সম্বল,
বলে সঙ্কটে প্রাণ রক্ষে, কর হে মাগি ভিক্ষে,
আছে সৃষ্টিধর মনের দুঃখে যা যা হেথা থাকিস্ না ॥

গৌর কবিরাজ

গৌর কবিরাজের জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে নিত্যানন্দের সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ বৈরাগীকে সঙ্গীত যোগাইতেন তাহা জানা যায়। "গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিতেন, অন্য গান তত উত্তম করিয়া রচিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত। উক্ত কবিরাজ নিত্যানন্দ ভিন্ন অপরাপর অনেক দলে সাহায্য করিতেন।"[১] গৌর কবিরাজ যে নিতাই দাস-বৈরাগীর দলে গীত বহু সঙ্গীতেরই রচনা করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের দিয়াছেন তবে নিশ্চয় করিয়া সেই সমস্ত সঙ্গীতগুলিকে নির্দেশ করিবার উপায় নাই। 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' পুস্তিকায় গৌর কবিরাজের নামযুক্ত যে সঙ্গীতটি সখী-সংবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহড়া

ও হরি নাবিক হে
পার কর যাব আমরা মধুপুরে।
আমরা গোকুলের কুলবালা গোপনারী,
যমুনার ঢেউ দেখে সব ভয়ে মরি
তাই তোমার ভগ্ন তরি,
এ দেহ পাপে ভারি,
ডুবিয়ে মের না হরি, অকূল নীরে ॥

খাদ

কত্তে পার হে পার
বার বার তাই ডাকি তোমারে ॥

ফুকা

জানি শ্যাম তুমি নাবিক ভাল,
পারকাণ্ডারী ভাল, জানে জগতময়,
আছে পরিচয়, হায় হে!

---

১ সংবাদ প্রভাকর। ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।

ভাবলে তোমার চরণ তরি,
পার হ'য়ে যায় ভববারি,
ঐ পদে নাবিকের তরী কাষ্ঠ সোনা হয় ॥

মেলতা

দিয়ে সেই তরী পার কর হে যমুনায়।
ঘুচাও মনের ভয় হে!
পাষাণকায় উদ্ধার কল্লে অহল্যারে

১ চিতেন

গোপী সব দধির সজ্জা সাজাইয়ে ॥

পাড়ন

সবাই প্রাতে উঠে, দধি লয়ে ঘটে,
পারঘাটে ভাবে দাঁড়ায়ে ॥

ফুকা

লয়ে সঙ্গেতে রাই রঙ্গিণীরূপে সৌদামিনী,
চাঁদবদনী প্রায়, যাবেন মথুরায় হায় গো।
যমুনা ঐ রাইকে হেরে, প্রফুল্ল হ'য়ে অন্তরে,
ত্বকূল ভাসে অকূল-নীরে, বেগে উজান ধায়

মেলতা

রাধায় কত্তে পার রাধাকান্ত তরী লয়ে,
কূলে দাঁড়ায়ে,
গোপী সব বলে হরির চরণ ধরে ॥

অন্তরা

দেখ দেখ হে নবীন নীল কাণ্ডারী!
সাবধানে হাল ধর, দেখিতেছি যমুনায়
তুফান ভারি।

যদি ভয় পাও বাদাম তুলে,
ডাক জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, যমুনার
জলে
তবে পারাবার, কত্তে পারবে পার,
পারে তরী হবেন রাই-কিশোরী

২ চিতেন

চিরদিন দধি লয়ে মথুরায় যাই ॥

পাড়ন

দিনের মধ্যে দুবার, আমরা হই পারাপার,
অপার আর কখন দেখি নাই ॥

ফুকা

আজ কি বিষম বিপদ তরঙ্গ, হেরে হয়
আতঙ্ক,
নারীর অন্তরে, অঙ্গ শিহরে হায়,
নিত্য যোগাই কংসের দধি,
যমুনা আজ প্রতিবাদী,
কৃষ্ণ পার কর যদি, তবে যাই পারে ॥

মেলতা

দেখ্‌লেম অকূলের পারাপারের অন্য
উপায় নেই।
মনে ভাবি তাই তাই হে!
তোমা বৈ পার কত্তে নাই ত্রিসংসারে ॥

ভবানীচরণ বণিক

ভবানী বণিক বা ভবানে বেণে প্রাচীন কবিওয়ালা সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। ইনি জাতিতে গন্ধবণিক। "কলিকাতা—বরাহনগরে ইহার জন্মস্থান। কেহ কেহ বলেন,—বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার নিকট সাতগেছে গ্রামই ইহার জন্মভূমি।"[১] প্রাচীন কবি-সংগ্রহের সঙ্কলক ভবানীচরণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"ইঁহার নিবাস কলিকাতা যোড়াসাঁকো। ইনি বাণিজ্য-কার্য করিতেন। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। উঁহার বংশাবলীর কেহই নাই।"[২] নিশ্চয় করিয়া তাঁহার জন্মস্থান বা জন্মকাল নির্দেশ করা বর্তমানে অসম্ভব।

ভবানীচরণের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় হরু ঠাকুরের দলে। "ভবানে বেণে ও নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে জীল দিত। পরে দোহার অর্থাৎ গায়কের দলে নিযুক্ত হন। এইরূপে কিছুদিন গত করিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ব স্ব নামে দল স্থাপন করিলেন। তৎকালে হরু সকলকেই গীত ও সুর প্রদান করিতেন। অতি অল্প দিবস পরেই ভবানী বেণে রামজীর অনুগত হইয়া তাহারই নিকট গীত লইতে আরম্ভ করিল। সর্বশেষে, রাম বসুর আশ্রিত হইয়া সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিল।"[৩]

কবিওয়ালা রাম বসু প্রথম বয়সে ভবানী বেণের দলে থাকিয়া গান রচনা করিতেন। ভবানী বেণের সহিত অল্প বয়স্ক রাম বসুর পরিচয় প্রসঙ্গ অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা।[৪] ভবানীর উৎসাহে রাম বসুর কবি-প্রতিভার বিকাশ সাধন সহজতর হইয়াছিল।

ভবানী বেণে ও নিতাই বৈরাগীর কবিতা-সংগ্রাম সেকালের রসিক মহলে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। "এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল 'নিতে-ভবানের লড়াই' শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য অনেক দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক—এই তিন জনের দল সর্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল।"[৫]

১ 'বঙ্গভাষার লেখক'। পৃঃ ৩৮২

২ প্রাচীন কবি সংগ্রহ, ১ম খণ্ড—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। পৃঃ

৩ সংবাদ প্রভাকর। ১ পৌষ, ১২৬১ সাল।

৪ রাম বসু প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৫ সংবাদ প্রভাকর। ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল।

ভবানীচরণের অধিকাংশ রচনাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে কয়টি সঙ্গীত সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রকৃত প্রেমিকার বিরহ-ব্যথার আকুল আবেদন বেদনার রসে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণ-কলঙ্কে কলঙ্কী হইবার শ্লাঘায় শ্রীরাধিকার অন্তর পূর্ণ। মাত্র কয়েকটি সঙ্গীতের মাধ্যমেই ভবানীচরণ আপনার অনুভবের বার্তা সঠিক ভাবে আমাদের জানাইতে পারিয়াছেন।

নবাই ঠাকুর

নবাই ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস-বৈরাগীর দলের সঙ্গীতরচক ছিলেন তাহা জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সংবাদ প্রভাকরে (১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১) লিখিয়াছেন, "নবাই ঠাকুরের নিবাস কোথায় তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, ফলে রচনা পক্ষে সবাই নবাই ঠাকুরের অনুরাগ করিয়া থাকেন। ইনি সকল প্রকার গান নির্মাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তন্মধ্যে সখী-সংবাদ সর্বদাই উত্তম হইত এবং আসরে ভাল উত্তর কাটিতে পারিতেন।" নিতাই বৈরাগীর দলে ব্যবহৃত সঙ্গীতসমূহের মধ্যে ইহার রচনা যে রহিয়াছে তাহা মনে করা যায়, তবে কোন সঙ্গীতকেই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে ইহা নবাই ঠাকুরের রচিত। নবাই ঠাকুরের নামযুক্ত একটি মাত্র প্রাপ্ত সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

মহড়া। জানি জানি হে চেনা নাবিকের এমন ধর্ম নয়।
অগ্রে পারাপার না হয়ে কে দান দেয় বল,
বাজারের বিকিকিনির সময় গেল,
ত্বরায় পার কর এখন, হাট করে আস্‌বো যখন
তোমায় বুঝে দান দিব তখন পারের সময়॥

খাদ। যে জন বেতন ভুগী, বঞ্চনা তার কি উচিত হয়॥

ফুকা। যার নাই পারের সম্বল সঙ্গেতে,
তারে কি পারে নিতে তুমি পারবে না।
পার কি করবে না হায় হে!
অর্থ বিহীন শত শত, ত্রিজগতে আছে কত,
তাদের পার না কর্‌লে, আর তো তোমায় ডাক্‌বে না॥

মেলতা। তুমি অনায়াসে কত্তে পার অকূলে পার,
এ নয় তেমন পার হে।
তাইতে লোকে বলে তোমায় দীন দয়াময়॥

১ চিতেন। কি কথা বল্লে নাবিক পারের।

পাড়ন। অগ্রে দান সাধিবে শেষে পারে লবে,
তবে পার করবে যমুনায়॥

ফুকা। একে তোমার ভগ্ন তরী, তাহে উঠে বারি,
দেখে লাগে ভয়, তরী ভাল নয়, হায় হে!
দেখে রাধায় কাঁচা-সোনা,
দান চাইলে তার কানের সোনা,
এ সব কথা কেলে-সোনা, শুন্‌লে লজ্জা হয়॥

মেলতা। তুমি বাঁশীতে উপাসনা কর যারে,
সুমধুর স্বরে হে সুমধুর স্বরে হে,
চিন্তে পার্ল্লে না হে সেই শ্রীরাধায়॥

রাম বসু

বাঙালীর জীবনে শরৎ শেফালিকা যেমন সত্য, কবিওয়ালা রাম বসুর গীতি-সম্পদও তেমনি সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ রাম বসুর জন্মকাল (১১৯৩ সাল)। কলিকাতার নিকটবর্তী সালিখা গ্রামের রবিলোচন বসু তাঁহার পিতা[১] এবং নিস্তারিণী দাসী তাঁহার মাতা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাম বসুর কবি-খ্যাতির দীপ্তি-প্রাখর্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সময়ের এই সুদীর্ঘ স্রোত বাহিয়া, রাম বসুর কাব্যতরণী আজিকার রসিক-জনচিত্তের তটভূমিতে আসিয়া যখন নোঙর ফেলে তখন তাহার আবেদনের গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের লক্ষণই এই। সীমিত গণ্ডীর মধ্যে যাহার আবেদন নিঃশেষিত না হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে কাব্য বা সাহিত্য তাহার রসলোকে রসিক-সমাজকে প্রতিনিয়ত আমন্ত্রণ জানায় তাহাই সার্থক কাব্য বা সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত।

১ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৪ সাল। Dr. S. K. De লিখিয়াছেন—'His father's name was Ram Lochan Babu. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাম বসুর পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই।

কও দেখি উমা কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা ক'রে॥
শুনিয়া জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নি, কণকবরণি তারা॥
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকল পরা॥
আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণি ধরে অঙ্গে ভূষণ করে॥

অতিপ্রিয় এবং পরিচিত এই 'সপ্তমী-সংগীত' যেন বাঙালী-জীবন-চর্যার ব্যথা-বেদনাদীর্ণ একটি অধ্যায়ের প্রতীক। উমা-মেনকার বিরহ-মিলন-সংবাদ সমগ্র জাতির জীবন-নাটক-সংবাদেরই অন্যতম একটি পরিচ্ছেদ। "It is not the super-human picture of ideal goodness but the simple picture of a Bengali mother and a daughter that we find in the Menaka and Uma of Ram Basu. We seem to hear the tender voice of our own mother, her anxious solitude of her daughter, her weekness as well as strength of affection......" (Dr. S. K. De.) রাম বসু তাঁহার কাব্যের তুলিকায় বাঙালী-মানসের মর্মমূলের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার 'আগমনী-সঙ্গীত' ছাড়াও বিরহ-বিচিত্রার পর্যায়-কথন আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ ভাবে জয় করিয়া লয়।

রাম বসু ছিলেন স্বভাব কবি। "রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতাস্থ জোড়াসাঁকো নিবাসী মান্যবর ৺বারাণসী ঘোষের বাটিতে তাঁহার পিসার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। ইনি জন্মকবি ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন। যখন পাঠশালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাতে লিপিবদ্ধ করিতেন।"[২] শৈশব কাল হইতে সঙ্গীত রচনার অভ্যাস তাঁহাকে অল্প বয়সেই খ্যাতির অধিকারী করিয়াছিল। কবিওয়ালা রামজী দাসের প্রসিদ্ধ শিষ্য ভবানী বেণের দল তখন খুব বিখ্যাত। ভবানী বণিক একদিন জোড়াসাঁকোর পথ দিয়া যাইতে যাইতে কয়েকটি

২ সংবাদ প্রভাকর। ১ আশ্বিন, ১২৬১ সাল।

সঙ্গীত কুড়াইয়া পান। সঙ্গীত-রচনাকারের খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন, ইনি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রামমোহন বসু[৩] ওরফে রাম বসু।

রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের মত রাম বসু অল্প বয়সেই বিদ্যার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রথম জীবনে কেরানীগিরি করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সঙ্গীত রচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে লাগিল। পরে তিনি এই কর্ম পরিত্যাগ করেন। ভবানী বেণের সহিত তাঁহার আকস্মিক পরিচয় তাঁহার কবি-খ্যাতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। "সর্বাগ্রে তিনি ভবানে বেণেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার, সর্বশেষে ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতাবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল গঠন করিয়া বসেন। সেই দল "রাম বসুর দল" নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্বস্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন।"[৪] পিতার পরলোক গমনের পরই রাম বসু তাঁহার নিজস্ব দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

রাম বসুর সঙ্গীতসমূহ সাধারণতঃ তিনটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। আগমনী, সখী-সংবাদ ও বিরহ। আগমনী গানের অন্তর-ধর্মের বিচিত্র-বিকাশ পূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। সখী-সংবাদের ক্ষেত্রে রাম বসুর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

হর নই হে, আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি?
ক'রো আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হোয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ।
একি রঙ্গ হে তোমার!
হর ভ্রমে শরাঘাত,
কেন করি করিতেছ বারে বার,
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কত মহেশ,
চেন না পুরুষ-প্রকৃতি॥

৩ সংবাদ প্রভাকর, সাহিত্য সংহিতা এবং Dr. De-এর গ্রন্থানুসারে তাঁহার নাম রামমোহন বসু। 'বঙ্গ ভাষার লেখক' গ্রন্থে ভুলক্রমে রামচন্দ্র বসু লিখিত আছে।

৪ সংবাদ প্রভাকর। ১ কার্তিক, ১২৬১ সাল।

হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হ'য়ো না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে এতো জটা ভার॥
কণ্ঠে কালকূট নহে,
দেখ পরেছি নীল রতন,
অরুণ হ'ল নয়ন,
ক'রে পতি-বিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

অনুরূপ ভাবের বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত হইল :

কতি হুঁ মদন তনু দহসি আমারি,
হাম নহ শঙ্কর হু বরনারী ;
নাহি জটা বেণী বিভঙ্গ।
মালতি-মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু
ভালে নয়ন নহ সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল ইহ না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ-পঙ্ক॥[১]

জয়দেবের বিরহ-খিন্ন কৃষ্ণের আবেদনও সেই একই সুর-বর্তী।—

হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয় দলশ্রেণী কণ্ঠেন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,
প্রহরণ হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কি সুধাবসি॥

১ পদামৃত মাধুরী। পৃঃ ৬৬৭

'আগমনী' ও 'সখী-সংবাদ' ব্যতীত রাম বসুর বিরহ-সঙ্গীত কবিগানের ক্ষেত্রে এক অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টি। সেইজন্য রাম বসুকে বলা হইয়া থাকে 'বিরহের রাজা।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাম বসুর কাব্য-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রকের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে 'রাম বসুর গীত'' ।[৬] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যকে উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু একালের মনস্বী সমালোচক-পণ্ডিত যখন অনুরূপ মন্তব্য করেন তখন অস্বীকার করার হেতু থাকে না। 'Ram Basu is often regarded as the greatest poet of this group: but he is at the same time the most un-equal poet."[৭]

অনেকের মতে কবিগানের ইতিহাসে আরও একটি অধিকতর কৃতিত্বের অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন রাম বসু। "রাম বসু আসরে উত্তর রচনা করিয়া গান করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন।" [৮] রাম বসুকে কবিগানের ক্ষেত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রবর্তক হিসাবে সম্মানিত করিবার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা মনে পড়ে। তিনি এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। রাম বসুর পূর্ববর্তী নিতাই দাস-বৈরাগীর আলোচনা প্রসঙ্গে 'নিতে ভবানের লড়াই'-এর কথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'লড়াই' যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া হয় নাই এমন অনুমানকেও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা চলে না। উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রবর্তক না হইলেও রাম বসু কবিগানের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। রাম লোকান্তরিত হন ১২৩৬ সালে অর্থাৎ ১৮২৮ খৃস্টাব্দে।

নীলমণি পাটনী

নীলমণি পাটনীর জীবন-কাল নিরূপণ করা বড় শক্ত। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "ইনি হরু ঠাকুর ও রাম বসুর পূর্ববর্তী কবিওয়ালা।" ইঁহাকে রাম বসুর পূর্ববর্তী বলিতে কোন অস্বীকৃতি নাই, কিন্তু হরু ঠাকুরের পূর্ববর্তী

৬ সংবাদ প্রভাকর। ১ কার্তিক, ১২৬১ সাল।

৭ Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. S. K. De. P. 370

৮ প্রাচীন কবি সংগ্রহ, ১ম খণ্ড—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৵০
(ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এই মন্তব্য অনুসরণ করিয়াছেন।)

বলিতে দ্বিধা জাগে। ইনি যে হরু ঠাকুরেরই সমসাময়িক তাহার প্রমাণ হিসাবে "সমাচার চন্দ্রিকা"র ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৩২ সালে প্রকাশিত সংখ্যার সংবাদটি উল্লেখযোগ্য। '...লক্ষীকান্ত কবিওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালা ৩০ কার্তিক সোমবার জ্বরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।' হরু ঠাকুর ইহারই চার মাস পূর্বে ২৩শে শ্রাবণ মারা যান। যাহা হউক কবিওয়ালা হিসাবে নীলমণির খ্যাতি যে বিশেষরূপেই ছিল তাহা জানা যায়। ইহার দলের অন্যতম সঙ্গীত-রচক ছিলেন গদাধর মুখোপাধ্যায়। 'ভবানী-বিষয়ক' এবং 'সখী-সংবাদ' গীতে নীলমণির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার রচিত সঙ্গীতসমূহ বর্ত্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল :

মা হরারাধ্যা তারা,
তোমার নাম, মোক্ষধাম, তন্ত্রে শুন্‌তে পাই :
তাইতে তারা, তোমায় তারা,
তারা তারা তারা বোলে, ডাকৃছে মা সদাই ॥
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমায় ধরা সে ত বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।
এবার বেঁধেছি মন আঁটাআঁটি,
করেছি মন খুব খাঁটি,
তারা মা গো, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি,
আর পালাতে পারবি নে।

তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা,
হৃদয় কাননে ॥
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরু মহামন্ত্র-জাল,
সাধন পথে সেই জাল পেতে
থাকৃবো কিছু কাল,—
এখন ভক্তি ডোর করেছি হাতে,
তারা যদি যাস্ সে পথে,
ধরৃবো মা তোর হাতে নাতে
বাঁধবো দুটি চরণে ॥
মন কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো
মা অতি যতনে।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা,
ষোড়শপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল্,
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি করে,
মানসে নৈবেদ্য করে,
দিব মা তোর চরণ ধোরে, নির্মল গঙ্গাজল ॥

আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি
অজা বলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বলি বদনে ॥
মা এবার পালাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।
তারা ধর্‌বো বলে তারা,
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই ॥
মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে, কি কোন্ ভাবেতে রও;
করে যতন, বহু যতন,
ধন ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও।
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে
অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।
তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে,
মশানেতে অভয় দিয়ে রক্ষা কর্‌লি তায় ॥
এখন পরমার্থ পরম ধনে,
আছিস্ মা তুই পরমধনে,
তারা গো! তোমায় যে ভজেছে,
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥[১]

চিতেন। যদি ওগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে করি মান!
পর-চিতেন। রাখি মনকে বেঁধে, কিন্তু শ্যামের খেদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যাম্‌কে হের্‌ব না আর সখি, বলি চক্ষু মুদে থাকি,
কিন্তু সে রূপ প্রাণ সই অন্তরে দেখি।
১ম মেল্‌তা। হয়ে কৃতাঞ্জলি, বনমালী, বলে স্থান দিও রাই চরণে,
মান্ করে মান রাখতে পারি নে।
মহড়া। আমি যে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল জলধর বরণে।
খাদ। অতএব অভিমান আর করিনে।
২ ফুকা। আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, হেরি সেই কালরূপ সদা;
কৃষ্ণের প্রেমডোরে প্রাণসই, প্রাণ বাঁধা।
২ মেল্‌তা। আমার হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা নয়নে ॥[২]

১ 'বাঙ্গালীর গান'। পৃঃ ১৯৬
২ 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ'। পৃঃ ১৮

মহড়া। আর সহে না কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস্ নে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।
শুনরে নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নজলে।
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল,
কি গোপ কি গোপীকুল, পশুপক্ষীকুল,
বিরহে সকলে ব্যাকুল।
তেজে বকুল মুকুল, অধীর অলিকুল সব,
কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে॥

চিতেন। বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহিণী, কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী,
ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে॥

অন্তরা। এমন দুখের সময়, কোকিল পক্ষীরে,
কেনে তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে॥

চিতেন। অধরা ধরাসনে পড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বধিস্‌নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা,
দুখিনীর কথা রক্ষা কর॥

কোকিল দেখ্‌লি তো স্বচক্ষে,
মরণের অপক্ষে আর নাই,
হোয়ে রয়েছি জীবন্মৃত সকলে।"[৩]

নীলমণি ঠাকুর

নীলু ঠাকুরের কবির দল নানা কারণে বিখ্যাত হইয়া আছে। রাম বসু প্রথমাবস্থায় ইহার দলের সঙ্গীত-রচক ছিলেন। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, হরু ঠাকুর প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের নিকট হইতেও ইনি সঙ্গীত-সংগ্রহ করিতেন। ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রভৃতির সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ পাওয়া যায়। "প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে অনুমান ৬০ বৎসর বয়সের সময় নীলু ঠাকুর পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রামপ্রসাদ এই দলের অধিপতি হন।"[১] নীলু ঠাকুরের মৃত্যু সম্পর্কিত একটি তথ্য তৎকালীন 'তিমির নাশক' নামক পত্রিকার ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ সংখ্যা হইতে জানা যায়। "শুনা গেল যে গত ২৬ কার্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যা নিবাসী নীলু ঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুই ভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলু ঠাকুরের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহা দুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতু নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইঁহারা কবিতা গান দ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন। ইঁহারদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সম্প্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলু ঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন। এক্ষণে ইঁহার কাল হওয়াতে সেসুখের ব্যাঘাত হইল, সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।" নীলমণি ঠাকুরের নামাঙ্কিত যে কয়টি সঙ্গীত সংগ্রহ করা গিয়াছে নিম্নে তাহা দেওয়া গেল :

সখী-সংবাদের ক্ষেত্রে কবি যে চাতুর্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন তাহা লক্ষ্যণীয়।

মহড়া। অমনি ভাল শ্যাম হে তুমি রাধার নাম
আর করো না এই মধুপুরে।
শুনে কুবজা মরে রবে, সেই দশা আবার হবে,
বোঝো মনে, যেমন রাজার দুর্জয় মানে,
আবার কুব্জার মান ভাঙ্গাতে হবে তেমনি করে॥

---

৩ গুপ্ত রত্নোদ্ধার। পৃঃ ২০৮

১ 'বাঙ্গালীর গান'।

খাদ। শুন বনমালী বলি বিনয় করে ॥

ফুকা। যদি ভালবাসিতে শ্রীরাধারে,
আসিতে না যমুনা পারে, ওহে বাঁকা শ্যাম,
ওহে বাঁকা শ্যাম, করোনা আর রাধার নাম।
কুব্জার নাম কর সাধন, জুড়াবে শ্যাম তাপিত জীবন,
সুখী হবে সুখে রবে পাবে মোক্ষধাম ॥

মেলতা। যেমন তুমি হে বাঁকা রাজা মথুরায়,
ওহে শ্যামরায় হে শ্যামরায় হে,
তেমনি পেয়েছ রাণী কুবজারে ॥

চিতেন। বলে যাও রাধা রাজার রাজ্যে বাস কর সকলে ॥

পাড়ন। তোমার কথা শুনে, ভাবি মনে মনে,
কি করে যাব গোকুলে ॥

ফুকা। রাধার সর্ব্বস্ব ধন চিন্তামণি,
তুমি হে শ্যামগুণমণি, ফণির মণি প্রায়,
বলবো কি তোমায়, শুন হে শ্যাম রায়,
তুমি রইলে মধুপুরে, আমরা যাব কেমন করে,
ব্রজে গেলে, রাই শুধালে, বলবো কি রাধায় ॥

মেলতা। তোমার কুব্জা যায় ভাল থাকে সেই ভাল,
ভাল ভাল হে শ্যাম, বেঁধেছে কুব্জা তোমার প্রেম।

অন্তরা। যেমন সাধ করে সেই রাধার নাম
আদরিনী নাম রেখেছিলে শ্যাম।
সে আদর সব কোথায় এখন,
ওহে বংশীধারী শ্যাম, বল শ্যাম শ্যাম হে,
রাধার সে নাম এখন, দিয়ে বিসর্জ্জন,
সার ভেবেছ মনে কুব্জার নাম ॥

চিতেন। তেমনি শ্যাম আদর করে কুব্জার মান রাখ মথুরায়

পাড়ন। তবে সমাদরে, অতি আদর করে,
তোমারে রাখিবে শ্যামরায় ॥

ফুকা। কৃষ্ণ ত্রিজগতে সবাই শুনেছি নাম বিপদকালে,
রাধা কৃষ্ণ কয়, ওহে রসময়, শুন হে শ্যাম দয়াময়,
বুঝে দেখ মনে মনে, শয়নে আর কি স্বপনে,
কুজা কৃষ্ণ কে বলে শ্যাম বিপদ সময়॥

মেল্‌তা। এখন বল হে বল কৃষ্ণ বল হে প্রাণকৃষ্ণ হে
তাই কি দোষে এলে রাধায় ত্যজ্য করে॥

মহড়া। মেয়ে হয়ে রাই, মধুর কৃষ্ণ নাম
লেখালি তোর রাঙ্গা পায়।
জপে কৃষ্ণ নাম ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী,
সেই নাম তোর পায়ে গো লিখলেন বংশীধারী,
ঐ নাম জপিলে তুণ্ডে, কালে কালের ভয় খণ্ডে,
জপে কৃষ্ণ নাম অজামিলে বৈকুণ্ঠে যায়॥

খাদ। এ কি লজ্জার কথা তোর কথা শুনে লজ্জা পায়॥

নীলু ঠাকুরের সঙ্গে ভোলা ময়রার কবিতা-যুদ্ধের কথা আমরা জানিতে পারি। ভোলা ময়রার মত তীক্ষ্ণধী, বাক্‌পটু কবিওয়ালাকে তিনি যে ভাবে অপদস্থ করিয়াছিলেন তাহা কম বিস্ময়কর নয়।

চিতেন। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
তুই ভজিস্ ঢেঁকি, বলিস্ কি না গৌর অবতার॥

মহড়া। কিসে করিস্ দ্বেষ, ঘটে নাই বুদ্ধি লেশ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ওরে মূর্খ! দিস্ কোন্ ঠাকুরের ঠেস্।
তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে, নিয়ে করিস্ বাচাভুর!
সেই হরি কি তোর্ হরু ঠাকুর?

মেল্‌তা। যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা কর্লেন ব্রজপুর,
যাঁহার অভয় চরণ শিরে ধরে, জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর॥
যে রজক ছেদন করে ক'রে ধ্বংস কর্লে কংসাসুর!
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর?

চিতেন। এখন্ বুঝ্‌লি ত এই হৃষ্ণ নয়, সেই হরি সারাৎসার,
পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার!
শুন্ রে বলি মূঢ়, এর খুঁজে না পাই কুঁড়,
তোর ঠাকুরকে বল্‌তে বল্ ভেঙ্গে এর নিগূঢ়!

মহড়া। হরির সকল ভক্তে সমান দয়া, এর সে বিষয়ে অনেক থাম।
বুঝব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা সিদ্ধির গোঁসাই, আমার প্রতি কেন বাম?
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির, কি মুসলমানের পীর;
তাই বল্ দেখি জাঁগার্।
পূজো পঞ্চ উপাচারে, খান কি এক পীঁড়িতে পাঁচ মোকাম,
হৃষ্ণ দৈবকীর নন্দন কি?
আবার কতমা বিবির হন এমান।

এই কটূক্তি শুধুমাত্র ভোলা ময়রার উপর বর্ষিত হয় নাই, হৃষ্ণ ঠাকুরের উপরও এই বিদ্রূপবাণ সমভাবেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেকে বলেন উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির রচক হইলেন কবিওয়ালা রাম বসু। কিন্তু গুরুর প্রতি এই অশালীন শরনিক্ষেপ কবিওয়ালা রাম বসুর দ্বারা হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। কবিওয়ালা হিসাবে নীলমণি ঠাকুরের খ্যাতি ছিল সমধিক কিন্তু তাঁহার রচিত গীত বা সংগৃহীত সঙ্গীতের সংখ্যা বড় অল্প।

রামপ্রসাদ ঠাকুর

রাম বসুর জীবন-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামপ্রসাদের সহিত রাম বসুর যে 'কবিতা-যুদ্ধ' হইয়াছিল তাহার সামান্য বর্ণনা দিয়াছেন। বিখ্যাত কবিওয়ালা নীলমণি পাটনীর দলেই রামপ্রসাদের কবি-জীবনের আরম্ভ হয়। রামপ্রসাদ আর নীলমণি ছিলেন সহোদর। নীলমণির মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ তাঁহার দল চালাইতেন। ইনিই হইয়াছিলেন দলপতি। এক কবির আসরে রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম বসুকে গালি দিয়া বলেন,—

নাইক রাম বোসের এখন সেকেলে পৌরুব।
এখন দল করে হোয়েছেন রামবোস—রামকামারের॥···

রাম বসু উত্তর দিলেন,—

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে না কো একটি দিন ॥
যেমন রাত ভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক এক জন,
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ;
কর্মে অকর্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাই রে)
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন ॥
নীলমণি বলে, নীলমণির দলে, ঢুক্‌লো শিং-ভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উজীরালী আড়াই দিন।
যেমন······কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্মেতে কুঁড়ে, ভোজন দেড়ে,—বচনে পুড়িয়ে করেন খাক্,
তেমনি শ্রীছাঁদ, এই পেট্‌কো মুলুকচাঁদ,
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ,
যেমন ভস্মে কভু হাত পোরে না,—দোলে লবেদার আস্তীন ॥

রামপ্রসাদ ঠাকুরের নামযুক্ত যে কয়েকটি সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'হর নই হে আমি যুবতী' গীতটি রাম বসুর রচিত। 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' সংগ্রহ-গ্রন্থে উহা ভ্রমক্রমে রামপ্রসাদ ঠাকুরের বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের নামাঙ্কিত সঙ্গীতসমূহের রচয়িতা কৃষ্ণপ্রসাদ নামে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহার ইঙ্গিত উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি হইতেই পাওয়া যায়। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

ভোলা ময়রা

উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-নায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি মন্তব্য প্রথমেই স্মরণ করি। "বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার লেখকের ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।[১]"

---

১ সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১২।

ভোলা ময়রা বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা দেশে সুপরিচিত। ভোলা ময়রার খ্যাতি বিরহের রাজা রাম বসু কিংবা সখীসংবাদের গুরু হরু ঠাকুরের সমপর্যায়ের ছিল না সত্য, তবে সাধারণ লোকের সমাজে অনন্যসাধারণ হইয়া একনায়কত্ব করিবার ক্ষমতা যদি কাহারো থাকিত তবে তাহা ভোলা ময়রার। কবিগানের ক্ষেত্রে ভোলা ময়রার রচনা-চাতুর্য উচ্চগ্রামের হয় নাই কিন্তু তথাপি কবিওয়ালা সমাজের তিনি প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। কবিগানের প্রতি তিনি তৎকালীন জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পরবর্তী কালে কবিগানের খাতির না বাড়ুক, আদর কমিবার লক্ষণ সহজে প্রকাশ হয় নাই।

ভোলা ময়রার সম্পূর্ণ নাম ভোলানাথ নায়ক। ইনি দোলাই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[২] ইঁহার পিতার নাম কৃপারাম (সংক্ষেপে কিপু ময়রা)। মাতার নাম গঙ্গামণি এবং সহোদরের নাম হৃদয়নাথ। স্বকৃত ছড়ার মধ্যে তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন:

(১) আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।

(২) আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
ময়রাই বার মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি, (ওগো) কৃষ্ণপদে আশ।

(৩) আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
(ওগো) সর্দি গর্মী নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস, ষড় ঋতু হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥

বাগবাজারে তাঁহার বাস, ইহা সত্য। পরবর্তী কালের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে "গুপ্তিপাড়া নামক গ্রাম ভোলা ময়রার জন্মস্থান এবং ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। তাহার পুত্র ছিল না, একটিমাত্র কন্যা বিধবা হইবার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ কন্যার নাম কৈলাসী। কলিকাতায় ভোলার পিতা দোকান করিয়া বাস করিত। ভোলানাথ গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য বাংলা শিক্ষা করিয়াছিল, তদ্ভিন্ন এই ক্ষণজন্মা পুরুষ আর কোনও স্থানে রীতিমত লেখাপড়া শিখে নাই। কলিকাতায় রামায়ণ ও মহাভারত শ্রবণ করিত। সঙ্কীর্তনে যোগদান, নিত্য গঙ্গাস্নান, গায়ক ও রসিক

---

২ সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পুরুষদিগের সহিত কথোপকথন প্রভৃতিতে তাঁহার বড় প্রবৃত্তি ছিল।'[৩] কোন সংগ্রাহক ভোলা ময়রার জীবন-কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—১৭৭৫ খৃস্টাব্দে (১১৮২ বঙ্গাব্দে) ভোলানাথের জন্ম ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।"[৪] ভোলা ময়রার জীবন-কথা সম্পর্কে ইহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না।

কবিগান মূলতঃ উমা-মেনকা-সংবাদ বা রাধাকৃষ্ণ লীলা-কথনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাই কেহ হইয়াছেন আগমনী সঙ্গীতে অদ্বিতীয়, কেহ বা বিরহ সঙ্গীতের রাজা, আবার কেহ বা সখী-সংবাদের গুরুস্থানীয়। ভোলা ময়রার সেরূপ কোন আখ্যা জুটে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া আজিও আনন্দের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে, ভোলা ময়রার স্বাধীন-চেতন সত্যদৃষ্টির। এই চেতনাবোধ জন্মিয়াছিল গুরু হরু ঠাকুরের জীবন-দর্শন হইতে। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে কবিগানের আসরে হরু ঠাকুরের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত হইয়া উঠিল। রাজা কবিকে পুরস্কৃত করিলেন নিজের গাত্রাবরণখানি উপহার দিয়া। কবির গুরু হরু ঠাকুর পুরস্কারের অসম্মান করেন নাই। পুরস্কার মস্তকে রাখিয়া পরমুহূর্তেই নৃত্যরত ঢুলীকে অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের ব্যবহৃত শাল লয় না, ইহা প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন।...কবিওয়ালারা সমাজের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য সভায় সমাজের বড় বড় লোকদের ছুটো মিঠে-কড়া টিপ্পনি দিয়া শোধরাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন।[৫] ভোলা ময়রার মধ্যে রসিকতার মধ্য দিয়া স্বভাব-সুলভ সত্যকথনের দৃষ্টান্ত, সহজেই সেকালের জনসমাজের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিল।

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধুভাষা।
বরুজে বিরাজ করে, চাষার বড় আশা॥
বুড়ো বুড়ি, ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী।
পান পেলে, মন খুলে, বাড়ায় পীরিতি॥
মোষের মত মুন্সীবাবু, মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে, ঠোঁট রাঙায়, চেহারাখানা ভালো॥
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া, বাসীমড়া, যার পানের কড়ি নাই॥

৩ নব্যভারত, ১৩১৭ সাল।

৪ মাসিক বসুমতী। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল।

৫ কলিকাতার কথা—(মধ্য কাণ্ড)—প্রমথনাথ মল্লিক।

'মোষের মত মুন্সী' বাবুটিকে তাহা অন্ধকারে রহিয়া গিয়াছে ৬, কিন্তু ভোলার সত্য-কথন লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই ধরনের দৃষ্টান্তসমূহে বর্তমানে ভোলা ময়রার কবিওয়ালার পরিচয় ব্যক্ত করার প্রধান সহায়ক। একবার, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার জাড়া গ্রামে ভোলা ময়রার সহিত চন্দ্রকোণা নিবাসী স্থানীয় বিখ্যাত কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর ধোবার 'কবির লড়াই' হয়। আহ্বায়ক ছিলেন জাড়ার ব্রাহ্মণ জমিদার 'রায় বাবুরা'। যজ্ঞেশ্বর প্রথমেই জাড়ার রায় বাবুদের প্রশংসা শুরু করিল। তাহার বক্তব্য—জাড়া গ্রামটা ঠিক যেন গোলক বৃন্দাবন আর বাবুরা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মতই। ভোলা ময়রা প্রত্যুত্তরে যাহা গাহিল তাহার তুলনা নাই।

"কেমন কোরে বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
কেমন কোরে বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
জগা! কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
ঐ সামনে আছে মানিককুণ্ড৭, কোর্‌গে মুলো দরশন।
কেমন কোরে বললি জগা, জাড়া গোলক-বৃন্দাবন॥
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
ওরে বেটা "কবি" গাবি, পয়সা লবি, খোসামোদি কি কারণ?
কেমন কোরে বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন॥
"কৃষ্ণচন্দ্র" কি সহজ কথা? কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার সাগরে যিনি (জগা!) তরাইতে পারে।
বাবু তো বাবু লালাবাবু, কোলকাতাতে বাড়ি।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না, এ বেটারা তো হাড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফ্‌তের মধু অলি।
মাপ কর্‌গো রায় বাবু, দুটো সত্যি কথা বলি॥
জগা ধোবা খোসামুদে, অধিক বলবো কি।
তপ্তভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

৬ শোনা যায়, চুপী গ্রামের দেওয়ান মহাশয়ই এই মুন্সীবাবু। (সাহিত্য সংহিতা)।
৭ মুলার জন্য বিখ্যাত।

ভোলানাথের অপর একটি ছড়া—

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
(ওগো) সর্দি গর্মি নাহি মানি।
ফুরাইল বার মাস, ষড়্-ঋতুর হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥
শীত এলে লেপ লই, গর্মী এলে ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে "কবির নেশায়" দিই ঢালি॥
শরতে হেমন্তে, বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি॥
কাল মেঘে বর্ষাকালে, বক উড়ে দলে দলে,
ময়ূরের পেখমে বাহার।
ষড়্-ঋতু বার মাসে, মাঘের মেঘের শেষে,
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার॥
নহি কবি কালিদাস, বাগবাজারে করি বাস,
পূজো এলে পুরা মিঠাই ভাজি।
বসন্তের "কুহু" শুনে, (ভক্তির চন্দন-সনে),
মনঃ ফুল রামচরণে করি রাজি॥
তবে যদি কবি পাই, হটে কভু নাহি যাই,
হোক্ বেটা যতই মন্দ।
জাহাজ, ডোঙ্গা, সোলা, নাও, যাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ॥

ভোলা যে কিছুতেই 'জব্দ' নহেন তাহা তাঁহার রচনার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়। মহিলা কবি যজ্ঞেশ্বরীর সহিত তাঁহার কবিতা-সংগ্রাম সে হিসাবে একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত ঃ

একবার কাশিমবাজার রাজবাটীতে ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরী দলের বায়না হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন, অদ্যকার আসরে ভোলানাথের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। এজন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে কহিলেন, 'ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা।' ইহার অর্থ এই যে, ভোলানাথ পুত্র এবং যজ্ঞেশ্বরী মাতা হইলে ভোলানাথ আর যজ্ঞেশ্বরীকে গালাগালি দিতে পারিবেন না। ভোলানাথ

পুত্র সাজিয়াও কিরূপ কৌশলে শাস্ত্ররক্ষা করিয়া যজ্ঞেশ্বরীকে তীব্রভাবে গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। ভোলানাথ আসরে গিয়াই গাহিলেন :—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্বকার্যে শুভঙ্করী
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস আমার বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা, ভোলানাথের অভয়-দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে খাপ॥
এখন মা শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক্।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল, বেহায়ার নাই কালাকাল,
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক॥
তোমার পুত্র ভোলা গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মতন মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চ পিতা [১] সপ্তমাতা [২] শাস্ত্রে শুনতে পাই,
তুমি আমার গাভীমাতা চল···ধরাতে যাই॥"

বলাই সরকার, হোসেন শেখ, এণ্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে ভোলা ময়রার কবি সংগ্রামের খ্যাতি আজিও লুপ্ত হয় নাই।[৩] ভোলা ময়রার 'কবির' একটি পালার নাম ছিল "বিরহ-বিষাদ'। বিরহিনী আপনার মনের মাধুরী মিশাইয়া বিচিত্র মোহনমালা গ্রন্থনে রত। সেই সময় বিরহিনার নিভৃত কুঞ্জের সখী আসিয়া নিবেদন করিল,—

কার জন্যে, এ অরণ্যে, ও সুধন্যে! গাঁথ মোহন মালা।
আর কি আছে সে গোকুল, শুকায়ে গেছে বসন্ত-মুকুল,
বিরহে, বিষাদে, ব্রজে হুলস্থুল; আসবে না আর কালা।
(কার তরে আর গাঁথ মালা)॥
মালা গাঁথনার মুখে কালি, হেরবে না আর সে বনমালী,
এখন কেবল হরি হরি বলি, জালায় কর জপমালা॥

১ অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
উপনেতো জনয়িতা পঞ্চৈ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

২ আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
গবী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈকা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥

৩ বলাই সরকার, হোসেন শেখ এবং এণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য

প্রাচীন বাংলা কাব্যে মালা গাঁথিবার বর্ণনা খুবই সুলভ। বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধিকা এবং তাঁহাদের সখীবৃন্দের বাক্য-বিনিময়ের বিচিত্র্যবর্ণনা আমাদের অজানা নয়। পরবর্তীকালের সাহিত্যেও এই একই বিষয়ের বর্ণনা বিভিন্ন কবি আপনার মনোমত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায় এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

প্যারি! কার তরে আর গাঁথ হার যতনে!
গলার হার কিশোরী, হারা ধনের ধন,
সে ধন চিন্তামণি হরি;
সে হার হারায়েছে, তাও কি জান না স্বপনে॥
কার তরে আর মালা গাঁথ যতনে॥
একজন অক্রুর নামে এসে মধুর মূর্তি সেজে সে,
কংসের দূত হ'য়েছে সে বৃন্দাবনে।
হ'রে ল'য়ে যায়, ও তোর সর্বস্বধন (দস্যুবৃত্তি কোরে),
আমরা দেখে এলাম,
রথে তুলিছে রতনে।
কার তরে মালা, প্যারি! গাঁথ যতনে॥

গোবিন্দ অধিকারীর বর্ণনাও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ :—

আর মালা গাঁথ কি কারণ।
ও রাধে! আর মালা গাঁথ কি কারণ॥
যার জন্য গাঁথ মালা, সে গেছে মধু ভুবন,
আর গাঁথা কি কারণ॥
গাঁথিলে মালতী মালা, মালা হবে জপমালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হোয়ে, রাই অঙ্গে করিবে দংশন।

নবরাগের উদ্ভাবনকারী মধুকানের বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ :—

রাধে! তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিয়াছ যার কারণে।
মথুরায় তার মাল্য বদল হবে, জানি না কার সনে॥

কেন গাঁথ রস-মালা, দিতে হবে মনে মালা,
শেষে কি তার এই মালা, জপমালা হবে প্রাণে ॥
রাই ! তুমি মালা গাঁথ যার কারণে ॥

মালা হেরে হবে জ্বালা,
মরবি প্রাণ জ্বলে ;
ছেড়ে যাব চিকণ কালা,
কে প'র্বে তোর চিকণ মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা,
মতির মালা দিবে এনে ॥
রাই তুমি গাঁথ মালা যার কারণে ॥

কাল হারা যে মোহন মালা
মালা পর্বে কে ।
কাঁদবি বোলে মদন মোহন,
মরবি সেই দুঃখে ।
রথ 'পরে এসেছে মুনি
লয়ে যাবে মাথার মণি
মদন বলে বিনোদিনী
বৃথা মালা গাঁথ কেন ॥

ভক্ত নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা গাহিয়াছেন—

ওগো ও রাজবালা, কমল মালা গেঁথ না আর যতনে ।
ও তোর মালা পরা বংশীধারী
ঐ দেখ ধূলায় পড়ে অচেতন ॥
ওগো ও রাজাবালা, কমলমালা গেঁথ না যতনে ॥

মাসে রাখ তোর শ্যাম সখা
ঐ দেখ বাঁকা তোর হোয়েছে বাঁকা
দেখে যা গো জন্মের দেখা
আর দেখ্ বিনা নয়নে ॥

যা গেঁথেছ তাই ভালো
ঐ দেখ্ তোর চিকণ কালো
কাঁদে নন্দ উপানন্দ, বসে ঘেরে স্বগণে ॥

আধুনিক বাংলা কাব্যের সার্থক পথিকৃৎ কবি মধুসূদনের কাব্যকুঞ্জেও এই মালিকা-গ্রন্থন-পর্বের ব্যতিক্রম হয় নাই।

কেন এত ফুল তুলিলি সজনী।
যতন করিয়ে ভরিয়ে ডালা।
মেঘাবৃত হোলে, কহলো সজনী,
পরে কি রজনী তারার মালা ॥
আর না যাইব তমালেরই তলে
আর না পরিব বনফুল গলে
সুখের পিঞ্জর ভেঙ্গে পিকবর
উড়ে গেছে আঁধার কোরে শোকাকুলা ॥

বিভিন্ন কবির আপন আপন মানস-গঙ্গায় যে বিচিত্র শব্দ-সঙ্গীতের অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়াছে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বাংলার কাব্যকুঞ্জে তাহা গৌরবেরই সামগ্রী। সাধারণ রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভোলা ময়রার সমকক্ষ কবিগানের রচক দ্বিতীয় নাই। প্রয়োজনের সময় তিনি রসান দিয়া বিনা দ্বিধায় বলিতে পারেন—

লাগ্‌লো ধুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্, শোভাবাজারের পূজা।
বড় ব্যয়, (লোকে কয়), কর্বে শোভা বাজারের রাজা ॥

উনিশ শতকের 'Rayees and Ryot' পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইজন্যই বলিতেন 'Bhola's Exdus !' অপর দিকে সূক্ষ্ম কাব্য-কলার ক্ষেত্রেও তাঁহার রচনা একেবারে অপাংক্তেয় হয় নাই।

॥ ১ ॥

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিন পর (চিতেন)
অন্তর জুড়াও ওগো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতর নিরন্তর।

সেই চিকনকালো হৃদে উদয় হলো,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ
উদয় হ'লে রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিব্‌লো রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহ-অনল ;
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ,
অন্তরের পুরাও সাধ,
অন্তর ক'রো না আর নীলকমল।
এ সময় পরশিতে বলো না,
হয় পাছে অমঙ্গল।
এই করুন্, ঘুচুক শ্যাম-বিচ্ছেদ
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী, হয়ে কৃষ্ণ সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার।
রাধে তোমার দুঃখ আর,
নাহি সহে গোপীকায়,
করিলেন মাধব আজি বিরহানল
বুঝি সুশীতল ॥[৩]

ভোলা ময়রার কবিদলের গতিবিধি—

কলিকাতা, ভবানীপুর, বেলেঘাটা, ইছাপুর, শ্যামনগর, গরিফা, সেওড়াফুলী, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, বালী, তারকেশ্বর, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর (ঝাড়া, চন্দ্রকোনা, রাধানগর, নাড়াজোল, ঘাটাল), হাবড়া (সালিখা, শিবপুর, জগদ্বল্লভপুর, আম্‌তা, উলুবেড়ে, আন্দুল), বাঁকুড়া, গুপ্তিপাড়া, কাশিমবাজার, নাটোর, পুটিয়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কাটোয়া, কালনা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, যশোহর, বনগ্রাম, গোবরডাঙ্গা, মেমারি, পাইকপাড়া, শুকচর, পানিহাটি, কালীঘাট, বেহালা, কান্দী, বারুইপুর, হরিনাভি প্রভৃতি।

৩ অনেকের মতে এই গানটি গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত।

উলুবেড়ের এক আসরে ভোলা—গাহিয়াছিলেন—

মাটি বেটি আমানী।
তিনে মজে কোম্পানী ॥

শোনা যায়, সে সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক লোক 'বাংলো' তৈয়ার করিবার জন্য ভূমি খরিদ করিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ নীচ জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানের কন্যাদের সঙ্গে কুসংসর্গ রাখিত, এবং অনেকে "আমানীর" (দেশীয় মদের) নেশায় হৃতসর্বস্ব হইয়া গিয়াছিল।

ভোলার অনেক ছোট-বড় ছড়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল :—

১। কৈ চৈ নীল।
যশোরেতে মিল ॥

(যশোহরের কৈ মাছ, ডাউলে আহার্য চৈ নামক পদার্থ এবং নীল প্রসিদ্ধ।)

২। গরু গুরু কৈবর্ত।
মেদিনীপুরের সত্ব ॥

৩। রাঢ়ের রাধুনী বামুন ; বদ্দিদের পৈতে।
নদীয়ার নবীন নাগর ; কে পারে গো সইতে ?

৪। আগুরী, মজুরী আর বাজার-সরকার।
বর্ধমানে পাওয়া যায় অতি চমৎকার ॥

৫। ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো খই।
ঢাকার ভালো পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই ॥
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শীদাবাদের জাম ॥
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই।
নোয়াখালীর নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই ॥
দিনাজপুরের কায়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি ॥
বর্ধমানের চাষী ভাল চব্বিশ পরগণার গোপ
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভাল, শীঘ্র বংশ লোপ ॥

হুগলীর ভাল কোটাল লেটেল, বীরভূমের ভাল ঘোল।
ঢাকের বাদ্য থাম্‌লেই ভাল, হরি হরি বোল্‌॥

৬। বামুন বলে 'আমি বড়', কায়েৎ বলে 'দাস'।
বদ্দি বলে 'ক্ষত্রি আমি' (ঢাকা জেলায় বাস)॥
যুগী বলে, 'যোগী আমি,' চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য॥
বলে 'উগ্র', নহি 'শূদ্র', রাখি তলোয়ার।
হোলে রাত্রি, উগ্র ক্ষত্রি, ভয়ে পগার পার॥
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই বার মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি, (ওগো) কৃষ্ণপদে বাস॥[৫]

হরু ঠাকুরের প্রিয় ছাত্র ছিলেন ভোলানাথ। অল্প বয়সে ঠাকুরের দলে জীল্‌ দিতেন। সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়। হরু ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়ায় তিনি অল্পকালের মধ্যেই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর আর কবির দল রাখিলেন না। রাম বসু, নীলু ঠাকুর প্রমুখ শিষ্যগণ একে একে নিজেরাই দল গঠন করিলেন। ভোলানাথের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নাই। হরু ঠাকুর সকল শিষ্যকেই গান রচনা করিয়া দিতেন কিন্তু ভোলানাথের প্রতি তাহার অত্যধিক স্নেহের প্রকাশ গোপন থাকে নাই। তাই রাম বসু পরে রামজী দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভোলানাথ হরু ঠাকুরের কৃতি শিষ্য। এ সম্পর্কে সেকালের একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

ভোলা যদি ধরে বোল, তিনু মুটো ধরে ঢোল,
আসরে বসিয়া যদি হরু দেন কোল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবে হন্‌ অগ্রসর
নিস্তব্ধ হইয়া যায় মানুষের গোল॥

৪ রাজা হরিনাথ—ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কাশিমবাজার নিবাসী কান্তবাবুর পৌত্র রাজা লোকনাথের পুত্র এবং স্বর্গত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মাতামহ। হরিনাথের নিকট এই ছড়া গীত হয়।

৫ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৪ সাল।

ভোলানাথের বাঁধনদারের নাম—সাতুরায় (অবৈতনিক), গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য।

সেকালের বাংলা দেশে ভোলা ময়রার প্রতাপ বড় কম ছিল না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন্তব্য হইতেই তাহা জানা যায়। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদের সমালোচক যখন বলেন "…পল্লীগ্রামের রাখালের মুখে, বাবুদের কুলবধুর মুখে, পাঠশালার ছেলেদের মুখে এবং বাজারে ও দোকানে এক সময় ভোলা ময়রার কবি ও ছড়া শোনা যাইত" তখন সেকালের দৃষ্টি দিয়া কবিওয়ালা ভোলা ময়রার যথার্থ স্বরূপটি যেন সুন্দর ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এণ্টনি ফিরিঙ্গি

॥ ১ ॥

কবিগানের রাজ্য—জীবন-জয়ের রাজ্য। এখানে হিন্দু নাই, বৈষ্ণব নাই, মুসলমান নাই, এমন কি সাগরপারের বিদেশী মানুষদের বংশধরগণ পর্যন্ত এখানকার ভোজসভার ভাণ্ডারী না হইয়াছেন এমন নয়। নিতে বৈরাগী, হোসেন শেখের কথা আমরা জানি, এণ্টনি ফিরিঙ্গির কথাও আমাদের অজানা নয়। কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গি এক কালে বাংলাদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'কলিকাতার মির্জাপুরে দপ্তরীপাড়ায় এণ্টনি-বাগান লেন নামক একটি গলি আছে। এই অঞ্চলে এণ্টনি নামক একজন পর্টুগীজ বাস করিতেন।[১] তাঁহারই নামানুসারে এই গলির নাম 'এণ্টনি বাগান লেন' হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে কলিকাতা, বেহালা বড়িষার সুপ্রসিদ্ধ সাবর্ণ চৌধুরী বাবুদের জমীদারী ছিল। উক্ত এণ্টনি সাহেব তাঁহাদের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার লবণের ব্যবসায় ছিল। এণ্টনি সাহেব এই বাটিতে বসিয়া কাছারী করিতেন। সাবর্ণ বাবুদের ৺শ্যামরায় নামক বিগ্রহ ছয় মাস বেহালা-বড়িষার ও ছয় মাস কাছারী-বাড়িতে থাকিতেন। দোলের সময় কাছারী-বাড়িতে বিশেষ সমারোহ ও ফাগ্ খেলা হইত।

১৬৯০ খৃস্টাব্দে, ২৪শে আগস্ট, রবিবার জব-চার্নক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ দিনই ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত। ১৬৯২ খৃস্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু

১ রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে ফরাসী বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা অনুমান মাত্র।

হয়। জেনারেল পোস্টাফিস্ হইতে ফেয়ারলি প্লেস পর্যন্ত স্থানে জব চার্নক সোরা ও অন্যান্য দ্রব্যের গুদাম করিয়াছিলেন।

একদিন সাবর্ণবাবুদের কাছারী-বাড়িতে দোলযাত্রা ও ফাগ্-খেলা হইতেছে, এমন সময় জব চার্নকের কর্মচারিগণ সেই স্থানে তামাসা দেখিতে যান। কিন্তু তাঁহারা ক্রীশ্চান বলিয়া কাছারী-বাড়িতে প্রবেশ করিতে অনুমতি না পাওয়ায় চার্নক আসিয়া এণ্টনিকে বেত্রাঘাত করেন। এণ্টনি মনের দুঃখে সাবর্ণ বাবুদের অনুমতিক্রমে শ্যামনগরে গিয়া বাড়ি নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুকালে এণ্টনি সাহেব বহু টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার দুইটি পৌত্র ছিলেন—**Cally Antony** এবং **Hensman Antony.** এই শেষোক্ত এণ্টনিই কবি হইয়াছিলেন। কেলি সাহেব পিতামহের সঞ্চিত অর্ধেক টাকা লইয়া পর্টুগালে গমন করেন। অবশিষ্ট অর্ধেক টাকা লইয়া এণ্টনি সাহেব এদেশেই আজীবন বাস করেন। ফরাসডাঙ্গা নিবাসী সৌদামিনী (মতান্তরে নিরুপমা) নাম্নি একটি ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে লইয়া গোঁদলপাড়ার নিকটবর্তী গরীটির বাগানবাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন।[২] ব্রাহ্মণী 'বার মাসের তের পার্বণ' করিতেন। এণ্টনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার ব্যয় ভার বহন করিতেন। এণ্টনি স্বভাবত বিলাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যার সহবাসে থাকিয়া তিনি হিন্দুর উপযোগী আহার করিতেন ও কাপড়-চোপড় পরিতেন। ক্রমে ক্রমে নিজ বাড়িতে যাত্রা ও কবির গান করাইয়া বিলাসিতা প্রকাশ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীর নিকটে এণ্টনি বিলক্ষণ বাংলা ভাষা শিখিতে লাগিলেন। অবশেষে এণ্টনি সাহেব কবির দল করিবার ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণীকে এই কথা বলিলে তিনি তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। এণ্টনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোরক্ষনাথ যোগী নামক একটি লোককে মাসিক ১০৲ টাকা বেতন দিয়া বাঁধনদার নিযুক্ত করিলেন।[৩] এই ভাবেই এণ্টনির কবির দলের পত্তন হয়। ফিরিঙ্গি এণ্টনি, কবিওয়ালা এণ্টনিতে পরিবর্তিত হইলেন।

কবিওয়ালা এণ্টনির সঙ্গে ভোলা ময়রার কবিতা-যুদ্ধ সেকালের একটা পরিচিত কৌতুকপ্রদ ঘটনা। এণ্টনির সঙ্গে যাহাদের একত্র সঙ্গীত-সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন রাম বসু, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতি।

২ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় মাসিক বসুমতীর ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় এণ্টনির স্ত্রীর নাম নিরুপমা বলিয়াছেন। 'এই সংবাদ দিয়াছিলেন তদীয় বন্ধু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বি-এ।

৩ গোরক্ষনাথ যোগীর প্রসঙ্গ দেখুন।

ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান করিতে গিয়া রাম বসু এণ্টনিকে পর্যুদস্ত করিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন,—

শুন হে, এণ্টনি, তোমায় একটি কথা কই।
এসে এদেশে এবেশে, তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥

এণ্টনি উত্তর করিলেন,—

এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

ভোলা ময়রা হইলে যেখানে 'শালা' সম্বোধনে গালাগালি দিতেন সেখানে এণ্টনির রুচি-সৌকর্যের পরিচয়টি বড় সুখকর হইয়াছে। রাম বসু কিন্তু ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না।

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়লি!
ও তোর পাদ্‌রি সাহেব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চূণকালি॥

সাহেব স্বভাব-সিদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিলেন,—

খৃস্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে, যদি রাঙা চরণ পাই॥

এণ্টনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন নাই সত্য কিন্তু সর্বধর্মের প্রতি তাঁহার উদার অনুরাকাশের প্রতিচ্ছবি আমাদের মুগ্ধ করে।

রামসুন্দর স্বর্ণকারের সঙ্গে তাঁহার একবার কবিতা-সংগ্রাম হয়। স্বর্ণকার, সাহেবকে বলিলেন,—

এণ্টনি ফিরিঙ্গি কফন্ চোর।
ভাঙে রাত হ'লে সব যত গোর্॥
টাট্‌কা গোরে শুট্‌কো ভূতের রব
একি অসম্ভব,
এ হুম্‌কি দিয়ে বস্তু লোটে সব।
এর ঠাঁয় ঠিকানা গেল জানা
মানুষ হোল তিন সহর॥

সাহেব ইহার কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

ভোলা ময়রার সহিত এণ্টনি ফিরিঙ্গির কৌতুকপূর্ণ কবিতায়-বাক্-যুদ্ধের পরিচয় জানা যায়। শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বাড়িতে কবিগানের আসরে দুই জনেই রহিয়াছেন। ভোলা ময়রা সাধারণতঃ বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। বৈষ্ণবদের গুণাগুণ কীর্তনে তিনি আনন্দিত হইতেন এবং তাঁহার আপন ভাবানুযায়ী বৈষ্ণববন্দনা করিয়াছিলেন। এণ্টনির নিকট এই বন্দনা গান অতিরিক্ত মনে হওয়ায় তিনি গাহিলেন,

তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় করো কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে (আমি বলি),
কসাই তবু ভালো॥

রসিকতা এবং ব্যঙ্গ—এই দুই বস্তুর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে সাহেব কবিওয়ালার বাক্-চাতুর্যে। বরাহনগরে এক কবিগানের সভায় ভোলা ময়রা ও এণ্টনির কবিতা-সংগ্রামের সাক্ষী ছিলেন Rayees and Ryot পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি ঐ আসরে উপস্থিত ছিলাম, উভয় দিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এণ্টনি যাহা করিতেছিল তাহা কষ্টপ্রসূত, ভোলা যাহা করিতেছিল তাহা বুদ্ধিপ্রসূত। It was a keen contest between labour and genius. বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও যখন জয়ের স্থিরতা নাই দেখা গেল তখন এণ্টনি একগাছি বৃহৎ ও সুন্দর মালা (যেখানি এণ্টনির লোকেরা তাহাকে দিয়াছিল) ভোলার গলায় পরাইয়া দিল।"[১] হাসিতে হাসিতে ভোলা গাহিলেন—

ওরে শালা! কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়।
চক্ষে বহে জল, অবিরল ; বিকল করিল কায়॥
কি জ্বালা, এ মালা, দিল রে আমায়॥
ওরে "হেস্তন" মালার কুসুম,
(পুষ্প নয়) ফুলধনু প্রায়।
কি জ্বালা, এ মালা, দিল রে আমায়॥
মনে কি হয় না উদয়,
ভোলা কভু ভোলবার নয়?

১ নব্য-ভারত। ১৩১৭ সাল।

ছলে বলে কৌশলে,
মালিনীর মত ফাঁকি দিলে,
আচ্ছা ফন্দী এবার খেলে,
ত'রে গেলে বড় দায়।
ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়॥

এণ্টনি এবং ভোলা ময়রার কবিগানের কথা বহু প্রচলিত। ভোলা ময়রা একবার শ্রীরামপুরের কোন কবিগানের আসরে গ্রাম্য বাংলা ভাষায় অসাধারণ দক্ষতার সহিত দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক ভাবে প্রশ্ন করেন,—

ন্যাটুর নীচে নড়ে, নড্ড্ নয় ভাই।
বৃন্দাবনে বোসে দেখ, বস্থ ঘোষের রাই॥
ঘোম্‌টা খুলে, চোম্‌টা মারে, কোম্‌টা বড় ভারি।
তিন লম্ফে লঙ্কা পার; হাস্‌ছে শুকসারী॥
বাঁঝা মেয়ের বেটা হোল, আমাবস্থার চাঁদ।
এণ্টনি জবাব দিও, নইলে বাধ্‌বে বড় ফাঁদ্॥

এ প্রশ্নের জবাবে এণ্টনি কি বলিয়াছিলেন তাহা আর জানা যায় নাই।

কথা-কাটাকাটি এবং রঙ্গ-রসকে কেন্দ্র করিয়াই এই দুই কবির কাব্য-কথার পরিচয়ই যে একমাত্র পরিচয় নয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ কয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে। একবার এণ্টনি গাহেন,—

চিতেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়।
রাধে কেঁদেছ যার আশাতে নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়॥
কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মান তাতে লজ্জা ভয়,
দুখে আধ আধ ভাষা গল লগ্ন বাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগ হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

মহড়া। একবার বলিস্‌তো আস্‌তে বলি মাধবকে,
প্যারি তোর সম্মুখে !
ঐ দেখ্ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে,
কেঁদে বল্‌ছে দয়া কর রাধিকে ॥

অন্তরা। যদি ইচ্ছা হয় বল গো প্রধানা গোপীকে,
কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত,
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হ'ল আসি ;—
সর্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
নাহি সর্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদয়ে কলঙ্কেরি দাগ;
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে ॥

ভোলা ইহার উত্তরে গাহিয়াছিলেন,—

চিতেন। সখি আর কৃষ্ণের কথা শোনাস্ নে,
জ্বালাস নে প্রাণ গো আমার।
কালোরূপ চক্ষে হেরিব না আর।
কুলশীললাজ পরিহরি,
যার বাঁশী শুনে দাসী হ'লেম চরণে,
কর্‌লে সেই হরি চাতুরা।
আর কালোরূপ হের্‌বো না,
হেরিতে বোলো না,
কালার প্রেম আমার কাল হইল।

মহড়া। কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন্ গো,
সেইখানে যাইতে বল।
যদি আমার হ'তেন শ্যাম,
হ'তেন না আমারে বাম,
জুড়াতাম্ ল'য়ে চিকন কালা ॥

অন্তরা। মাধব আমার আশা—করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল।
সখি, জাগলেম নিশি যার আশেতে,

সেই প্রতিকূল যদি আমার হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে ?

চিতেন। কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক্
আমারই প্রাণে শোক,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল।

ফিরিঙ্গি এণ্টনি—বাঙালী এণ্টনি হইয়াছিলেন। ধর্মের কথায় দেখিয়াছি তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। রসিকতার ক্ষেত্রে তিনি যেমনই মুখর হোন না কেন বিষয়-ভেদে যে ভাব-ভেদও হয় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। যোগেন্দ্রজায়া মহামায়ার বর্ণনায় এণ্টনির জীবন-বোধের নবতর রূপের প্রকাশ ঘটে :

চিতেন। জয়া যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া অসীম মহিমা তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তাকে ভবসিন্ধু পার।

অন্তরা। মা তাই শুনে এ ভবের কূলে, "দুর্গা দুর্গা দুর্গা" বলে,
বিপদ্‌কালে, ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ;
তবু সন্তানের মুখ চাইলিনি মা,
আমায় দয়া করলি না মা,
পাষাণ প্রাণ বাঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র বোলে,
আপনিও কুমাতা হ'লে,—আমার কপালে ;
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ কুলে, ধর্ম তেমনি রেখেছ।

কবি আপনার অনুভূতির সহিত কাব্যের যোগসাধন করিয়াছেন। জীবনের বেদনা কাব্যকলায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। জননীর নিকট আপনার মনের নিগূঢ় বেদনা অবশেষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—

এণ্টনি ফিরিঙ্গি বলে, মা গো তারা, তুই আমায় দয়া করবি কিনা।
বল মা মাতঙ্গী, আমি ভজন সাধন জানি না মা, জেতেতে ফিরিঙ্গি ॥

কবির বেদনা-ভূমিতে ভোলা ময়রা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্থূল হাস্যরসের অবতারণা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই—

তুই জাত ফিরিঙ্গি, জবর জঙ্গী, পারবে না মা তরাতে,
যীশু খৃস্ট ভজ্‌গে বেটা শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥

বিনয়ী এণ্টনি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

সত্য বটে বটি আমি জেতে ফিরিঙ্গি,
(তবে) ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী।

চরম এবং পরম ঐক্যের নির্দেশক এণ্টনির জীবন-দর্শনের যে পরিচয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কবিওয়ালা-সমাজে তাঁহার বিশেষ স্থান সুনির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র, ভোলা ময়রা এবং এণ্টনির কবি-যুদ্ধ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন একজন বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর, অন্যজন পরিশ্রমী। তাঁহার এই মন্তব্যটি দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা যায় না। ভোলা ময়রার ব্যঙ্গ প্রায় ক্ষেত্রেই শালীনতার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এণ্টনির ব্যঙ্গ রঙ্গ-ব্যঙ্গে বা ব্যঙ্গ-রঙ্গে পরিণত হয় নাই, তাহা রুচিশীল কবিওয়ালার স্বভাববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গি লোকান্তরিত হইয়াছেন ১২৪৩ সালে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার আসন চিরকালের।

জন হ্যালহেড

কবিওয়ালা জন হ্যালহেডের নাম বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী। জন হ্যালহেড, কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।

There was another European gentleman Mr. Nathaniel Thon Halhed who used to go out as a Bengali—like Antony and freely talk with the Bengalees without being detected.

[Friend of India. The 9th August, 1838]

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসালি হ্যালহেড বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেন ন্যাথ্যানিয়েল জন হ্যালহেড। এণ্টনির মত ইনি যে পেশাদার কবিওয়ালা ছিলেন না তাহা জানা যায়। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই না জানা গেলেও Friend of India-র সংবাদদাতা এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্য দিয়াছেন।

Mr. Halhed, however, was not a professional singer but a judge of the Sadar Dewani A'dalot. Dr. Carey used to call him the first

Englishman who learnt colloquial Bengali language without a rival! [Ibid]

সাধারণ চলিত ভাষায় জন হ্যালহেডের দক্ষতা এবং কবিওয়ালা হিসাবে তাঁহার পরিচয় বর্ধমান রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

On one occassion while at Burdwan having been solicited to give some proof of his knowledge of the language, he embraced the opportunity of a public show given by the Raja to the Europeans and insinuating himself as a "Native Singer" performed his part so admirably by joining them in their chants that even they were unable to perceive that a stranger was among them. [Ibid]

জন হ্যালহেড যে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। এই উন্নত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষটি কবিগানের রসে রসিক হইয়া কবিওয়ালার ভূমিকা গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেই আমলে তাঁহার মত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইংরাজের এই কাজ যে কতখানি দুঃসাহসের তাহা অনুমান করা সহজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কবিগানের অন্তরস্থ ভাবমাধুর্যের সত্যরূপটি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

(কবিগান যদি সত্যই মর্যাদাহানিকর অশ্লীলতাময় বিরক্তির সঙ্গীত হইত তাহা হইলে বিশিষ্ট য়ুরোপীয়গণের উপস্থিতির মাঝখানে বর্ধমানের মহারাজার বাটীতে এক বিচারক কবিওয়ালার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সাধারণের আসরে সস্তা বাহবা কুড়াইতে নামিতেন না। ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রে জন হ্যালহেডের এই কীর্তিকথা কবিগানের সত্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান তথ্য।) অথচ ইহার অল্পকাল পরেই ইংরেজ পরিচালিত অপর একটি পত্রিকায় কবিগান সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও উল্লেখযোগ্য :

"The animus of the Kavis is rivalry. Two bands under different leaders are with each other in winning the applause of the audience. Their sons, in the first instance celebrate the loves of Krishna and Radha, or the praises of the bloody goddess Kali. But there over, they indulge the songs of the most wanton licentiousness and to crown the whole with calling each other

bad names. So far for the matter, the manner of singing is one of which young Bengal may well be ashamed. The houses of some of the rich Babus of Calcutta are annually the scenes of these disgraceful exhibitions, others have got heartily tired of them but have substituted the less barbarous but not the less immoral 'nautches'.

[Calcutta Review. Vol. XV, 1851]

(কবিগানের ভাগ্যে সম্মান শোভার অভিজ্ঞান যত না জুটিয়াছে তাহার অপেক্ষা বহুগুণে বহুবারই ইহার সত্য পরিচয় কলঙ্কের আবরণে বিকৃত হইয়াছে। ইংরাজ পরিচালিত দুইটি পৃথক পত্রিকার সংবাদ একই বিষয়ের বিচারণায় যে ভাবে মতামত ব্যক্ত করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কবিগান মর্যাদা-হানিকর অবহেলার সামগ্রী হইলে জন হ্যালহেডের কীর্তিকথা নিশ্চয়ই প্রচারিত হইত না।) শিক্ষা এবং মর্যাদার দিক দিয়া এণ্টনি অপেক্ষা হ্যালহেডের স্থান যে অধিকতর সম্মানজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এণ্টনি ছিলেন কবিদলের মালিক এবং পেশাদার কবিওয়ালা। (সেই দিক দিয়া জন হ্যালহেডের সহিত তাঁহার পার্থক্যের সীমারেখা খুবই সুস্পষ্ট। বর্ধমানের রাজসভায় জন হ্যালহেডের কবিগানের সংবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।) বিচারক-কবিওয়ালা জন হ্যালহেড কবিগানের অমৃতধারায় আপনার চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া একদিকে যেমন ধন্য হইয়াছেন অন্যদিকে কবিগানের সত্যমূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে স্বাক্ষর তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও বড় অল্প মূল্যের সামগ্রী নয়।

ঠাকুরদাস সিংহ

বল হে এণ্টনি, আমি একটি কথা জানতে চাই
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?

ঠাকুরদাসের আকস্মিক প্রশ্নে এণ্টনি হত-চকিত হইয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব রসিকতার স্বাদটুকু মনে না রাখিয়া পারা যায় না।

এই বাংলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি ॥

ঠাকুরে সিংহ বা ঠাকুরদাস সিংহের প্রতি এণ্টনি ফিরিঙ্গির শ্লেষাত্মক কাব্যাংশটি তাঁহাকে সাধারণের নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঠাকুরদাসের আত্ম-পরিচয় কিছুই জানা যায় নাই। তিনি ছিলেন রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের সমসাময়িক। আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে কবিতা রচনার ক্ষমতা যে ঠাকুরদাসের ছিল তাহার প্রমাণ প্রথমেই পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ দলে গীত কয়েকটি গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

যতনে মম প্রাণ,
প্রেয়সি করেছি তোমায় সমর্পণ।
তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত,
অন্যের নহি কদাচন॥
কেমন পুরুষের কপাল, বুঝিতে নারি,
তোমার নারীজাতির স্বভাব,
কেবল অ-ভাব করা প্রাণ,
এ ভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়
অন্য কারো নই, শুনলো রসময়ি,
মিছে দোষ দাও কেন আমায়;
অন্যের যদি হ'তাম,
তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি ল'য়ে মন, যশ কর না একি দায়॥
নারীর স্বভাব—দোষে নাগরকে,
নিবৃত্তি না মানে কথায়;
তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী,
রামকে বল্‌লেন, মৃগ দাও আমায় ধরি।
গেলেন কুটির ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষলেন সীতা পুনরায়॥

উপর্যুক্ত গীতটির রচয়িতা হিসাবে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই গীতটির সহিত কবিওয়ালা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর 'বল সই কি কথা, ভাবের অন্যথা নাহিক আমার' গীতের চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরদাসের দলের আর একটি সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

আমারে সখি ধর ধর!
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার?
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর,
হৃদে নবঘন দলিতাঞ্জন বরণ, উদয়ে অবশ শরীর।
অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার, আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম প্রেম ভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভাব অম্বর॥

হায় সে যে কটাক্ষের, অপাঙ্গ ভঙ্গিম বয়ান করে তা কি কব ?
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে, সেই সে বুঝেছে ভাব ॥
কুলশীল ভয়, লজ্জা তায় যায়, না রাখে জীবন-আশ।
তার জলে বা স্থলে বা অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার ॥

রামসুন্দর স্বর্ণকার

কবিওয়ালা রামসুন্দর স্বর্ণকারের জীবনকথার কিছুমাত্র আভাস দিয়াছেন প্রাচীন কবিসংগ্রহের সম্পাদক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা হাড়কাটা গলি ইঁহার বাসস্থান। ইনি পূর্বে কেরানিগিরি কর্ম করিতেন, পরে কবির দল করিয়া উক্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক লোকরঞ্জন ও অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হন। ৮২ কিংবা ৮৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়"।[১]

ইনি যে ভোলা ময়রা, এণ্টনি ফিরিঙ্গির সমসাময়িক ছিলেন তাহা তৎকালীন অপরাপর কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। ফিরিঙ্গি কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের সঙ্গে (সম্ভবতঃ শ্রীরামপুরে) রামসুন্দর স্বর্ণকারের একবার 'কবির লড়াই' হয়। রামসুন্দর সেই আসরে এণ্টনির প্রতি প্রশ্ন-প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করিয়াছিলেন :

এণ্টনি ফিরিঙ্গি কন্দ্ চোর।
ভাঙে রাত হ'লে সব মত গোর্ ॥
টাটকা গোরে শুট্‌কো ভূতের রব।
একি অসম্ভব ॥
এ হুম্‌কি দিয়ে বস্ত্র লোটে সব।
এর ঠাঁয় ঠিকানা গেল জানা,
মানুষ হোল তিন শহর ॥

ফিরিঙ্গি-কবিওয়ালা ইহার উত্তরে কি বলিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে রামসুন্দরের উক্তি হইতে তাঁহাকে ভোলা ময়রার শ্রেণীভূক্ত কবিওয়ালা মনে করিলে অযৌক্তিক হইবে না। ইঁহার দলের অন্যতম সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। 'আণ্টনি সাহেব, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির দলে ইনি (ঠাকুরদাস চক্রবর্তী) গান বাঁধিয়া দিতেন।'[২] ঠাকুরদাসের সঙ্গীত গাহিয়া সেকালের কয়েকজন কবিওয়ালা

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ। পৃঃ ।০+।/০

২ বাঙ্গালীর গান। পৃঃ ২০২

বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রামসুন্দরকে অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করিলে বোধ করি তাঁহার সত্য-পরিচয়টুকুই উদ্‌ঘাটিত হইবে।

যজ্ঞেশ্বরী

উনিশ শতকের কবিগানের ক্ষেত্রে মহিলা-কবি যজ্ঞেশ্বরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি একমাত্র মহিলা-কবি, যাঁহার নিজস্ব দল ছিল।[১] যজ্ঞেশ্বরীর জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার রচিত দুইটি মাত্র সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায়।[২] ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় যজ্ঞেশ্বরীর জীবন সম্পর্কে একটি নূতন তথ্য দিয়াছেন। রাম বসুর জীবন-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ডক্টর দে একস্থানে বলিয়াছেন—"Tradition speaks of his partiality for one Jajnesvari, a songstress of Nilu Thakur's party, who was herself a gifted Kabiwala of some reputation in her time."[৩] ডক্টর দের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে একমাত্র অনাথকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন,—"ইনি প্রথিতনামা কবি রাম বসুর অনুগৃহীতা কোন রমণী বলিয়া প্রকাশ। নীলু ঠাকুরের দলে ইঁহার রচিত গান গীত হয়।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাম বসুর জীবন-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে[৪] এইরূপ প্রবাদের বা অনুমানের বিন্দুমাত্র আভাস দেন নাই। কোন কবির জীবন সম্পর্কিত এই ধরণের সংবাদ ঈশ্বর গুপ্ত কখনই অপ্রকাশ রাখেন নাই; তাহার প্রমাণ হিসাবে গুপ্ত-কবির সংগৃহীত রামনিধি গুপ্তের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই জানা যায়।[৫] যজ্ঞেশ্বরীর প্রতি 'বঙ্গের কবিতা'-কারের এই অনুমানমূলক দোষারোপ সমর্থন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞেশ্বরী নীলু ঠাকুরের দলে স্থায়িভাবে ছিলেন কি না তাহা বলা দুষ্কর। 'বাঙ্গালীর গান'-এর সম্পাদক মহাশয় যজ্ঞেশ্বরীর পরিচয়-দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"ইনি এক স্ত্রী-কবি। ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক। ইঁহারও এক কবির দল ছিল। যজ্ঞেশ্বরী সেই দলে নিজের গান করিতেন।" বঙ্গের কবিতাকারও বলিয়াছেন; "নীলু ঠাকুরের দলে ইঁহার গান

১ বাঙ্গালীর গান। পৃঃ ১৮৬

২ প্রাচীন কবিসংগ্রহ। পৃঃ ১৩৩, ১১২

৩ Bengali Literature in the Nineteenth Century by Dr. S. K. De. P. 369.

৪ সংবাদ প্রভাকর। ১২৬১ সালের ১ আশ্বিন, ১ কার্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ও ১ মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫ সংবাদ প্রভাকর। ১২৬১ সালের ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গীত হয়।" সেক্ষেত্রে যজ্ঞেশ্বরীকে কেবল 'Songstress of Nilu Thakur's party' বলিলে বোধহয় অসম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, যজ্ঞেশ্বরীর রচিত যে দুইটি গীত পাওয়া যায় তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল: এই সঙ্গীত দুইটি 'বাঙ্গালীর গান'-গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৬) এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'-এর মধ্যে (পৃঃ ১৫৬৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্গীত দুইটির প্রাচীনতম রূপ রক্ষিত হয় নাই। 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' হইতে সঙ্গীত দুইটি যথাযথভাবে বর্তমান গ্রন্থে উৎকলিত হইল।

॥ ১ ॥

চিতান কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান

পরচিতান। হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ

১ ফুকা। আমায় বন্দী ক'রে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হ'লে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।

১ মেল্‌তা। আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে,
এখন অধীনি বলিয়ে ফিরে নাহি চাও,

মহড়া। ঘরের ধন ফেলে প্রাণ,—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে ক'রে নিরাশা,
অসতীর আশা পূরাও।

খাদ। রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্যে না কুলাও ॥

২ ফুকা। তোমার মন হ'ল বার বাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।

২ মেল্‌তা। কথা কইছ আমার সনে,
মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ—মনে কর সখা, পাখা হ'লে উড়ে যাও ॥

॥ ২ ॥

চিতান। অনেকদিনের পরে, সখা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে।

পরচিতান। ভাল বল দেখি, তোমার সখার সংবাদ,
ভাল ত আছেন প্রাণেতে ॥

১ ফুকা। তার মনে ত নাই এ অধীনিরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।

১ মেল্তা। ভাল সুখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে ॥
বলো বলো প্রাণনাথেরে,
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌বো তার ;
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

খাদ। আমার হলো উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে ॥

২ ফুকা। তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

২ মেল্তা। দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুলুস্বরেতে ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়

"গদাধর জাতিতে ব্রাহ্মণ ; ২৪ পরগণায় জন্মস্থান। রাম বসুর ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে না পারিলেও, গদাধর পরবর্তীকালে একজন প্রসিদ্ধ বাঁধনদার ও গীতি রচয়িতা' বলিয়া পরিচিত হন।"[১] ইঁহার জন্ম আনুমানিক ১৭৪৬ খৃস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে হয় বলিয়া জানা যায়। কবিওয়ালা হিসাবে গদাধরের খ্যাতি উচ্চ মার্গের।

সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১৭ সাল।

ইনি কখনো নিজে কবির দল গঠন করেন নাই। ইঁহার রচিত কবি-সঙ্গীত, ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিওয়ালাগণ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কবিওয়ালা-জীবনের সূচনা হয় কালীঘাটের এক শখের দলে। এই দলের সঙ্গীত যোগাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল গদাধরের। সঙ্গীতের যোগানদার হিসাবে গদাধরের প্রাথমিক রচনাতেই তাঁহার শক্তির বিকাশ পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত 'সপ্তমী' সঙ্গীতের মধ্যে তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

চিতেন। পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই!
শুনে পাগলিনী প্রায় অমনি রাণী ধায়,
বলে—কৈ মা উমা কৈ ?

মহড়া। কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে!
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে।
কই মেয়ে ব'লে আনতে গিয়েছিলে ?

মা মেনকা এবং কন্যা উমার মান-অভিমানের এই নিখুঁত চিত্র কবির বর্ণনায় অন্তরস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কথা কাব্যের কথায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার নিরাভরণ শিল্পকলার সংযত প্রকাশ সাধারণ হইয়াও অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কন্যা ও জননীর এই বেদনামধুর আখ্যায়িকার পরবর্তী অংশটুকুও কবি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন :

তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে প্রমাণ আপনা হ'তে গেলে নাকো নিতে,
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলে ?
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,—
তোর কি মা নাই ? তোর কি মা নাই ?
অম্‌নি সরমে মরমে ম'রে যাই॥

তাদের বলি,—আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥
আমার মনের ব্যথা, আছে মনে গাঁথা,
মা কি বলিবে অন্যে, পিতৃদত্তা কন্যে ;
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
একি কবার কথা! ইত্যাদি।

সপ্তমী-সঙ্গীত ছাড়াও কবিগানের অন্যান্য শাখায় কবির রসানুভূতি কাব্যের পাখায় ভর করিয়া দেশ-জয় করিয়াছে। নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে গীত তাঁহার রচিত বিরহ-সঙ্গীতের তুলনা সত্যই দুর্লভ। ঋতু-পর্যায়িক বিরহ-বিচিত্রা কবিগানের ক্ষেত্রে দুর্লভ নয় সত্য, কিন্তু শ্রোতা বা পাঠকের অন্তর-জয় করিবার বিরল-ক্ষমতা যে অল্প কয়েকজনেরই থাকে, তাহাও অনস্বীকার্য।

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যতকাল ;
পতি বিনা সকল জেনো, নারীর পক্ষে কাল।
সে কাল জেনো সুখের—যে কাল পতিসুখে যায়,
সুখের মূলাধার প্রাণপতি অবলার, পুরুষে অবলা জুড়ায়।
পতির সুখে সতীর সুখ, পতি দুখে দুখ নারীর সই!
পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়,
ধৈর্য ধর সই, অধৈর্য হওয়া উচিত নয় ;
আস্‌বে প্রাণকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
সুশীতল করো তাপিত হৃদয়।
কমল ত্যজিয়া মধুকর, স্বতন্তর কভু নাহি রয়,
কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে ;
ঘুচিল দুখের কাল, আইল সুখের কাল,
জুড়ালে শ্রীরামে লয়ে।
নাথ বিরহে সাবিত্রী তো, বিষাদিত হয়েছিল সই,
আবার পুনরায় পেলে তো রসময় ॥

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীরা 'ধৈর্য ধর সই, অধৈর্য হোয়ে না' বলিয়া এক দিকে যেমন সান্ত্বনা

দিয়াছেন, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও অশেষ মিনতি জানাইয়াছেন অভিমান-ভরা বেদনার ভাষায় :—

রাই-শত্রু রেখ না হে শ্যাম রায় !
বধ করে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায় ॥
বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়,—শুনেছি দয়াময়,
কল্লে তো সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস প্রধান শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে—সেও হে প্রাণেতে বাঁচে ;
রাজার নন্দিনী হ'ল বিরহিনী,
বলহে—কত দুঃখ সবে আর ॥
ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ,
রাখলে প্রমাদ ঘটায়।
তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমে ঋণী,
তারে করলে কাঙ্গালিনী,
তোমারও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ,
বাড়িবে অধিক মান,
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায়।

'রাধার প্রাণ বধিলেই' যে শ্রীকৃষ্ণ 'প্রেমের দায়' হইতে মুক্ত হইবেন এমন শঙ্কার কোন হেতু নাই। কারণ মিনতি করিয়া যদি ফল লাভ না হয় তবে অভিযোগের শর-নিক্ষেপ করাও একান্ত অসম্ভব নয়—

তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়,
বিক্রীত রাধার পায়,
কৃষ্ণধন—রাধার কেনা ধন,
হয়েছে একবার।
সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার ॥

শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে কেন কৃষ্ণধন থাকৃতে
রাই কাঙ্গালিনী ?
ক'রে রাই পক্ষে পক্ষপাত,
হ'লে হে কুব্জার নাথ,

হরি! মলো দুঃখে রাই,
একবার চক্ষে দেখলে না;
হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্,
কুব্জার মনের বাসনা॥

কুব্জা করেছে চন্দন দান,
বাড়ালে দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান।
কিন্তু রাধার বই কুব্জার শ্যাম
কেউ বল্‌বে না॥

শ্রীরাধিকার জন্য সখীদের এই লীলা-কৌশল কবি অন্তরের অনুভূতির সহিত কাব্যায়িত করিয়াছেন।

নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই,
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী;
সাথে বিনোদিনী রাই।
লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,
দিলে হে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তাতো মনে হয়?
সে খতে সাক্ষী আছেন ললিতে॥
তোমার সেই দাসখত লও হে শ্রীহরি!
খাতক গেল, মিছে খত রেখে
কি করবেন রাইকিশোরী॥

কবিগানের বিষয়-বিন্যাস পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ইহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল; কিন্তু তাই বলিয়া এ গুলিকে কাব্য-রস-বর্জিত বলিয়া মনে করিলে অপরাধ করা হইবে। মানব-মনের অনুভূতির বিচিত্র বীণায় কবিওয়ালাগণ আপনাদের নৈপুণ্য অনুযায়ী রস-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং যেখানে তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের কাব্য-সৃষ্টিও হইয়াছে সার্থক। কবিওয়ালা গদাধর মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা-সম্পদের সহিত পরিচিত হইবার আশা এ যুগে আর নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার দ্যুতি যে আজিও সকলের মনোহরণ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রামানন্দ নন্দী ও গোরক্ষনাথ যোগী

কবিওয়ালা নিতাইদাস বৈরাগীর সুখ্যাত শিষ্য রামানন্দ নন্দী আনুমানিক ১১৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় আনুমানিক ১২৬০ সালে। চব্বিশপরগণা জেলার নৈহাটী থানার অন্তর্গত রাহুতা গ্রাম—কবির জন্মস্থান। কবিওয়ালা বংশীধর, ধরণীধর পোদ এবং চণ্ডীচরণ ধোপার জন্মস্থান হিসাবে রাহুতা গ্রামের খ্যাতি কবিওয়াল সমাজে অবিদিত ছিল না।

রামানন্দের পিতার নাম আনন্দচন্দ্র নন্দী। ইঁহারা কায়স্থবংশীয়। রামানন্দের বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর হয় নাই। ১২০০ সালে ভাটপাড়ার কেশবদাস নামক এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করেন। রামানন্দের পত্নীর নাম সৌদামিনী।

কবিগানের দেশ রাহুতা। সেখানেই রামানন্দের প্রথম জীবনের সুরু। তিনি কবিগানকেই আপনার জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন ২২।২৪ বৎসর বয়সে। নিতাই দাস-বৈরাগীর কবির দলেই তিনি প্রথম কাজ করেন এবং এই দলের সঙ্গীত রচক এবং গায়ক হিসাবেই তিনি জনসমাজে সুখ্যাতির অধিকারী হন। পরে নীলুঠাকুর, ভবানীচরণ বণিক প্রভৃতির দলে কিছুকাল কাজ করেন এবং পরিশেষে নিজে পৃথক দল গঠন করিলেন। পৃথক দল গঠন করিবার পর তাঁহার খ্যাতি আরো বাড়িয়া উঠে। রামানন্দের রচনার সহিত পরিচিত হইবার কোন আশাই বর্তমানে নাই। গোরক্ষনাথ যোগীর সহিত রামানন্দের কবিতা-যুদ্ধের বিবরণ হইতে কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধার করা গিয়াছে। গোরক্ষনাথ ছিলেন এণ্টনি ফিরিঙ্গির বাংলা ভাষাশিক্ষার গুরু এবং ফিরিঙ্গির দলের অন্যতম প্রধান সঙ্গীতরচক। কোন কারণে এণ্টনি ফিরিঙ্গির সহিত মতান্তর হওয়ায় গোরক্ষনাথ যোগী নিজে কবিগানের দল সৃষ্টি করেন। ইঁহার (গোরক্ষনাথ) রচিত একটি মাত্র গীতের পরিচয় পাওয়া যায়:

মহড়া। তোরে ভালবেসে ছিলেম বলে প্রেম,
আমার দু'কুল মজালি।
দু'মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।
সই কিসে বিচ্ছেদ-বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি।

ক'রে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে, চোখে দেখে ঠকেছি।
যেমন মৎস্য মাংস্য ভোগী, হয়েছিল জাম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে, এখন সেইটে ঘটালি॥

চিতেন। পিরীতে মজিয়ে চিরদিন রব,
প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তোরি জন্যে হলেম পরের বশ,
আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম,
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ।
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি,
কর্লি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমায় মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি॥[1]

রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলন সংবাদে প্রায় প্রত্যেক কবিওয়ালাই আপন আপন সংরচনে কোকিলকে একটু অগ্রাধিকার দিয়াছেন।[2] গোরক্ষনাথের কথায়—

একবার ডাক্‌রে কোকিল! ডাক কুঞ্জ ঘিরে,
অনেকদিন তোর কুহুস্বর,
শুনি নাই রে পিকবর!
তাই সাধ্‌ছি এত বিনয় করে।

'বিনয়ে'র বিস্তৃত-বিবরণ কবির কথায় জানিবার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামানন্দ নন্দীর ধরতাটি অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে:

শ্রীকৃষ্ণ অভাবে রয়েছি নীরবে,
শ্রীকৃষ্ণ না এলে ডাক্‌তে বোলো না,

১ 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' হইতে।

২ মধুসূদন কিন্নরের 'হে কোকিল! বসে তমালে, ডেকো না আর কৃষ্ণ বলে' গানটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে, কবি রসিকচন্দ্র রায়, 'কোকিল দূত' নামক সংক্ষিপ্ত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি কবি রসিকচন্দ্রের 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থের (১২৬৮ সালে প্রকাশিত) শেষাংশে সংযোজিত হইয়াছে।

এখন কর্ণে কুহুধ্বনি, হবে বজ্রধ্বনি,
শ্রীপতি বিনে শ্রীমতী প্রাণে বাঁচ্‌বে না ॥

রামানন্দের শ্লেষাত্মক সঙ্গীতেরও রস-বৈচিত্র্য অনুভব-গম্য। গোরক্ষনাথ যোগী এণ্টনি ফিরিঙ্গির দল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাই গোরক্ষনাথের প্রতি রামানন্দের উক্তি—

এক বাহাদুরী কাঠ, এইখানেতে পুঁতে,
রাউত গাঁ—গঙ্গা পারেতে,
তাহার উপর চড়বে তবে,
স্বর্গে যাবার পথ দেখায়।
নূতন এক কীর্তি করি ভাই,
মেলিয়া বিবির ঠোক্‌না খেয়ে,
ওর পাখ্‌না ছিঁড়ে গিয়েছে,
গোরক্ষ গোব্‌রে পোকা,
আর ভ্রমরা হতে এসেছে ॥

নিজ গুরুর প্রতিও রামানন্দের ব্যঙ্গ নিক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে নাই।

নিতাই দাস-বৈরাগী, বাজাতো ডুগ্‌ডুগি,
আর চন্দননগরে ভিক্ষা ক'রতো,
তুম্ব বেঁধে কাঁধেতে···
আমরা ম'রে যাই লজ্জাতে।

গুরু নিতাই-এর উত্তরের সম্পূর্ণ কবিতাটি জানিবার উপায় নাই।

আমি ভিক্ষা ক'রে খাই, তাতে লজ্জা নাই,
কিন্তু রামানন্দের মত ····· ॥

কবিওয়ালা রামানন্দ পরবর্তীকালে সাধককবি রামানন্দে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। রামানন্দের 'আগমনী' বিষয়ক সঙ্গীত ভক্তের বিনম্র আকুতি সহ পরোক্ষভাবে সকলের মনোজয় করে।

আধ আধ মৃদুস্বরেতে
ঈশানী পাষাণীকে কয়।
শিবের দৈন্য-দশা শুনে, ক্ষুণ্ণ মা দুঃখিনী,
ক্ষুব্ধ যে পিতা হিমালয় ॥ [অসম্পূর্ণ]

রামানন্দের মৃত্যু-কথা বড় বিচিত্র। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার পত্রলেখকের পত্র হইতে জানা যায়, যে ১২৬০ সালের দুর্গোৎসবের সময় কবিওয়ালা রামানন্দ তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ভাটপাড়াতে আসেন। সেইখানে তাঁহার জ্বর হয়। জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তিনি রাস্তা অভিমুখে বাহির হইয়া পড়েন। সকলে বাধা দেওয়ায় তিনি বলেন যে তাঁহাকে, গুরুবাড়ি ও জন্মভূমি দেখিতেই হইবে, কারণ সেইদিনেই তাঁহার লোকান্তরণ ঘটিবে। কবি আপনার গুরুবাড়ি ও জন্মভূমি দর্শন করিয়া ভাগীরথীর পুণ্য-সলিলে নামিয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহার ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটে।

সাতু রায়

লোকের মুখে মুখে যাহাদের নাম ফিরিত সেই শ্রেণীর কবিওয়ালা সাতু রায়। তাই সাতকড়ি রায় অপেক্ষা সাতু রায় নামেই তিনি লোক-সমাজের প্রিয় হইয়াছিলেন। সাতু রায় আশৈশব কবি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের বৈঁচিগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। জন্মকাল আনুমানিক ১২০০ সাল এবং ইঁহার মৃত্যু হয় ১২৭৩ সালে। তাঁহার পিতার নাম—পিতাম্বর রায়।

পিতাম্বর রায় শান্তিপুরের গোস্বামীদের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। সাতু রায়ও শৈশব-পাঠ সাঙ্গ করিয়া পিতার অনুগামী হইলেন। কর্মজীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যজীবনের আরম্ভ হইল। মনের গান বাহিরে প্রকাশ হইল। বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রা ছিলেন সাতু রায়ের প্রথম জীবনের সঙ্গীতের প্রচারক। ভোলা ময়রা আসিয়াছিলেন শান্তিপুরের জমীদার ভবনে গাওনা করিতে। সেইখানেই সাতু রায় এবং ভোলা ময়রার যোগাযোগ ঘটিল। সাতু রায় নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। কাব্যের পাখায় ভর করিয়া মানস-বিস্তারের সীমানা ব্যাপকতর হইল। এই সঙ্গে তাঁহার কবি-স্বভাবের বিকাশলাভের পক্ষে আরো একটি ঘটনা ঘটিল। শান্তিপুরের শিবচন্দ্র সরকার শখের কবিগানের দল করিলেন। সঙ্গীতের যোগনাদার হইলেন—ব্রাহ্মণ কবিওয়ালা সাতু রায়।

অন্যান্য কবিওয়ালাদের মতই সাতু রায়ের রচনার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তথাপি কবিগানের বিরল-চিহ্ন আদিগন্ত প্রান্তরে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর পদরেখার অর্থানুসন্ধান যেমনি কৌতুহলবহ তেমনি আবেগ-মধুর। শ্রীকৃষ্ণের রূপচিত্রনের কাব্যকথা আনন্দ-বেদনার রসে ভরপুর।

অপরূপ একি রূপ কৃষ্ণরূপ লিখেছ গো রাই !
লিখিলে সব শ্যামের অবয়ব,
গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ গো কৈ !
ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই ॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী, কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন,
নির্জনে শ্যাম ধনে দেখবার হল আকিঞ্চন।
ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ করে লিখন,
মথুরায় পাছে যায়, সেই ভয়ে লিখলেন না যুগল চরণ,
এ রূপ করিয়া দরশন, জিজ্ঞাসেন সখিগণ
রাই রাই বল গো রঙ্গময়ি,—একি রঙ্গ দেখি।
একি ভাব সুধাংশুমুখি !
তোয় শুধোই ;
কও কি ভাবে এ ভাবের হল উদয় কিশোরী.
শ্যাম শরীর লিখ্‌লে লিখিলে সমুদয়,
আমরা যে চরণ শরণ লয়েছি সর্বজন রাই রাই গো ॥
আজ কি সে চরণ লিখ্‌তে তোমার স্মরণ নাই !
এই বিনয় করি, লেখ গো কিশোরী,
শ্রীহরির শ্রীচরণ অঞ্চলে আর ঝাপিস নে রাই !
অঙ্গহীন মাধুরী কর্তে নাই দরশন,
যে চরণ সাধন জন্য সদাশিব যোগধর্ম করেন আশ্রয়,
ত্রিভঙ্গের সর্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়,
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হলি বিস্মরণ
দুঃসহ বিরহ কিশোরি, কিসে করবি নিবারণ,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পারাবার যা হতে হবে পার,
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই।

শ্রীরাধিকা এই ভুলেরও জবাব দিয়াছেন আপনার সহজাত আর্তিতে—

নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়।
শ্রীমূর্তির প্রতিমূর্তি শ্রীপদ লিখে শ্রীমতী খেদে কয় ॥

বলবো কি সখি! বলতে বিদরে হৃদয়,
লিখে শ্রীকান্তে লিখি নাই সই!—শ্রীচরণ,
কি কারণে বিবরণ বলি শোন,
লয়ে গেল শ্যাম কংসালয়,—
আন্‌লে না নন্দালয়,—সই সই সই গো!
রইলো দুরাশয় নিঠুর হ'য়ে মথুরায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয়,
চিত্র ময়ূরে গেলে হায়,
বিচিত্র কি চিত্র-শ্যাম যদি মধুপুরে যায়॥

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীদের জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর, প্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি সাতু রায়ের বিরল-গোচর রচনার খণ্ডাংশ বলিয়া সংগ্রহযোগ্য সন্দেহ নাই; তবে ইহার কাব্য-মূল্যও নিম্নস্তরের তাহাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার ক্ষেত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি অপাংক্তেয় হইবে না নিশ্চয়।

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই?
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।
হাঁ গো বৃন্দে! শ্রীগোবিন্দের পায়,
করে প্রাণ সমর্পণ;
হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল
অনুকূল কেবল শ্যামধন—
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন।
সই চারিদিকে গঞ্জনা,
পাপলোকে তা বুঝে না,
কৃষ্ণধন কি ধন!
আমার মিথ্যা বাদ-অপবাদ
দেয় কালার পরিবাদ,
আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই?

মান-অভিমানের বিচিত্র-নাটক-কথন কবির স্বকীয়তার অনুগামী। শ্রীরাধিকা মিলনোৎকণ্ঠায় অধীর—

মহড়া। মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেথানে॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়॥
মনের তিমির যাবে মনোমিলনে॥

চিতেন। সাজ গো, সাজ গো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতা, আরো ললিতে
রঙ্গদেবী সুদেবী গো যত সখিগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন॥
রাধা বলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে॥

পরিশেষে, 'মাথুর' পর্যায়ে কবি সখী-সংবাদ-এর মধ্য দিয়া শ্রীরাধিকার অন্তর-মথিত আবেদনের স্বরূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে?
একবার এসে অক্রূর মুনি, কল্লে কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি,
হ'রে লয়ে গিয়েছে।
উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে,
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথ মধ্যেতে।
কহ হে উদ্ধব! কও কি জন্য আগমন?
আশা সুলক্ষণ কি হে বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে গোকুলে আসি কল্লে পদার্পণ?
দেখে মথুরা নিবাসীর ভয় হয়;
একজন এসে ছদ্মবেশে, প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে,
সাধু হও যদ্যপি তথাপি সন্দ হ'তেছে।

যেমন সেই অক্রুর দেখ্‌তে স্বধার্মিক ;
তোমায় ততোধিক দেখ্‌ছি শতাধিক,
স্বধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্ত্বিক।
কিন্তু কুগ্রাম নিবাসী যারা হয়,
ধর্ম-রহিত তাদের চরিত, ধর্মশাস্ত্রে লিখেছে ॥

যে যুগে কাব্য এবং সঙ্গীত দেশের জনসমাজকে আপনার কুক্ষিগত করিয়াছিল সেই যুগেরই অন্যতম কবি সাতু রায়। গ্রাম্যকবি আপনার ক্ষমতানুযায়ী কাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলি তাঁহার কাব্যের প্রাণকেন্দ্র। ধর্মপ্রবণ কাব্যানুভূতি—তাঁহার কাব্যধর্মের মূলপ্রেরণা। কাব্যের যেখানে স্ফুরণ হয় নাই, সঙ্গীত সেখানে কবির মান রাখিয়াছে। কবিওয়ালা সাতু রায় সেখানে নগণ্য হইয়া পড়ে নাই।

ভোলা ময়রার দলের বাঁধনদার সাতু রায়কে খ্যাতির জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কবিওয়ালা সাতু রায় অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন দলের বাঁধনদার হইলেন। কিন্তু, কবিগান রচনার পরিবর্তে অর্থগ্রহণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তাহা তিনি গ্রহণও করেন নাই। আজীবন জমিদারী-সেরেস্তাদার হিসাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে নদীয়ার নিকটবর্তী রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী জমিদারদিগের বারাসাত মহকুমার মোক্তারী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইনি লোকান্তরিত হন।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী

আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলায় ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামদয়াল চক্রবর্তী, জমিদারী সেরেস্তার সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ঠাকুরদাস উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই কিন্তু অল্পবয়স হইতেই কাব্যের নেশায় পাইয়াছিল। এই সময় এণ্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির কবির দল বিশেষ প্রসিদ্ধি পাইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরদাস ইঁহাদের সহিত যোগাযোগ করেন। ঠাকুরদাসের রচনা-মাধুর্যে ইঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হন। ঠাকুরদাস গান বাঁধিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালাদের দিতেন। ঠাকুরদাস নিজে কখন কবি-দল করেন নাই। গান বাঁধিয়া অপরাপর দলের নিকট হইতে অর্থোপার্জন করিতেন। এণ্টনি, রামসুন্দর প্রভৃতির দলের ইনি ছিলেন

নিয়মিত বাঁধনদার। এণ্টনি সাহেব যেবার চুঁচুড়ায় তাঁহার বাঁধনদার গোরক্ষনাথের নিকট অপ্রতিভ হন, সেইবার হইতে গোরক্ষনাথ বাঁধনদারের কাজ হইতে অপসারিত হন এবং ঠাকুরদাস বাঁধনদারের কাজ করিতে শুরু করেন। তিনি কচিৎ আসরে দাঁড়াইয়া গান করিতেন, নিতান্ত অনুরোধ না পড়িলে এ কার্য তিনি করিতেন না।"[১] কবিগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকার হিসাবে ঠাকুরদাসের খ্যাতি বড় কম ছিল না। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক'-কার ঠাকুরদাসের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'তিনি-সঙ্গীত রচয়িতা ও বৈষ্ণব পদকর্তা।' কবি-সঙ্গীত রচয়িতা ঠাকুরদাসের পরিচয় অবিদিত নাই, কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে তাঁহার পৃথক কোন পরিচয় ছিল কি না তাহা বলা দুরূহ। কবিগানের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি যে রাধাকৃষ্ণ কথা কবিগানের মুখ্য বিষয় এবং তাহার সুর যে বৈষ্ণব কবিদের বংশীধ্বনির সহিত একতান বিশিষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রেম-সঙ্গীত রচনা ক্ষেত্রে ঠাকুরদাস যে উৎকর্ষগামীতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা লক্ষ্যণীয়।

॥ ১ ॥

বল সই কি কথা,
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।
তবে কার্যান্তরে হইলে সতন্তর,
তুষতে নারি প্রাণ তোমার॥
তা বোলে ভেব না প্রিয়ে আমায় পর।
আমি নহি তো পরের প্রাণ,
তুমি না পরের প্রাণ,
তোমারি বাঁধা নিরন্তর॥

পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর
পুরুষ প্রাণ দিলেও, নারী সুযশ করে না
কও, কে শিখালে হে তোমারে,
এমন ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা॥
বিনা দোষেতে দুষো,
সুখের প্রেমে দুখ দিও না;
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না॥

॥ ২ ॥

শ্রীমতী। এই মিনতি রাখ গো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ,
সও গো সও অল্পদিন আর দুখের ভার॥

১ সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১৭ সাল।

হরি কি পাগলিনী, কমলিনী
কৃষ্ণ বিরহের দায় ?
ছি ছি ধৈর্য ধর, সহ্য কর দুখ,
সময়ে পাবে শ্যাম রায়।
আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে—
সাধে কৃষ্ণ সাথে বাদ,
পরিবাদ ঘটালে এই গোকুলে।
দুখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কাজ নাই,
ঘটাসনে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
জেনো সকলি কপালে হয়,
রাধে গো, দোষ নাই কা'র।
বাঁধ ধৈর্যগুণে প্রাণ, কিশোরী।
ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ,
বিপদের কাণ্ডারি হরি।
ভাব একান্তে শ্রীকান্তে, হবে দুখ অন্তে,
হয় দুখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার॥

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কে বা পায়।
কভু কুব্জায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরী।
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়।
সকলে জানে সই রসময়! আমি ইচ্ছাময়।
জগত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে আমা হতে হয়॥
কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব,—
করি কখনো ঘটালি, কখনো রাধার দাসত্ব।
কভু গোষ্ঠে করাই গোধন,
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন,

কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপীকায়।
কভু ভিক্ষা করিতাম,
মানিনী রাধার মানের দায়॥
কভু করে ধরি গিরি গোবর্ধন,
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে রক্ষা করি গোপীগণ,
কভু পুতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি,
কালীয় দমন।
কভু উদুখলে বাঁধেন যশোদা আমায়॥

সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের যে রীতি ঠাকুরদাসের রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ছন্দ-বৈক্লব্যদোষ থাকিলেও গায়নরীতির সুর মাধুর্যের অমৃতধারায় জনচিত্তহারিতার গুণে ভূষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দুখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কাজ নাই,
ঘটাস্‌নে জ্বালার উপর জ্বালা আর।

সখী-সংবাদের এই বিরহ-বিচিত্রার মাধুর্য সত্যই অনন্যসাধারণ। অধিকাংশ কবিওয়ালার রচনা বিচারের ক্ষেত্রে আমরা যদি কেবল কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে প্রয়াস নিবদ্ধ করি তবে—ভাব, ভাষা, ছন্দের ক্ষেত্রে অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসঙ্গতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইবে কিন্তু সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে এই কবি-সঙ্গীতগুলি নিছক সঙ্গীত হিসাবে দেখা দেয় নাই। কবিগানের গায়ন-রীতির ক্রমভিব্যক্তির মধ্য দিয়া এগুলির প্রকাশ এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এ গুলির রস-রূপ বিচার্য। ঠাকুরদাসের রচনা-রীতির সহিত এই গায়ন-ভঙ্গীর রূপটিকে সম্মিলিত করিলে তবেই তাঁহার রচনা-নিচয়ের সত্যকার পরিচয় পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কবি এবং গায়ক-ঠাকুরদাস বহুক্ষেত্রেই আপনার চিন্তানুগ কাব্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার নিজস্ব বিশিষ্টতার পরিচয় সহজলভ্য।

নবাই ময়রা

কবিওয়ালা নবাই ময়রা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ থানার খেরুর গ্রামে ১৭৯২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কবিগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নবাই ময়রার গানের মধ্যে এই বিষয়-বৈচিত্র্যের, নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি মূলত শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য কবিওয়ালা নবাই ময়রা অপেক্ষা সাধক নবাই ময়রা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অত্যধিক।

নবাই ময়রা প্রথম জীবনে মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গা ময়রার দোকানে মাসিক তিন টাকা বেতনে চাকরি করিতেন। একদিন ভিয়ান করিতে করিতে সঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন, তাহার ফলে ভিয়ান নষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গা ময়রা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করিলে তিনি নিম্নোক্ত গানটি গাহিয়া কাজে ইস্তফা দেন :

গুরু দত্ত গুড় লয়ে ভিয়ান কর মন ময়রা হয়ে।
সন্দেশ তৈরী হ'লে ভেট দিবি শমনে গিয়ে॥

*　　　*　　　*

রসনারে ঝাঁঝরি করে ভ্রান্তি মন দাও উড়াইয়ে॥
খেরুর গ্রামে বসত বাটি, গুড় চিনিনে ময়রাবটি।
নবাই ময়রা কহে খাঁটি, সন্দেশ কি হয় হেথায় বড়ি॥　　[অসম্পূর্ণ]

শোনা যায়, এই সময় দেবী তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, নবাই যেন কর্মে ইস্তফা দিয়া তাঁহার নাম গান গাহিয়া বেড়ান; তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিবে। মালডাঙ্গা হইতে ফিরিয়া তিনি নিজে দল গঠন করিলেন। চণ্ডীর গান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। বর্ধমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চণ্ডী-গায়ক রামনারায়ণ স্বর্ণকার ও খেরুর গ্রামনিবাসী শ্রীনিবাস তন্তুবায় এবং খেরুর গ্রামের প্রসিদ্ধ রায়-বংশীয় বৈদ্যনাথ হইলেন নবাইর দলের গায়ক, দোয়ার এবং সাহায্যকারী। নবাই ময়রার গীত সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের ধারা আশ্রয় করিয়া নবাই ময়রার আবির্ভাব। ভক্তের আকূতিই তাঁহার সর্বস্ব। শাশ্বত মাতৃমূর্তির নিকট চিরকালীন শিশুপুত্রের যে মান-অভিমান, আনন্দ-বেদনার আবেদন-নিবেদন—তাহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে নবাই-র রচনায়। জীবনকে স্পর্শ করিয়া জীবধাত্রীর নিকট তাঁহার সার্বকালিক আবেদন আজিও সকলের অন্তর স্পর্শ করিবার ক্ষমতা রাখে। আচারবাদিগণের শুষ্ক নিষ্ঠার

দৃঢ়তা তাঁহার নাই; তাই শ্যামার সহিত শ্যামের রূপ তিনি অভিন্ন দেখিয়াছেন। বর্ধমানের বামনপাড়া গ্রামের গোস্বামীদের বাড়িতে একবার তাঁহার গান হয়। সেইখানের গাওয়া তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গান উদ্ধৃত হইল।[১] এই গানটির সম্পর্কে অনাথকৃষ্ণ দেব লিখিয়াছেন,—'কতদিনকার, কাহার রচিত, জানি না,' কিন্তু তিনি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন উচ্ছ্বসিত ভাবে। ইহাকে তিনি 'জাতীয় গীত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[২]

হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নর কর কটি বেড়া ত্যজে পরয় পীত ধড়া
মস্তকেতে দে মা মোহন চূড়া, মুক্ত বেণী লুকাইয়ে॥
ত্যজে নর মুণ্ডমালা, গলে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও মা কাল্য, (দাঁড়াও)
চরণে চরণ থুয়ে॥
হৃদ্ মাঝারে কাল কালী,
ওরূপ দেখ্‌তে আমি বড় ভালবাসি,
নবাই প্রতি সদয় হ'য়ে।

এখানে স্বতঃই 'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে' গীতটির একটি সহজ ভাব-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'বৃন্দাবন' এখানে 'হৃদয়-রাস-মন্দিরে' রূপান্তরিত হইয়াছে এই মাত্র। অপর একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে কবি আপনার ভক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়াছেন :

কালী কে জানে তোমায় গো।
কে জানে তোমায় অনন্ত-রূপিনী॥
তুমি মহাবিদ্যা, অনারাধ্যা রাধা।
ভববন্ধের বন্ধন হারিণী তারিণী॥
সারদা বরদা শুভদায়িনী।
মানদা পুণ্যদা যশোদা-নন্দিনী॥

১ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রবন্ধ (শ্রীসুদর্শন পত্রিকা, ১৩৬৪) দ্রষ্টব্য।
২ বঙ্গের কবিতা। পৃঃ ২৮৬

জ্ঞানদা, অন্নদা কামারি কামিনী।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হৃদি-বিলাসিনী॥
শমন ভবন গমনকারিনী।
সৃজন পালন নির্বাণকারিনী॥
সাকারা আকারা, তুমি নিরাকারা,
নবাইর ভার হয় জননী॥

নবাইর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও একটি ভাগিনেয়ী ছিলেন। ভাগিনেয়ী শ্যামাসুন্দরী একবার মাতুলকে তাহার নামে কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। নবাই নিম্নোক্ত গীতটি সেইসূত্রে রচনা করিয়াছিলেন:

শ্যামা আমার কেমন মেয়ে দেখ্ দেখি মন বিচার ক'রে।
এমন মেয়ে না হ'লে কি হরের মন ভুলাতে পারে॥
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরতে কঠিন হয়;
অন্য মেয়ের কর্ম নয়, মদন যারে শঙ্কা করে।
অপরাধ হের নয়নে, এমন নাই আর ত্রিভুবনে,
বিবসনা, বিবসনে, জগজ্জনের মন হরে॥

নবাইর সঙ্গীত বর্তমানে খুবই দুষ্প্রাপ্য—এখানে কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ সঙ্গীত প্রকাশিত হইল:

॥ ১ ॥

জানি গো জানি শ্যামা তুমি যেমন দয়ামই।
তুমি কারে হাসাও,
কারে কাঁদাও মা তোমার ব্যবসা অই॥
পঞ্চামৃত দাও মা কারে, রাখ স্বর্ণময়ী পুরে।
কারো ভাগ্যে দিনান্তরে পায় না দুটো চোঁয়া খই॥
পেতে একটা মায়া হল, নবাইকে করেছ ভেলা।
আছে এক শমনের জ্বালা, তাইতে তোমারেই স্মরণ লই॥

॥ ২ ॥

শোন্ মা আমার দুঃখ তারা।
আমার ঘর সোজা নয় ঘরতি ঘরা॥

যারে লয়ে ঘর করি মা, শোন বলি তার কাজের ধারা।
যারে চর্বচূষ্য করে যোগাই; সে না বলে তারা তারা॥
দারওয়ান আছে পাঁচ জন, সদাই তারা দেয় পাহারা,
চোর ছেড়ে দেয় করতে চুরি, সাধু দেখে দেয় মা তাড়া।
নবাই বলে ভার হলো মা, এ ঘরে বসতি করা,
ছয়জন চোরে যুক্তি করে লুটল আমার ধনের ঘড়া॥

॥ ৩ ॥

আর কতদিন দীনের অধীন করে আমায় রাখিবে।
দয়াময়ী এ দীন বলে কবে তোমার মনে হবে।
অজ্ঞান বালকের মত, হয়ে থাকি মা সতত,
সেই দেহে জ্ঞানামৃত, আশ্রয় যে মা দিতে হবে॥
কুদিনে অজ্ঞানে গেল চিরদিন,
যায় না কুদিন হয় না সুদিন।
আসিছে বিষম কুদিন,
সেদিন কেমনে যাবে॥
আমি শ্যামা আমার নই,
সতত পরবলে বই।
নবাই ওরে রক্ষাময়ী পরবল কবে ঘুচাবে।

বলাই বৈষ্ণব

বলাইচাঁদ সরকার বলাই বৈষ্ণব নামেই পরিচিত ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত পিয়াসপাড়া নামক গ্রামে। ইঁহার প্রপিতামহের নাম বংশীবদন, পিতামহের নাম কৃষ্ণকমল এবং পিতার নাম রামকমল। ইঁহারা সদগোপ জাতীয় ছিলেন। বলাই-এর দেহান্তর ঘটে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে। ইঁহার জন্মের তারিখ জানা যায় নাই। সেকালে একটা চলিত প্রবাদ ছিল।

ছবিতে উমাচরণ।
কবিতে বংশীবদন॥

কবিওয়ালা বংশীবদনের যথার্থ উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন বলাই বৈষ্ণব। কবিওয়ালা

হিসাবে ইঁহার প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। কবিওয়ালা বলাই যে বৈষ্ণব বলাইরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং অন্তর-ধর্মে তিনি যে সত্যই বৈষ্ণব ভাবাশ্রয়ী ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটি হইতে বোঝা যায়:

এসব ললিত রাগে বীণা বাজায়
কে গো ললিতে ?
মুখে জয় জয় ধ্বনি,
বীণাধ্বনি, করে ধনি,
এসেছি জুড়াব বলে রাধার কুঞ্জেতে,
হরি চেনা চেনা করি, নারি চিনিতে॥

কিংবা,

মথুরাতে যায় প্রভাতে, কৃষ্ণ দয়াময়,
প্রেমের দায়, বিদেশিনী হয়ে নিকুঞ্জে উদয়।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছকে-বাঁধা কাহিনীর কাব্যরূপায়ণ ব্যতীত আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে কবিতা রচনার একটি বিবরণ জানা যায়।

একবার তারকেশ্বরের মোহান্ত মহাশয়ের বাড়িতে প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রার সহিত বলাই বৈষ্ণবের 'কবির লড়াই' হইয়াছিল। দুই পক্ষই সমান প্রবল। কবির আসর অত্যন্ত আগ্রহ ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। "বলাই সরকার এ পর্যন্ত কোন আসরে কাহারো নিকট হার মানেন নাই; সুতরাং ভোলাকে হারাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী-প্রায় ভোলা অতি সাবধানতায় তাহা লক্ষ্য করিতে করিতে বুঝিল 'প্রতিদ্বন্দ্বী বলাই সরকার সামান্য পুরুষ নহে'।" যাহা হউক, ভোলা ময়রা পরাজয় স্বীকার করিবার লোক ছিলেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বলাইকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন; নিরাশ হইয়া বলাই তখন মনে মনে স্থির করিলেন 'এই আসরে যদি আমি হারি, তাহা হইলে চিরকালের জন্য আমার মুখ কালিমাময় হইয়া যাইবে; সুতরাং ভোলার তোষামোদ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই বিধেয়।'[১] এই ভাবিয়া, ভোলার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনাচ্ছলে, প্রকারান্তরে গাহিতে লাগিলেন:

১ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১১ সাল।

মান দিনু তব পায়॥
মনে রেখ হে আমায়,
মান দিনু তব পায়॥

পড়েছি সঙ্কটে হরি,
এবার বাঁচি কি মরি,
চেয়ে দেখ একি দায়।
মান দিনু তব পায়॥

ধন গেলে ধন ফিরে আসে,
মান গেলে মান আর কি আসে?
এ প্রবাসে, তব পাশে, এ ভিক্ষা চায়,
মান দিও হে আমায়॥

মান দিনু তব পায়,
মানের বদলে মান দিও হে আমায়,
সাধের প্রাণ দিনু তব পায়॥

বলাই ভোলা ময়রার নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মসমর্পণের দ্ব্যর্থবোধক ভাষার মাধ্যমে তিনি যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা বোধকরি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যই বিরল। এই প্রসঙ্গে ভোলা ময়রার উত্তরটিও রসপূর্ণ—

সখে, প্রাণ দেবে কি আমায়!
প্রাণ যে দিয়েছ রাধায় (সর্ববিধায়)
আবার প্রাণ দিবে কি আমায়।
মনরাখা প্রাণ চাই না হরি,

চরণ চাও চরণে ধরি,
অন্তে যেন বংশীধারী,
রেখো রাঙা পায়।
প্রাণ দিবে কি আমায়॥

পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের পাঁচালির কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভোলা ময়রার উত্তরটি স্থান পাইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে দাশরথি রায়ের রচিত কি-না কিংবা ভোলা ময়রার নিজস্ব রচনা, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সুকঠিন; তবে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর প্রকাশিত সংস্করণগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সংস্করণে (১৮৪৭) ইহার উল্লেখ নাই। সেই কারণে, এই উৎকৃষ্ট গীতটির রচক হিসাবে ভোলা ময়রাকে সম্মানিত করিলে বোধকরি অন্যায় হইবে না।

মহেশ কাণা

"অনুমান ১২১০ সালে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাসত নামক গ্রামে কবিওয়ালা মহেশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন।"[১] আনুমানিক ১২৬৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহেশচন্দ্রের পিতার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। একে জন্মান্ধ, তায় দরিদ্রাবস্থা! মহেশচন্দ্র ইহারই মধ্য দিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান লাভ করেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি—এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বারাসতের নিকটবর্তী মহেশপুরের এক ভট্টচার্য ঠাকুরের সংস্কৃত টোল ছিল। মহেশচন্দ্র সেই টোলের ছাত্রদের বিদ্যাধ্যয়ন শ্রবণ করিতেন, ইহাই ছিল তাঁহার বিদ্যালাভের উৎসস্থল।

পরবর্তীকালে কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) এবং প্রথম নাথ দেব (লাটু বাবু) মহাশয়গণের আশ্রয়ে মহেশচন্দ্রের কবি-খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন ধনী এবং জমিদারগণের সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, মহেশচন্দ্রের কবি-খ্যাতিও সেই ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ছাতুবাবু এবং লাটুবাবুর পিতার নাম রামদুলাল সরকার। "শুনা যায় ১০৮ জন ওস্তাদ, কবিওয়ালা ও পাঁচালিকার তাঁহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। তন্মধ্যে বিখ্যাত কবিওয়ালা সাতু রায়, মহেশ কাণার নাম উল্লেখযোগ্য। ····· ছাতুবাবু সবিশেষ গুণজ্ঞ এবং স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কতিপয় সঙ্গীত এমনি করুণরসাত্মক ও মর্মস্পর্শী যে শুনিতে শুনিতে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে :

তার কথা কার কাছে কই ?
এমন দুঃখের দুঃখী মিলে কই ?
প্রকাশিলে পরে, পাছে শুনে পরে,
সদা ভাবি অই। ইত্যাদি।"[২]

মহেশচন্দ্রের রচিত কবি-সঙ্গীত মাত্র দুইটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ আকারে নয়।

১ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৫ সাল।
২ ঐ

বালিকা ছিলাম, ভাল ছিলাম তো
ছিল না সুখ অভিলাষ।
পতি চিনিতাম না, সে রস জানিতাম না
হৃদ্-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ॥ ইত্যাদি

অনেকের মতে ইহা রাম বসুর রচিত। তৃতীয় বর্ষের 'সমীরণ' পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সঙ্গীতটি মহেশ কাণার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় অপর একজন লেখক ইহা রাম বসুর বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। উভয়েই যুক্তি-তর্কের সীমানায় প্রবেশ করেন নাই।

মহেশচন্দ্রের অপর সঙ্গীতটি বাৎসল্যরস-বিমণ্ডিত।—

পুত্র প্রসবিয়ে যশোদার চিত্ত অলস, অবশ,
তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, তথ্য না জানেন নিয্যস।
কোন সখি প্রভাত সময়—
বলে, উঠ মা নন্দরাণী, পোহায়েছে রজনী
কোলে তোমার কালাচাঁদের উদয়।
হর পূজি বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে,
সে ছেলে এখন উচ্চস্বরে করিছে রোদন।
নন্দরাণী এ আনন্দে, কেন হ'লে অচেতন,
একবার কর শুভ দরশন॥

মোহন সরকার

"ইহার নিবাস ছিল যশোর—বনগ্রামের নিকটবর্তী গোপাল নগর।"[১] ইনি জনসাধারণের নিকট মোহনদাস বৈরাগী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কবিওয়ালা নিতাই দাসের সমগোত্রীয় ইনি। মোহনদাসের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল, তাঁহার রচিত 'ছুট্ সঙ্গীত'।[২] 'ছুট্ সংগীত' গাহিয়া পরবর্তীকালে মোহনদাসের তুল্য কৃতিত্বের অধিকারী অপর কেহ হইতে পারেন নাই। মোহনদাসের পুত্রের নাম 'যদুবর দাস' মতান্তরে যদুনাথ দাস[২]। যদুবর পিতার অবর্তমানে কবিদল চালাইয়াছিলেন। মৃদঙ্গ

১। বঙ্গভাষার লেখক
২। সাহিত্য সংহিতা ১৩১৪ সাল।

বাজনায় ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মোহনদাসের দুইটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে।

দেখো কৃষ্ণ যাই জলে, তব কষ্টে প্রাণ জলে
লজ্জা যদি পাই হে জলে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥
গোকুল ভাসে আমার কু-রবে,
কিসে দাসীর কুল রবে।
জলাধারে জল কি রবে?
জলধির প্রতিকূলে ॥
দাসী দোষী এ গোকুলে, কলঙ্কিনী সবাই বলে।
ছিদ্র কুম্ভ আন্‌তে বারি যাই হে হরি!
তোমায় ব'লে ॥
যেদিন হ'লে প্রতিকূল,
সেদিন হারায়েছি দু'কূল।
এখন পাইনে এ কূল ও কূল,
মনে রোখো যমুনার কূলে ॥

শ্রীরাধিকার অন্তর-ব্যথার যে চিত্র মোহনদাস উপর্যুক্ত সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই ভিন্নতর রূপালোচনা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখে প্রাণ জলে যায়, কেন আন্‌লে আমায়,
ওহে নারদ প্রভাস কূলে।
হেথা রুক্মিণী শ্যামের বামে বসে আছে,
দেখে চক্ষেতে, দুঃখেতে আর কি আমার জীবন বাঁচে,
তোমার হে কথা শুনে, এসে এই যজ্ঞস্থানে,
মহড়া। খেদে ভাসি কেবল নয়নজলে ॥
খাদ। হ'লো যন্ত্রণা মরি প্রেমানলে ॥
চিতেন। কৃষ্ণ ছিলেন যখন ব্রজপুরে, অভিমান কর্লে পরে,
আদর করে, আদর করে, রাখতেন আমার মান।

গেল সে সব মান, হলেম এখন অপমান,
হায়, রুক্মিণীরে আদরিণী, করেছেন শ্যাম গুণমণি,

ফুকা। হারিয়ে মণি কমলিনীর, আর কি বাঁচে প্রাণ ॥
হলো আমার আজ মিছে আসা এখানে,
জানিলাম মনে,

মেলতা। আবার সেই বিয়ের বাতি উঠলো জ্বলে ॥

চিতেন। সখি সমভিব্যাহারে কমলিনী রাই এসে প্রভাসকূলে
দেখে কৃষ্ণধনে, অতি বিরসমনে,
শ্রীমতী নারদকে বলে ?
আমি কৃষ্ণধন পাবার তরে,
এলেম কত আশা করে, কপালগুণে
সে আশা গেল, ভাগ্যে এই ছিল,
এখন কোথা যাই বল, হায় !
ব্রজে ছিলেম ছিলেম ভাল,
প্রাণ যেত যে সেও তো ভাল,
শ্যাম কে হেরে প্রাণ বিদরে,
অজ্ঞান হলো ॥

মেলতা। এলেম সকলে জলধির তীরেতে,
শ্যামমুখ দেখি হেথায় এই সলিলে ॥

অন্তরা। কুল গেছে গোকুলে আমার নারদ মুনি।
সবাই জানে বৃন্দাবনে আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
অথবা যত গোপবালা, এখন কত সব বিচ্ছেদ জ্বালা,
দেখ কৃষ্ণ বিনে আর, জীবন রাখা ভার,
আশা গেল হলেম অনাথিনী সব গোপিনী ॥

চিতেন। মজে কৃষ্ণ প্রেমে, ছিলেম সুখে
সেই মধুর বৃন্দাবনে।
মধুর সে সব লীলে[১], কৃষ্ণ গেছেন ভুলে,
আনন্দে আছেন এখানে ॥

১ লীলে (বা লীলা)

আমরা কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি,
ভজে ছিলাম বনমালী, তাইতে বলি।
তোমার বাক্যেতে এলেম যজ্ঞেতে
বহুদিনের পরেতে হায়।
এরি গোপীর কপাল মন্দ,
পেলেম না আর শ্রীগোবিন্দ,
হলেম এখন নিরানন্দ, গোপীগণেতে ॥

মেলতা। আর তো আমাদের সুখের কপাল হবে না,
শ্যামকে পাব না,
করিছেন দ্বারকাতে নূতন লীলে।[১]

সখী-সংবাদের এই বিচিত্র লীলা-কথন মোহনদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া রচনা করিয়াছেন। নারদকে উপলক্ষ করিয়া দারুণ বিচ্ছেদের ব্যথা-কাতর আকৃতি মোহনদাসের বর্ণনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। খেউড় গানের রচয়িতা মোহনদাসের খ্যাতি লোক-শ্রুতি মাত্র কিন্তু কবিওয়ালা মোহনদাসের যে পরিচয় তাঁহার রচনার মাধ্যমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সামগ্রিকভাবে কবিগানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মধুসূদন সিংহ

"চব্বিশ পরগণার বারাসাত মহকুমার অধীন দত্তপুকুর গ্রামে ১২২০ সালের মধ্যে কায়স্থ কুলে মধু জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম মহেশপুরের নিকটবর্তী।"[২] মহেশপুর কবিওয়ালা মহেশ কাণার জন্মস্থান।

মধুসূদন খেউড় গানে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহেশ কাণার মত তাঁহার রচিত খেউড় গান 'আত্যন্তিক' দোষে দুষ্ট ছিল না। ইনি ১২৭০ সালে লোকান্তরিত হন।

মধুসূদনের রচিত একটি মাত্র গীত সংগৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্গীতের মধ্যে অশ্লীল ভাব বা বাক্-বিন্যাস করিবার অবাধ অবসর থাকা সত্ত্বেও কবি যে রস-রুচির পরিচয়

১ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে
২ সাহিত্য সংহিতা। ১৩১৪ সাল।

দিয়াছেন তাহা সেকাল-রচিত কবিগান বা খেউড় গানে সত্যই দুর্লভ। সমুদ্র দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণ রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ভোলা মহেশ্বর সেই মূর্তি দর্শনে কাম-বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাহারই বর্ণনা কবির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

কি আশ্চর্য বিবরণ, অচেতন হ'লেন ত্রিলোচন,
অপরূপ রূপ যেরূপে শ্যাম হরে হরের মন।
ত্যজি বংশী হলে মনোমোহিনী ;
ছেড়ে বাঁকা ধড়া, বাঁকা মোহন চূড়া,
হ'লে অনুপমা রূপে রমণী ;
কৃষ্ণ কামিনী কিরূপে, বংশী কোথা রেখে,
(যে বংশী ব্রজাঙ্গনায় মজালে)
বাঁকা আঁখি শ্যাম কোথা লুকালে ;
(ওহে শ্যাম শ্যাম হে,)
কালা বরণ হয় কি স্মরণ ?
তোমায় চিনিতে নারি, ওহে বংশীধারী,
আমরা বিনয় করি ধরি শ্রীচরণে ॥ ইত্যাদি।

হোসেন শেখ

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মুসলমান লেখকগণের অবদান বড় কম নয়। কবিগানে তাঁহাদেরও মন মজিয়াছিল। যাহার ফলে, কবিওয়ালা হোসেন শেখের নাম আজিও লুপ্ত হয় নাই। কবিগানের জগত বড় বিচিত্র। এখানে কোন্ শ্রেণীর মানুষ না একত্র হইয়া ভিড় করিয়াছে? মুসলমান তো দূরের কথা, ফিরিঙ্গি পর্যন্ত এখানে কবিওয়ালা হইয়াছেন। শুধু রসপোভোগ নয়, রস বিতরণের অধিকারী পর্যন্ত হইয়াছেন।

কবিওয়ালা হোসেন শেখের জন্মস্থান বা জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় নাই, এমন কি তাঁহার রচনার পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি হোসেন শেখের দলে গীত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা তাঁহার রচিত কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।[১]

১ সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১৪ সাল।

ভুবন মোহন না দেখি এমন, ঐ কই ;
রূপ কি অপরূপ; রসকূপ আমারি সই।
কুলে শীলে কালি দিয়াছি আমি,
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে।
ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে,
ওই বটে সে কালিয়ে ॥
চরণে চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে।
যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে ॥

কবিওয়ালা ভোলা ময়রার সহিত হোসেন শেখের একবার মুর্শিদাবাদের কোন আসরে বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল। ভোলা ময়রা হোসেন সেখকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

জর্, জরু, জমীন, ক্যায়্সে খতরে আনে।
খুণ, মুণ. সুণ, ক্যায়্সে পতরে জানে ॥
হিজ্রী, পিজ্রী কেন হজের সঙ্গে নাই।
জো-ওয়ালা, মো-ওয়ালা, কালো কেন ভাই ॥
যবনে ব্রাহ্মণে বল, কোন্ ভেদটা দেখি।
ভোলার টাকা সদাই খাঁটি, এবার হোসেনের মেকি ॥

ভোলা ময়রার কবিগানে যেরূপ আশ্চর্যভাবে হিন্দি, উর্দু, পার্শী এবং আরবী ভাষার সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার তুলনা বিরল। যাহা হউক ভোলা ময়রার প্রশ্নের উত্তরে হোসেন শেখ কি বলিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। 'হোসেন কিছুকাল কবি গাওয়ার পর স্বীয় দলকে তর্জার দলে পরিণত করেন। তর্জা ও জারি গানেও কবির দলের ন্যায় দুই বিভিন্ন দলে লড়াই হইয়া থাকে! ধরিতে গেলে হোসেনই তর্জা দলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।'[২]

২ সাহিত্য-সংহিতা। ১৩১৪সাল।

সর্বানন্দ পারিয়াল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে কয়জন কবিওয়ালা তৎকালীন জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইলেন—সর্বানন্দ। হুগলী-জেলার অন্তর্গত রাজহাটী-সেনহাট গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ঐ অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যাবল্লভ পারিয়াল এবং মুচিরাম পারিয়াল ছিলেন সর্বানন্দের পূর্বপুরুষ। ব্রাহ্মণ সর্বানন্দের কবির দলের অন্যতম বিখ্যাত মহিলা-কবি ছিলেন মোহিনী বা মনমোহিনী দাসী।

মোহিনী দাসী

অনাথ কৃষ্ণ দেব মোহিনী দাসী সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন,—'কবিওয়ালা শ্রেণীতে মোহিনী দাসী বলিয়া আর এক স্ত্রী-নাম দৃষ্ট হয়।'[১] মোহিনী দাসীর পূর্ববর্তী হিসাবে যজ্ঞেশ্বরীর খ্যাতি ছিল সমধিক। মোহিনীর কবিখ্যাতিও বড় কম ছিল না। তৎকালীন জনসমাজে ইনি মন-মোহিনী নামেই পরিচিত ছিলেন। সর্বানন্দ পারিয়ালের সার্থক শিষ্যা—মোহিনী। ইঁহার বাসভূমি ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাঁটাল মহকুমার খাস্তাপুর-মনোহরপুর গ্রামে। ইঁহার রচিত সঙ্গীতের পরিচয় এখনও ঐ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট পাওয়া যায়। ঐ স্থান হইতে কয়েকটি সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু সেগুলির প্রাচীনরূপ রক্ষিত হয় নাই বলিয়া, কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া সেই সঙ্গীতসমূহ বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হইল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইনি জীবিত ছিলেন তাহা জানা যায়।

ঈশান সামন্ত ও শশিমুখী

মোহিনী দাসীর সমকালিক ছিলেন কবিওয়ালা ঈশান সামন্ত ও তাঁহার দলের মহিলা-কবি শশিমুখী। হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কাকনান গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। সেকালে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট মোহিনীর সহিত ঈশান সামন্তের ও শশিমুখীর কবির লড়াই ছিল উল্লেখযোগ্য অন্যতম আনন্দ-সংবাদ।

১ বঙ্গের কবিতা। পৃঃ ৩২৩

ক'বেল কামিনী

যশোর-খুল্না কবিওয়ালার দেশ। তারক কাঁড়াল, পাঁচু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে পাঠা, হারণ ঠাকুর, হরমোহন, মথুর সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের খ্যাতির কথা অবিদিত নাই। যশোর-খুল্নার কবিওয়ালা সমাজে ক'বেল কামিনীর নাম বিশেষ পরিচিত। এই নিরক্ষরা পোদ-রমণী খুল্নার নিকটবর্তী জাপ্সা গ্রামে বাস করিতেন। ইনি ইঁহার ভগিনীপুত্র তারাচাঁদের দলে এবং অন্যান্য দলের জন্য গীত রচনা করিয়া দিতেন। ক'বেল (কবিওয়ালা) কামিনীর রচিত তিনটিমাত্র সঙ্গীত পাওয়া যায়।

কালো বেটি কত খাঁটি সে যে ফুলের মাথার পরে,
চরণ দু'টি কত কোটি চাঁদ হৃদয়ে আলো করে॥
কত পলক; কত রশ্মি কালী মায়ের পায়,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়।[১]

এই সঙ্গীতটির একটি রূপভেদ লক্ষ্য করা গিয়াছে; তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

আস্মানে উঠেছে রে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে।
তাই দেখ্তে সব পাঁঝের কালে, লোক এলো ছুটে॥
কত পলক, কত রশ্মি শ্যামা মায়ের পায়।
ধানের ক্ষেতে ঢেউ দেখিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়॥[২]

ফুটল ফুল কালাবেটির পায় পর,
তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ ফুলের তলাস করে কে বল
সে যে রক্তজবা রাঙ্গাকলি এক বোঁটায় দুই ফুল ধরে,
কত পথ পাথালি রাজা প্রজা শাঁই ফকিরে খোঁজে তারে।
ফুলের তলাস বল কে করে।

১ যশোর-খুলনার ইতিহাস। ২য় খণ্ড। সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃঃ ৮৬৭-৮৬৮

২ বঙ্গবাণী—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ১৩৫

আছে কালাবেটি বড় খাঁটি সে ফুলের মাথার পরে।
তার চরণ দুটি কত কোটি চাঁদ স্বয়ে আলো ধরে।
সেই ফুল ফেলে ধল্লে পরে যাবি রে পরপারে॥

॥ ৩ ॥

বলরে কালী মনের কালি মুছ্‌বি যদি সংসারে।
তার মরা বাসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে।
সে কল্লা বেটি দাঁড়ায় খাঁটি দিয়ে পা'টি বাবার ঘাড়ে।
করে না লড়ন চড়ন কিরণ ঘুরণ জাদু ক'রে রাখে তারে।
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তাজা ডাক রে মন তাই তারে॥[৩]

মহিলা-কবি কামিনীর রচনার মধ্যে শ্যামা ভক্তির স্পর্শ বড় মোহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।[৪]

উনবিংশ শতাব্দীর কবিগানের ক্ষেত্রে মহিলা কবিগণের অবদান বড় অল্প নয়। যজ্ঞেশ্বরী, মোহিনী দাসী, শশিমুখী, কামিনী, মাধবীলতা, সহচরী, অক্ষয়া বায়তিনী প্রভৃতি অনেক রমণীরই কবির দল ছিল। তাহারা অনেকেই গীত-রচয়িতা ছিলেন। অল্পশিক্ষিতা এমন কি নিরক্ষরা রমণীগণের এই অসাধারণ গুণপনার সংবাদ—যেমন বিস্ময়কর তেমনি আনন্দবহ।

৩ কামিনীর আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে।

পরগণে হোগলার মধ্যে গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গারস্থালী করে ক'বেল মা॥

(নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা—মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য)
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩১১ সাল।

৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩১২ সাল। পৃঃ ৭০

অন্যান্য গীতকার প্রসঙ্গ

রামনিধি গুপ্ত

॥ ১ ॥

মদন-মঞ্জরীর বিলাস-উল্লাসময় কেলি-কৌতুক-কথন হইতে বাংলা কাব্যকে যিনি প্রেমের রাজ্যে অভিষেক করিলেন তিনিই রাধনিধি গুপ্ত। রামনিধির পুরুষানুক্রমিক উপাধি ছিল 'রায়'।[১] ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) ত্রিবেণীর নিকটবর্তী চাঁপ্তা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণের পূর্ব-বাস ছিল কলিকাতার কুমারটুলিতে। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে তিনি চাঁপ্তায় গিয়াছিলেন। সেইখানেই রামনিধির বাল্যশিক্ষা হয় এবং পরে কুমারটুলিতে ফিরিয়া আসিলে 'তথায় একজন ইংরেজ পাদরীর হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পিত' হয়।[২] ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চা স্বাভাবিকভাবেই চালিয়েছিল। অল্প ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিলেই সেকালে চাকুরীর অভাব হইত না। রামনিধির জীবনেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 'রামনিধি কিছুদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য করেন।[৩] অতঃপর হরিনারায়ণের স্বগ্রামবাসী রামতনু পালিতের যত্ন ও চেষ্টায় ছাপরার কালেক্টরী আফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' যে সময়ে রামনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ছাপরায় যান সেই সময়টি বাংলা দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে দুঃসময়ের কাল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের স্মৃতি তখন দুর্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ শাসন তখন জনসাধারণেরই কাম্যবস্তু। রামনিধির

---

১ বঙ্গীয় কবি (অষ্টম খণ্ড অর্থাৎ বৈদ্যজাতীয় কবিদিগের কাহিনী ও রচনা পরিচয়)—কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (প্রকাশকাল ১৩১৩ সাল)

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ইঁহার পরিচয় 'রামনিধি রায়' নামেই দিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। পৃঃ ৫৩৪ : ৫ম সংস্করণ।

২ "সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। (নারায়ণ। ১৩২৩ সাল। পৃঃ ৭৩৯)

বঙ্গীয় কবি। পৃঃ ৪১৮

বাঙ্গালীর গান। পৃঃ ৬৫

৩ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য দ্রষ্টব্য। ৫ম সংস্করণ। পৃঃ ৫৩৪ ও বঙ্গীয় কবি পৃঃ ৪১৮।

ব্যক্তিজীবনেও তখন দুঃখের অকাল-বর্ষা নামিয়াছে। রামনিধি ১১৬৮ সালে (১৭৬১ খৃঃ) 'সুখচর' গ্রামে বিবাহ করেন। তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর। 'এই স্ত্রীর গর্ভে ১১৭৫ সালে (১৭৬৮ খৃঃ) তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু বৎসর তিন বয়সেই সে পুত্রের মৃত্যু হয় এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার প্রথম স্ত্রী পরলোক গমন করেন। নিধুবাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহ ১১৭৮ সালে (১৭৭১ খৃঃ) কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় সংঘটিত হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরেই তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখন নিধুবাবুর বয়ঃক্রম তেত্রিশ বৎসর মাত্র।'[৪] ইহার পরেই রামনিধি ছাপরায় চলিয়া গেলেন। বরদা প্রসাদ দে মহাশয় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

'Ramnidhi went to Chapra at the age of thirty-five on the assurance that he would be appointed to the post of second clerk in the Collectorate which was then vacant.'[৫]

রামনিধির বয়স এ সময় ৩৫ বৎসর হইলে ইহা ইংরেজী ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে। ইহাই বাংলা দেশে ইংরাজ-রাজত্ব কায়েম হওয়ার কাল এবং জমিদারী বন্দোবস্তের প্রথা এই সময়ই চালু হইল।

'A settlement for five years (1772-7777) was concluded with the highest bidders, whether they were the previous Zeminders or not.'[৬]

এই বন্দো(বস্ত) ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে বাৎসরিক বন্দোবস্তে পরিবর্তিত হয়। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে Board of Revenue স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রত্যেক জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজ কালেক্টরের হাতে আসে। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল।

রামনিধির ছাপরা গমন সম্পর্কে গুপ্তকবি যে তথ্য দিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

'অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময় নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণ ছাপরায় কর্ম করিতে গমন করিলেন'।[৭]

---

৪ বাঙ্গালীর গান। পৃঃ ৬৬

৫ Journal of the Bengal Academy of Literature Vol. 1. No. 6. P. 4.

৬ Bengal Ms. Records Vol. I (London, 1894)—Hunter. P. 18.

ইংরেজ পাদ্রীর নিকট যাঁহার বাল্য-শিক্ষা, পরবর্তী কর্ম-জীবনে যিনি ইংরেজ-অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি ইংরেজ-বিশ্বস্ত দেওয়ান রামতনু পালিতের অনুগ্রহ-ভাজন হইবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? ছাপরাতে গিয়াও তিনি যে সাহেবদিগের প্রিয়পাত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা গুপ্তকবির ভাষাতেই জানা যায়:

'......তৎকালে জনাঞি গ্রামবাসী সুবিখ্যাত ৺জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাপরার কালেক্টর কেং মোণ্টগুমরি সাহেবের কেরাণীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রামতনু পালিত তথায় কিছুদিন দেওয়ানী কর্ম করতঃ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া একেকালেই অকর্মণ্য হইলেন, তখন পালিতবাবুর সহিত রামনিধিবাবু ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি এমত আর কেহই ছিলেন না, যিনি ঐ দেওয়ানীপদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র হয়েন। এই উপস্থিত ঘটনায় জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত দেওয়ানী কর্মের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, কিন্তু মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন যে নিধুবাবু এখানে বর্তমান থাকাতে এ কর্মটি তিনি কোন মতেই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এ কারণ শঠতা ও ছলনাপূর্বক একদিবস বাবুকে কহিলেন, 'আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন?' ইহাতে বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর কহিলেন, 'সে কি মহাশয়! আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে আসিয়াছি, এ কেমন কথা হইল? আমি গো-ব্রাহ্মণের সেবক ও রক্ষক, অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমার প্রতি এমত অন্যায় উক্তি কেন করেন?' তচ্ছ্রবণে মুখোপাধ্যায় কহিলেন, 'দেওয়ানী কর্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন, কিন্তু তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম তোমাকেই দিবেন, আমাকে কখনই দিবেন না।' ব্রাহ্মণের প্রতি গুপ্তবাবুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এজন্য কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ঐ পদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিষিক্ত করণার্থ বিবিধপ্রকার যত্ন ও পোষকতাই করিলেন এবং তিনি পদস্থ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য হয়েন তদ্বিষয়ে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়া বিশেষ সহায়তা করতঃ তাঁহার কেরাণীগিরি কর্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল তৎকর্ম নির্বাহ করিলেন।'

ছাপরা-বাসকালীন রামনিধির জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। জনৈক সুপণ্ডিত যবন গায়কের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে থাকেন। সঙ্গীত-শিক্ষকের আচরণ মনঃপূত না হওয়ায় তিনি নিজেই রাগরাগিণী, তাল, মান, অনুযায়ী সঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণাচারী সাধক ভিখনরাম-এর নিকট দীক্ষা

গ্রহণ। মনে হয়, বিপত্নীক নিধুবাবুর মন তখন অশান্তির দাবদাহে ক্ষত-বিক্ষত। তাই, তিনি অধ্যাত্মরাজ্যের শান্তিময় পথের পথিক হইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভিখন্‌রাম তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ছাপরার অন্যতম ঘটনাটি তাঁহার পরবর্তীজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। 'একদিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে 'তোমরা চাকরী করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময় যদি জমিদার তোমারদিগ্যে যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপন আপন বাটিতে প্রেরণ কর' ইত্যাদি" এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম না করেন, তবে প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করতঃ গৃহে গমন করুন; বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপে কার্য করিলেন।'[৭]

রামনিধির 'প্রাপ্য দশ সহস্র মুদ্রা' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সেকালে খাজনা আদায় সংক্রান্ত যে কোন কার্যে নিযুক্ত হইতে হইলে জামিনের টাকা জমা রাখিতে হইত। এই সিদ্ধান্ত যে বহুপূর্ব হইতেই চলিত ছিল তাহা জানা যায় রামমোহন রায়ের কর্ম-জীবনের ইতিহাস হইতে। বিনা জামিনে কোন collectorateএ লোক নিযুক্ত হইত না। রামনিধির পিতার বা রামনিধির নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল এমন তথ্য জানা যায় নাই। এ ক্ষেত্রে কর্মত্যাগের সময় ন্যায্যপ্রাপ্য টাকা স্বাভাবিক ভাবেই জগন্মোহন প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। অসদুপার্জনের প্রবৃত্তি রামনিধির ছিল না। অর্থের প্রতি আকর্ষণ থাকিলে দেওয়ানীর কাজ জগন্মোহন পাইতেন না, ইহা সুনিশ্চিত। অসদুপার্জিত অর্থ উপরিতন কর্মচারীর নিকট জমা রাখিবার কল্পনাও হাস্যকর।

যাহা হউক, ইহার পর রামনিধি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং অল্পকাল পরেই 'হাবড়ার নিকটস্থ বজিরহাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয় কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন।' বরদাপ্রসাদ দে, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের মতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১২০১ সালে অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে। রামনিধির জীবনের সকল ঘটনাগুলিকে একত্র করিলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

৭ সংবাদ প্রভাকর। ১ শ্রাবণ ১২৬১ সাল।

জন্ম	১১৪৮ সাল	১৭৪১ খৃঃ
ইংরেজ পাদ্রীর নিকট শিক্ষালাভ	১১৫৪	১৭৪৭
স্থখচরে বিবাহ	১১৬৮	১৭৬১
প্রথম সন্তান	১১৭৫	১৭৬৮
প্রথম সন্তান এবং প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু	১১৭৮	১৭৭১
দ্বিতীয় বিবাহ	১১৭৮	১৭৭১
দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু	১১৮১	১৭৭৪
ছাপরা যাত্রা	১১৮৩	১৭৭৭
কলিকাতায় প্রত্যাগমন	১২০১	১৭৯৪
তৃতীয় বিবাহ	১২০১	১৭৯৪
আখড়া স্থাপন	১২১১	১৮০৪
গীতরত্নের প্রকাশ	১২৪৪	১৮৩৭
মৃত্যু	১২৪৫	১৮৩৮

বরদাপ্রসাদের মতানুযায়ী ছাপরায় অবস্থানকাল ১৮ বৎসর ধরা হইয়াছে। ছাপরার কাজে ইস্তফা দিলেও রামনিধি সারা জীবন সরকার হইতে পেন্সন পাইতেন।

রামনিধির জীবনকথা-প্রসঙ্গে মুতাখরীণে উল্লিখিত জনৈক রামনিধি সম্পর্কে অবহিত থাকা ভাল। ১৭৬০ হইতে ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা মীরকাসিমের সহিত সংঘর্ষে বিব্রত থাকে। পাটনার হত্যাকাণ্ড এই সংঘর্ষের চূড়ান্তরূপ। এই ঘটনার কিছু পূর্বে পাটনার কুঠিয়াল এলিস সাহেব কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া পাটনা শহর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে ভান্সিটার্ট যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :

The particulars of this disaster with the other operations of the war are sufficiently known : let it here suffice to observe, that the city was surprised and taken without resistance by our troops, in the night of the 24th June ; and by their disorderly behaviour afterwards, whilst they were dispersed, and intent only on plunder, was retaken by a handful of the Nabab's people the next day at noon ; after which loss gentleman of

the factory, with the scattered remains of the army retired across the river and were all destroyed or taken prisoner.[৮]

এলিস তাঁহার অনুচরগণসহ গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছেন ২৯-এ জুন। এই ঘটনার বর্ণনা গোলাম হোসেনের ভাষায় নিম্নরূপ :

But Mr. Ellis, who had now lost all courage not choosing to stand his ground even there, resolved to fly further as far as Chapra by water and from thence to cross the Serdjis which is the boundary of the two Soobhas or provinces, intending to take shelter in Shujah-ud-doula's dominions; but even that could not be effected. One Ram-nedy Foujdar of the district of Saran, an ungrateful Bengaly, who owed much to the English had the confidence to attack the fugitives, whilst Sumro, with some regiments of Talingas crosssed over the Bacsar to support him.[৯]

এই ungrateful···Ramnedy Foujder যে কবি রামনিধি গুপ্ত নহেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, ইংরেজ পাদ্রীর নিকট শিক্ষিত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী, দেওয়ান রামতনু পালিতের স্নেহভাজন এবং ছাপরা কালেক্টরীর অন্যতম সুখ্যাত কর্মী, জীবনের অবধি পেনশনভোগী রামনিধির জীবনধারায় ইংরেজ-বিদ্রোহিতার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। রামনিধির ছাপরা যাত্রার কাল হিসাবে আমি পূর্বেই ১৭৭৬ খৃস্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছি; মুতাখ্‌খরীণের সমসাময়িক কবি রামনিধি তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী মাত্র।

পরিশেষে, রামনিধির মৃত্যুকাল সম্পর্কে একটি তথ্য নিবেদন করিয়া রামনিধির জীবন-কথা প্রসঙ্গ শেষ করিব। এ সম্পর্কে গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন :

'রামনিধিবাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবম্ভূত সুখ সম্ভোগ করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র দিবসে পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবী নদী তীরে

[৮] A Narrative of the Transactions in Bengal. Vol. III (1760) Vansittart. P. 329-330.

[৯] Seir-ul-Mutaqherin, Vol. II (1902). P. 474.

জ্ঞানপূর্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করতঃ যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন।[১০]

একমাত্র গুপ্ত কবি ব্যতীত অন্যান্য কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্য-ইতিহাস-রচনাকারগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে নিধুবাবু ৮৭ বৎসর বয়সে ১২৩৪ সালের ২১ চৈত্র লোকান্তরিত হন।[১১] ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতমত বড় বিচিত্র রকমের। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে রামনিধির জীবনকাল হিসাবে নির্দেশ করিয়াছেন ১৭৪১ হইতে ১৮৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে কবির জীবনকাল হিসাবে নির্দেশিত হইয়াছে ১৭৩৮ হইতে ১৮২৫ খৃস্টাব্দ। নিধুবাবুর মৃত্যুকাল নির্ণয় করিবার পক্ষে ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের The Friend of India-পত্রের Weekly Epitome of News বিভাগে ৬ই এপ্রিল শনিবার তারিখের প্রকাশিত সংবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

A native lyric poet, of the name of Nidheeram Goopta, usually called Nidhoo Baboo, who was at the same time one of the oldest inhabitants in Bengal is just dead, at the age of eighty. His songs were very celebrated among his own countrymen, and were collected and printed about two years ago.

রামনিধির মৃত্যু-তারিখ নির্ণয়ের পক্ষে সংবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত এই সংবাদ রামনিধির মৃত্যুকাল হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অভিমতকেই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এই সংবাদে দুইটি ভুল রহিয়াছে। এক—কবির নাম রামনিধি, নিধিরাম নহে; দুই,—তিনি ৯৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন, ৮০ বৎসরে নয়।

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু সম্পর্কিত তারিখ-নির্ণয় প্রসঙ্গে নানারূপ মতবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র শ্রদ্ধেয় কবি-সমালোচক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয়

---

১০ সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ। ১২৬১ সাল।

১১ কবি চরিত—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
বাঙ্গালীর গান।
বঙ্গভাষার লেখক। পৃঃ ৩২০
বঙ্গীয় কবি—কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। পৃঃ ৪১৯

এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন।[১২] তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া রামনিধির মৃত্যুকাল হিসাবে ১৮৩৯ খৃস্টাব্দ স্থিরীকৃত হইল।

২

টপ্পাকার রামনিধি গুপ্ত—'বাঙ্গালার শোরি মিঞা' এবং সর্বোপরি তৎকালীন বাঙালী জনসমাজের নিকট তিনি অভিনন্দিত হইয়াছিলেন 'নিধুবাবু' নামে।

দুইটি নামই বিশেষ অর্থবহ।

'কি সধন কি অধন সর্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে "বাবু" শব্দে সম্বোধন করিতেন।[১৩] বাবুর বাটি, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি বাংলা গীতে রাগ সুরের ব্যাপারে ইনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে শোরি মিঞার অপেক্ষা ইঁহাকে কোন অংশেই ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইঁহার প্রণীত টপ্পাই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে 'শোরির টপ্পা" তেমনি বঙ্গদেশে "নিধুর টপ্পা"।[১৪]

ছাপরায় কালেক্টরীতে কাজ করিবার সময়েই যবন সঙ্গীত-শিক্ষককে বিদায় করিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ রামনিধি গুপ্ত নিজেই রাগরাগিণী, তাল, লয়, মান সমন্বিত হিন্দি টপ্পার অনুরূপ বাংলা ভাষায় টপ্পা (সংক্ষিপ্তাকার) গান রচনা আরম্ভ করিলেন রামনিধির জীবিতাবস্থায় 'তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত সংগৃহীত' রামনিধির নিজস্ব সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় রাগরাগিণী সম্পর্কে কবির অন্তরেচ্ছা যে ভাবে প্রকাশিত করিয়াছে, তাহা অনুধাবনযোগ্য—

'..... বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না এবং এই গীত সকলে আলাপচারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দুস্থানী খ্যাল্ ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়ে দেওয়া এমত নহে, অথচ গান করণ মাত্র রাগ রাগিণীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীত বিদ্যার সমুদয় রাগ ও রাগিণী অতি বিস্তর, কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে।

---

১২ কবি রামনিধি গুপ্ত—শ্রীসজনীকান্ত দাস (বার্ষিক কলরব, ১২৫২ সাল)।

১৩ 'Baboo, an appellation, given to a rich native or to any one whom we wi[sh] to show respect' (Glossary in Alexander Fraser Tyler's Considerations on t[he] present political state of India. 1815.)

১৪ সংবাদ প্রভাকর। ১ শ্রাবণ, ১২৬১ সাল।

এইক্ষণে যাহা আছে তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে, যাহা হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীত শাস্ত্রাম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানাপ্রকার রাগরাগিণীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিণীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম আর নির্ঘণ্টন পত্রিকাতে ঐ রাগ ও রাগিণীর সময় নিরূপণ করিয়া ভৈরবাদি রাগ সকল রীতিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম। অনুমান করি যে ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শাইতে পারিবেক।'

হিন্দি টপ্পার সহিত রামনিধির টপ্পার পার্থক্য-বাহিত বৈশিষ্ট্য রামনিধি নিজেই দেখাইয়াছেন।

রামনিধি জীবিতাবস্থায় একটি মাত্র গ্রন্থই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহার ভূমিকায় গ্রন্থ প্রকাশের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।

'পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপে ব্যক্ত থাকাতে কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্বসাধারণের গুণগ্রাহীগণের অবগতির জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম সংকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম।' [১৫]

১২৪৫ সালে রামনিধি লোকান্তরিত হন। জীবিতাবস্থায় 'গীত রত্ন' ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক নিজের বলিয়া কবি অনুমোদন করেন নাই, তবে এরূপ পুস্তক যে বিনানুমতিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমার দৃঢ় ধারণা, এইরূপ একটি পুস্তক—'রসিক মনোরঞ্জন'। এই বইটি সম্পর্কে শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'নিধুবাবুর জীবৎকালেই তাঁহার গীত সঙ্কলন বাহির হইয়াছিল। সম্ভবত বইটির নাম ছিল 'রসিক মনোরঞ্জন'।' [১৬]

'রসিক মনোরঞ্জন' পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি তিনি দিয়াছেন তাহার

১৫ গীতরত্নের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। গীতরত্নের ১ম (১২৪৪ সাল), ২য় এবং ৩য় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড। ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮। পৃঃ ৯৭৬।

সহিত 'গীত-রত্নে'র ২৩ পৃষ্ঠার (১ম, ২য়, ৩য় সংস্করণের) কোন সাদৃশ্য নাই। রামনিধি বর্ণিত তাঁহার গীতের অশুদ্ধ রূপ সমন্বিত অবস্থার অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে 'রসিক মনোরঞ্জন'কে গ্রহণ করিলে অযৌক্তিক হইবে না। রামনিধির জীবিত অবস্থার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পুস্তক—'গীতরত্ন' (১২৪৪ সাল)। এ সম্পর্কে আমি আমার অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুত সুকুমার সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি বলেন যে তাঁহার এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত হইল—'গীত-রত্ন' (১২৪৪ সাল)—রামনিধির জীবিতাবস্থার একমাত্র গ্রহণযোগ্য রচনা-সঙ্কলন।

যাহা হউক, নিধুবাবুর টপ্পার আদি এবং প্রামাণিক রূপ হিসাবে 'গীতরত্ন (১২৪৪ সালের সংস্করণ)'-র মূল্য অনস্বীকার্য। অন্যান্য সঙ্গীত-সঙ্কলন গ্রন্থে নিধুবাবুর রচিত বলিয়া যে সকল সঙ্গীত কথিত হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য কি না এ আলোচনার প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের লিখিত 'রামনিধি গুপ্ত' নামাঙ্কিত দিক্-নির্দেশক প্রবন্ধটির প্রতি অনুরাগী পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।[১৭]

॥ ৩ ॥

আখ্‌ড়াই সঙ্গীতের ইতিকথন-বৃত্তান্তে রামনিধির ভূমিকা গৌরববৃদ্ধির সহায়ক।[১৮] পক্ষীর দলের সহিত রামনিধির সম্পর্কও ছিল বিচিত্র সুন্দর রকমের।[১৯] কবিগানের সহিত তাঁহার অন্তরের সংযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন, তথাপি তিনি কবিওয়ালা শ্রেণীর নহেন। প্রণয় সঙ্গীতের যে বিচিত্র কাব্য-জগতের সন্ধান তিনি দিয়াছেন তাহা প্রাচীন সাহিত্যের বহির্মুখী ভাবধারা হইতে আসে নাই। কবির আত্মজগৎই তাঁহার কাব্যজগৎ। প্রতিভার সহিত প্রাণের অন্তর্মুখী চেতনার এই যে কাব্য-প্রকাশ, ইহার তুলনা সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোধ হয় দ্বিতীয় রহিত দৃষ্টান্ত। সেই কারণেই রামনিধি গুপ্ত কাব্যের আকাশে কবিপুঞ্জের মধ্যে অস্তিত্ব না হারাইয়া একক শক্তিতে ধ্রুব-চেতনায় পরবর্তী কবি-সমাজকে আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অন্তর্মুখী সাহিত্য-চেতনার অন্যতম প্রধান ধারক এবং বাহক রামনিধির গুরুত্ব তাই সমধিক।

---

১৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৪। পুনর্মুদ্রণ 'নানা নিবন্ধ' গ্রন্থে। (১৩৭০ সাল)।

১৮ কবিগানের ইতিহাস-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

১৯ 'রূপচাঁদ পক্ষী' অংশ দ্রষ্টব্য।

রূপচাঁদ পক্ষী ও পক্ষীদলের কথা

রূপচাঁদ পক্ষীর সংক্ষিপ্ত নাম R. C. D. তাঁহাদের কৌলিক উপাধি 'দাস' কিন্তু রূপচাঁদ নিজেকে পক্ষী উপাধিতেই পরিচিত করাইয়াছিলেন। কবিওয়ালার দলের মতই এই পক্ষীদলেরও কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। উনিশ শতকের 'বাবু সমাজ' পক্ষীর দলের কেন্দ্রস্থান। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পক্ষীর দলের এক চমকপ্রদ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১] গুপ্ত কবির ভাষায় তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শোভা বাজারস্থ বটতলা নিবাসী ৺বাবু রামচন্দ্র মিত্র, যিনি এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদি ছিলেন এবং যাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের একটি প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) প্রতিদিবস রজনীতে তথায় গিয়া সঙ্গীত বিষয়ের আমোদ করিতেন। এই স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত শৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।

বাবু রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদাই উল্লাস করিতেন।[২] পক্ষীর দলের পক্ষী সকলেই ভদ্রসন্তান ও বাবু এবং শৌখীন নামধারী সুখী ছিলেন। পাখীর দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত। পক্ষীগণ গাঁজার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন। যথা পক্ষীর বুলি—

ভীষণ, কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্।
চুকু মুকু চুকু, চুক চুকুণ।
কুকু রামশালিকে, কু, কু, গঙ্গা বিসং।

১ সংবাদ প্রভাকর। ১২৬১ সাল।

২ 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থের লেখক অনাথকৃষ্ণ দেব যে উক্তি দিয়াছেন তাহা ভুল। সংবাদ প্রভাকরে 'শ্রীনারায়ণ মিত্র' নাই এবং তিনি নিমতলা নিবাসী কি-না তাহা গুপ্ত কবি উল্লেখ করেন নাই। অনাথকৃষ্ণ দেব ইঁহাকে নিমতলা নিবাসী বলিয়াছেন। উপরন্তু লিখিয়াছেন,—কেহ কেহ বলেন— 'বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র ঠাকুর পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা'। এরূপ মন্তব্যের কোন কারণ দেখান নাই এবং এ পর্যন্ত ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ জোটে নাই।

ছোট বিলের পাখী মোরা, বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি, পোষ মেনেছে ॥
কু কু, গাং-শালিকে, কু, গঙ্গা বিসং : ইত্যাদি।

এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষীর আকাশ-ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষীরাই বুঝিতে পারিতেন, অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি? এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষীদলে ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া উপরি উপরি ১০০ শত ছিলিম গাঁজা খাইলেন, কিন্তু এইমাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে ছিলিমটি টানিবার সময়ে একবার একটুখানি খুক্-খুক্ করিয়া কাসিয়াছিলেন, এই লঘু দোষে পক্ষীরাজ তাঁহার নাম "ছাতারে পাখী" রাখিলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদনবদনে বিস্তর বিনয় করিয়া কহিলেন, 'ধর্মাবতার! এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কি আমাকে এত অপমান করা কর্তব্য হয়?' এতদ্বাক্যে খগেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, 'ওরে মূর্খ! জানিস্ তো, এখন আমি আর কি করিতে পারি? হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। ভাল তোর স্তবে আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু 'ছাতারে' নাম একেবারে রহিত করিতে পারিব না, অতএব তোর নাম 'স্বর্ণ ছাতারে' রাখিলাম।

পাখীর দলের আর আর বিস্তর রহস্যজনক ইতিহাস আছে।···

নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত ৺রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় সেই দলের কর্তা হইয়া সকল ব্যয় নির্বাহ করিতেন। নিধুবাবু রাজার উপর রাজা—মহারাজা ছিলেন, এক দিবস প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা ৺"গঙ্গানারায়ণ নস্কর" পক্ষীর দল দেখিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের "আটচালা" নামক বাসার দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?' নস্কর কহিলেন, 'আমার নাম গঙ্গানারায়ণ নস্কর, আমি তোমাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।' পক্ষী বলিল, 'আচ্ছা এইখানে বৈস, আমি সংবাদ করি, রাজার আজ্ঞা হইলে যাইতে পারিবে' —এই বলিয়া গিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! একজন নস্কর আসিয়াছে।" রাজা কহিলেন, 'সে কি? এক জনে নস্কর। সে জন্তু না মানুষ।' উত্তর। মানুষ। প্রশ্ন। হিন্দু না মুসলমান। উত্তর। হিন্দু, গলায় পৈতে আছে।" রাজা কহিলেন, 'একজনে নস্কর, সে আবার হিন্দু, সূত্রধর, এ কেমন হইল?' এতচ্ছ্রবণে একটা প্রধান পক্ষী কহিল, 'দ্বিজরাজ! আমি এখনি কয়েকটা অক্ষরের কোটা অনুসন্ধান পূর্বক নির্ণয় করিতেছি' এই বলিয়াই কুলজী পাঠ করিতে লাগিল। যথা—

কস্কর, খস্কর, গস্কর, ঘস্কর, ঙস্কর।
মহারাজা। কয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
চস্কর, ছস্কর, জস্কর, ঝস্কর, ঞস্কর।
চয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
টস্কর, ঠস্কর, ডস্কর, ঢস্কর, ণস্কর।
টয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
তস্কর, থস্কর, দস্কর, নস্কর।
মহারাজ! পাওয়া গিয়াছে।
পাওয়া গিয়াছে॥ কোথায় যাবে?
পাওয়া গিয়াছে।
তস্করের ঘরে নস্করের বাস।

গঙ্গানারায়ণ নস্কর এই বাক্য শুনিয়া অম্বলচাকা ভোম্বলদাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে অমনি উঠে ছুটে প্রস্থান করিলেন। পক্ষীর দল দৃষ্টি করা তাঁহার মাথার উপরে রহিল।

স্বর্গগত ৺মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর পক্ষীর দলের কৌতুক দেখিবার মানসে বিস্তর যত্ন করাতে পক্ষীগণ কহিল, 'আচ্ছা, আমরা যাইব, রাজা খাঁচা পাঠাইয়া দিন'। রাজা "পাল্কী" নামক খাঁচা পাঠাইয়া দিলেন, পাখিরা তাহাতে আরোহণ করত রাজভবনে উপস্থিত হইল, বিহঙ্গব্যূহের অন্তঃকরণে স্থিরতা ছিল যে অগ্রে নৃত্য গীত করিয়া পরে "আধার" লইবে। রাজা বাহাদুর তাহারদিগের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্রেই আহার প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ইহাতে সকলেই আহার করত ঘুড়ুৎ ঘুড়ুৎ শব্দ করিয়া একে একে খাঁচা অর্থাৎ পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, 'কি গো, তোমারদিগের আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য গীত দেখিতে ও শুনিতে আমার এত যত্ন, তাহাতো কিছুই হইল না।' পাখি সকল উত্তর করিল, 'আমরা আধার পাইলে আর কি থাকিতে পারি? অমনি হজম করিতে হইবে, আপনি যদি আগে আধার না দিতেন, তবে সকল প্রকার রঙ্গভঙ্গ দেখিতে পাইতেন।' এই বাক্য শুনিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন, পাখিরা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।"

পক্ষীর দলের ইতি-কথন বৃত্তান্ত বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। পক্ষীর দলের খ্যাতনামা পক্ষী

হ মনে পড়াইয়া দেয়।"[২] এমন কি নিধুবাবুর নামে শ্রীধরের টপ্পার প্রচলন ছিল এরূপ গসংবাদ জানা যায়। 'বাঙ্গালীর গান' সম্পাদক এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"অনেকগুলি কোধরের গান, নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। ৺রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) টপ্পা রূপচাঁতের রাজা। কাল বশে শ্রীধরের নাম বঙ্গের 'শিক্ষিত সাহিত্য-সমাজে' একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্তপ্রায় হউক,—কিন্তু তাঁহার ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সঙ্গীতাত্মা চিরদিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদা গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সকল গান কাহার চিরচিত তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন, এমন সুন্দর, সুকবিত্বপূর্ণ, সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকে স্থির করিয়াছিলেন,—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে !
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি,—দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে ॥"

গানটি নিধুবাবু কর্তৃক রচিত। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্বে হুগলী জেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, এ গান নিধুবাবুর নহে,—শ্রীধর কথকের।... শ্রীধর তদীয় সমগ্র গান একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।... শ্রীধরের স্বহস্তে লিখিত সেই খাতাখানিতেই ঐ 'ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে!' গানটি লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু খাতায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পার্থক্য আছে। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটি এইরূপ :

ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসি নে !
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানি নে !
বিধুমুখের মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই,—আমি দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে !

শ্রীধরের নিম্নলিখিত কয়েকটি গানও এতদিন নিধুবাবুর বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু অদ্য আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। দুই একটি গান এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :

২ বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব। পৃঃ ৩৩০

১ম গান।

ঐ যায়!—যায়! চায় ফিরে—সজল নয়নে!
ফিরাও গো! ফিরাও গো! ওরে অমিয়-বচনে!
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান!—
অস্থির হতেছে প্রাণ,—প্রতি পদার্পণে!

২য় গান।

তবে কি সুখ হ'ত!
মন যারে ভালবাসে—সে যদি ভালবাসিত!
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে!—কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইতে চন্দনে!—ইক্ষুতে ফল ফলিত!
প্রেম সাগরেরি জল, হতো যদি সুশীতল!—
বিচ্ছেদ-বাড়বানল,—তাহে যদি না থাকিত!

নিম্নলিখিত এই গানটিও অন্য একজনের নামে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। এখন শ্রীধরের বলিয়া চলিল :

সখি আমায় ধর ধর!
উরু নিতম্ব-হৃদি পয়োধর ভারে,—ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি!
ছিলাম অন্য মনে, বেণু-রব শুনে, কেন না ধাইয়ে আইলাম কাননে
উহু মরি মরি!—বাজিছে চরণে,—নব নব কুশাঙ্কুর!
ঘোর তিমিরা রজনী সজনী! কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি!
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,—কাল হইল মোর ;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে,—প্রাণ হ'তেছে অস্থির! ইত্যাদি।"

শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কথক-শিরোমণি অতুল্যচরণ ভট্টাচার্যের সাহায্যে শ্রীধরের সঙ্গীতের সংশোধিতরূপ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীধরের রচনায় কবিত্বের প্রকাশ বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি বৈষ্ণব কবিদের পথ বোধ করি সজ্ঞানেই অনুসরণ করিয়াছেন :

কি অপরূপ হেরিলাম, যমুনারি কূলে।
রয়েছে রাখালের বেশে, তবু নিরুপম বলে॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা, তবু মনোরম,
কালো অঙ্গ ধরে তবু, আলো করে ভূমণ্ডলে ॥
কিশোর বয়স, তবু, যুবতী-মোহন ;
ধূলামাখা অঙ্গ, তবু বিচিত্র ভূষণ ;
স্বভাবে রয়েছে, তবু, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে ॥
ব্রজের রাখাল, তবু অন্য দেশের নয়,
বারে বারে হেরিলে, তবু নূতন বোধ হয় ;
মদন-মোহন, তবু সহজে অবলা ভোলে ॥

বৈষ্ণব কাব্যের ফ্রেমে বাঁধা কবিগানের রস-রূপ পুরানো জগতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাবে, ভাষায় এবং প্রকাশ ভঙ্গীতে ইহার চমৎকারিত্ব অনস্বীকার্য। যমুনার কূলে নিত্যদিনে বাঁশী বাজিতেছে। সেই বাঁশরী স্বরে শ্রীরাধিকার অন্তর মথিত হইয়া করুণ আবেদন উৎসারিত হইয়াছে,—'দাসী হয়া তাঁর পায়ে নিছিব আপনা'। কবি শ্রীধরের কাব্যানুভূতিতেও সেই একই রূপের ভিন্নতর প্রকাশমাত্র ঘটিয়াছে।

কাল-ই কালি দিব কুলে।
এ মোহন-মুরলী রবে, কে আর রবে গোকুলে ॥
পরাণেরি পরিমাণ, নহে কিছু কুলমান,
মন, মানা না মানে।
মজিল গোকুলে (ওগো সখি !)
কবে কুলাবেন কালী, কালাচাঁদের অনুকূলে ॥

বিরহের বেদনাতেও সেই চিরন্তন আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে,—

সারা হলেম, সারা নিশি জাগিয়ে।
যামিনী পোহালাম, কত যাতনা ভুগিয়ে !
বহুদিনের অভিলাষে, সুখ পূরাইবার আশে,
বসে ছিলাম আশা পথে গিয়ে ;
কি দশা না হ'লো, সখি, ভালবাসা লাগিয়ে ॥

কালী মির্জা

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ পণ্ডিত বাণেশ্বর শর্মার প্রখ্যাত শিষ্য কালিদাস হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় ১৭৫০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায়[১] কিংবা চট্টোপাধ্যায়[২]।

ইনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। সঙ্গীতের প্রতি ইঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সঙ্গীত ও শাস্ত্র অধ্যয়ন-মানসে ইনি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে যান। ফার্শী ও উর্দু ভাষাতেও ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালী মির্জা নামেই ইনি জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত ছিলেন। 'ফার্শী' ভাষায় 'লায়েক' ছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া শৌখীন মহলে 'মির্জা' খেতাব পাইয়াছিলেন।[৩]

কালী মির্জা কিছুকাল বর্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। পরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়লাভ করেন। কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদ ইঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাঠাইতেন। ইনি শেষ জীবন বারাণসীতে অতিবাহিত করেন এবং সেইখানেই ১৮২০ খৃস্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

কালী মির্জার প্রণয়-গীতি বা টপ্পা নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক অপেক্ষা উন্নতমানের নয় ইহা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু ইঁহার 'মালসী' গানগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। ইঁহার রচিত মালসী গানগুলি সংহত, ভাব-বৈচিত্র্যে পূর্ণ; ইহাতে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও কবিত্বের চিহ্ন বর্তমান। কবির অলঙ্কার প্রয়োগ-নৈপুণ্যও লক্ষণীয় বস্তু। অলঙ্কার যেন ভাবেরই সজ্জা এবং রসের ইঙ্গিত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছে। 'চঞ্চল চরণে চলে অচল নন্দিনী'—পদটিতে অচিন্ত্য-অব্যক্ত-রূপিণী জগন্মাতার শৈশব-চাপল্যের বিচিত্র-লীলার অভিব্যক্তি রসানুগ হইয়া উঠিয়াছে। 'আমি ওই ভয়ে মুদিনে আঁখি, নয়ন মুদলে পাছে তারা হারা হ'য়ে থাকি'—পদটি ভাব-বৈচিত্র্যে নবতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

১ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' অনুসারে।

২ 'বাঙ্গালীর গান' সম্পাদকের মতানুসারে।
কালী মির্জার কৌলিক উপাধি কি ছিল তাহা বলা দুরূহ। কারণ, অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত 'গীতি-লহরী' (কালী মির্জার গীত-সঙ্কলন) গ্রন্থের প্রারম্ভে ইঁহাকে 'মুখোপাধ্যায়' বলা হইলেও জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে (পৃঃ ৮) 'চট্টোপাধ্যায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৩ বঙ্গের কবিতা। পৃঃ ৩৩১

'কেও বিহরে হর-হৃদি 'পরে, হর-মন হ'রে মোহিনী'—গানটিকে অনেকেই শ্রীধরের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কালী মির্জার নামেই এই গীতটি অধিক প্রচলিত। কালী মির্জার অপর কয়েকটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

খাম্বাজ—আড়া

কে—গো বংশীবটে।
শুনি যে মধুর ধ্বনি ঐ কি কানাই বটে॥
ঘন ঘন বাজে বাঁশী, আর কিছু নাহি ভালবাসি,
হই গিয়ে বনবাসী দাসী উহারই নিকটে॥

॥ ২ ॥

আর ত যাব না আমি যমুনারি কূলে।
যে হেরেছি রূপ তার, কূলে থাকা হোল ভার,
নাম যে জানি না তার সে থাকে গোকূলে॥
যখন সে চায় ফিরে, আসিতে না পারি ফিরে,
নিয়ে নাহি দেয় ফিরে মন যে হরিয়ে নিলে।
গুরুজন ছিল সাথে, মরে ছিলাম মরমেতে,
পুরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে॥[৪]

খাম্বাজ—মধ্যমান

মন যে কেমন করে কেমনে কহিব কা'রে।
আমার যেমন মন তার কি তেমন হয় রে॥
শুনেছি লোকে যে কয়, মনে মন পরিচয়,
তবে কেন নাহি হয়, তাহার আমার তরে॥

৪ পাঠান্তর—আর ত যাব না লো সই যমুনারি কাল জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে।

রাধামোহন সেন দাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনি কলিকাতার কাঁসারীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। সংস্কৃত ব্যতীত পারস্য ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। "রাধামোহন যেমন সুগায়ক, তেমনি সুকবি, তেমনি সুরসিক ছিলেন।...এক সময়ে তাঁহার রচিত গানগুলি প্রায় সকল মজলিসেই গীত ও প্রসংশিত হইত। তাঁহার প্রণীত 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' একখানি অমূল্য সঙ্গীত-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।"[১] সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ ১২২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'রসসার-সঙ্গীত'—তাঁহার রচিত অপর একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ। ইঁহার রচিত 'অন্নপূর্ণা-মঙ্গল'-গ্রন্থে ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদামঙ্গলের যে যে অংশ তিনি ভ্রমাত্মক মনে করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে স্বীয় অভিমত লিখিয়া গিয়াছেন। 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' গ্রন্থ রচনার সময়ে প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতা রামনারায়ণ মিত্র রাধামোহনকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।[২] রাধামোহনের কবিখ্যাতি সেকালে গৌরবস্থল বলিয়া স্বীকৃত হইত। সুপ্রসিদ্ধ কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রাধামোহনের কবিতার অনুরক্ত পাঠক ছিলেন এবং রাধামোহনের কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইল :

ঝিঁঝিঁট—আড়াতেতালা।

মনের নয়নে, ও সই, মজালে আমারে।
দেখিতে না চাহি যারে, সে দেখে তাহারে ॥
না হেরি যার বয়ান, না করি যাহার ধ্যান,
সে জন উদয় সদা, মানস-আগারে ॥

॥ ২ ॥

প্রাণনাথে নিশানাথে সই ! সমান যে গণিলে।
কার কিবা গুণাগুণ কিসে কি বুঝিলে ॥
সুধাংশু দর্শনচ্ছলে, বিচ্ছেদ সাগর উথলে,
স্রোত বহে নয়ন যুগলে ॥
সে সিন্ধু শুকায় না হে বারেক হেরিলে ॥

আজু কেন গো রাধে চঞ্চল মন
হরষিতে অন্যদিন কহিতে বচন
উর্ধ্ব কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে, আছ পথ নিরীক্ষণে,
প্রহরী করিয়া যেন রেখেছ নয়ন ॥
নাসিকা বদনে অতি, সদাগতি সদাগতি।
বিনা শ্রমে শ্রম-নীর কর উপার্জ্জন ॥

॥ ৪ ॥

বেহাগ-আড়াতেতালা।

কে জানে কেমনি তব, রাধে, আশ্রয়ের গুণ।
নাশক হইল সখা, এ এক দারুণ ॥

১ বাঙ্গালীর গান।
২ বঙ্গভাষার লেখক

অরুণাক্ষি চন্দ্রানন, তাহে কোপ-হুতাশন,
অথচ বিষাদ-তম, বহিছে দ্বিগুণ ॥
আমারে তো একজন, আশ্রিত-গগণে গণ,
তবে কেন মম প্রাণে, দহে কোপাগুণ ॥

॥ ৫ ॥

সারঙ্গ—সওয়ারী

সকলি বিরূপ সখি, বিচ্ছেদ-কারণ।
বিরহের আদেশ লয়ে, শশী এলো রবি হয়ে,
চন্দন হলো গরল, করিতে লেপন ॥
অগুরু মাখায়ে দিলে, এ হেন কুসুম-হার,
যেন কণ্টকপ্রায় হৃদে ফুটিছে আমার।
মন্দ মন্দ সমীরণ, করিছে বস্ত্র ক্ষেপণ,
হয়ে নীল-বাস, করিছে দংশন ॥
ভূষাইয়া দিলে, সখি, যত রতন-ভূষণ,
জ্ঞান হয় জ্বালিয়া দিয়াছে দেহে হুতাশন,
কোকিল-ভ্রমর গানে, বাণ হেন হানে কানে,
এ যন্ত্রণা হ'তে লইবে কুশল মরণ ॥

মধুসূদন কিন্নর

টপ্পার রাজ্যে নিধুবাবু যেমন শীর্ষস্থানীয় তেমনি ঢপ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে—মধু কান। ধ্রুপদ হইতে যেমন খেয়াল এবং টপ্পার উদ্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ কীর্তন হইতে ঢপের প্রবর্তন। সুরের শুদ্ধ অনমনীয় উন্নত গাম্ভীর্য হইতে এগুলি নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। তাই, বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর বা রূপ ও রীতির প্রতি নিষ্ঠা এ জাতীয় সঙ্গীতের একমাত্র ধর্ম নয়। সংমিশ্রণধর্মী ঋজুতা লইয়া কীর্তনের আসরে ঢপের আবির্ভাব। সেইজন্য সাধারণ জনসমাজের নিকট ঢপ-সঙ্গীত অত্যন্ত অল্প আয়াসেই সকলের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ঢপ-সঙ্গীতের রাজ্যে মধুসূদনের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। অনেকে মধুসূদন কিন্নরকেই ঢপ-সঙ্গীতের প্রবর্তক হিসাবে অভিনন্দিত করেন।[১]

রাধাকৃষ্ণের জীবনী-বিচিত্রা,—কবিগানের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ঢপ-সঙ্গীতের রাজ্যে সেই কাহিনী—জীবন-সর্বস্ব। ঢপ-সঙ্গীত—সাধারণ প্রেম-সঙ্গীত নয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় ঢপের-গীতিকার মুখর। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঢপ-সঙ্গীতের রচক ক্ষান্ত হইয়া থাকেন নাই। কবি মধুসূদন যখন রাধিকার গীত-ভঙ্গিমার পরিচয় দেন তখন মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই।

১ "সুকবি মধুসূদন কিন্নর বা ঢপ-সঙ্গীতের প্রবর্তক স্বনামধন্য মধুসূদন কান পীযূষবর্ষী সঙ্গীতে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।"—যশোর-খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃঃ ৮৩৬।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥
রাশি রাশি শশী, পদনখে বসি,
অধোমুখে থাকে রজ লাগে
যত গুল্ম লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি ॥ [২]

বৈষ্ণব কবিতার সৌরভ ইহার সর্ব-অঙ্গে। কবি এবং গায়ক মধুসূদনের মানস-গঙ্গায় বৈষ্ণব-প্রাণতার যে কল্লোল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই তাঁহার রচনায় নৈর্বক্তিক সুষমামণ্ডিত হইয়া সর্বকালের রসিকমণ্ডলীর চিত্তজয় করিয়াছে। এই চিত্তজয়ী প্রতিভা সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না। অথচ মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভায় সকলেই মুগ্ধ। শোনা যায় যে, "তিনি প্রতি বর্ষে একটি করিয়া নূতন পালা রচনা করিতেন। প্রতি বর্ষে সরস্বতী পূজার দিনে বসিয়া তিনি বলিতেন, একজন লেখক লিখিতেন, এইরূপে সেই একই দিনেই একটি পালা সম্পূর্ণ করিতেন।" [৩]

মধুসূদন বাংলা ১২১২ সালে [৪] যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] পিতার নাম. তিলকচন্দ্র কিন্নর। ইনি বাল্যকালে ঢাকার ছোট খাঁ ও বড় খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয়ের নিকট রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন; পরে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত আঠার-খাদা গ্রামনিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকট কীর্তন অভ্যাস করেন। রাধামোহনের সার্থক শিষ্য—মধুসূদন। কীর্তনকে ভাঙিয়া ঢপে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ রকমেই মধুসূদনের। ১২৭৫ সালে মধুসূদন কাশিমবাজার রাজবাটীতে গান করিতে যান। পথিমধ্যে কৃষ্ণনগরে তাঁহার বুকে ও পেটে বেদনা হয়। এই রোগেই সেইখানে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের সঙ্গীত রচনার পশ্চাৎপট হিসাবে ছিল কবিগানের বিচিত্র জগৎ

২ রস গ্রন্থাবলী। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ১০০

৩ শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ—সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫০

৪ বঙ্গভাষার লেখকের মতানুসারে মধু কানের জন্ম হয় ১২২৫ সালে।

৫ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য—মধুসূদন কিন্নর বা মধু কানের জীবনচরিত। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩১৭ সাল)। পৃঃ ৫৩

তথা বৈষ্ণব জগতের প্রাণরস। প্রভাস-যজ্ঞে দ্বারী গোপীদিগকে দানধ্যান গঙ্গাস্নান করিতে বলায় গোপীগণের মাধ্যমে কবি আপনার মনের ভক্তিভাবের অপূর্ব প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

১

(রাধার চরণ) গঙ্গাতে কি পায়? হায়;—
সুরধুনী জন্মে যে পায়, সে ধরে সেই পায়।
জানি গঙ্গা ভবের তরী, তার তরী সেই চরণ তরী,
তুফানে পড়ে যার তরী, সে চরণ ধরলে তরী পায়।
(দ্বারি,) কি দিব আর দান, প্রাণদান দিয়েছি,
সে দান ফিরায়ে নিতে হেথা এসেছি,
(মোদের) দান ধ্যান পুরশ্চরণ, সকলই শ্রীরাধার চরণ;
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে সূদন যদি চরণ পায়॥

২

(যশোদার নিকট গোপালের নিজ জন্ম-পরিচয়)
মা শুন জনম-কথা।
সেত নয় কবার কথা, যে দুঃখের কথা;
জন্মি বটপত্র 'পরে ভাসিলাম জলে,
কিছুকাল পারেতে মা গো আসিলাম কূলে;—

তা' পরে এক রাজরানীকে মা বলিয়ে ছিলাম সুখে,
তা, পরে মথুরায় আছেন দুঃখী এক মাতা।
সূদন কয় মাতৃহীন ছেলে, যাকে পায় তাকে মা বলে,
(রানী) তোমাকে যে মা-বোল বলে, সে কেবল কথা॥

এই 'সূদন'ই মধুসূদন। এ সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। 'একদা এক জমীদারবাবু[৬] মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করেন,—"মধু তোমার নাম মধুসূদন, কিন্তু 'মধু'

৬ এই জমিদার হইলেন টাকীর বিখ্যাত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়। (বঙ্গীয়-সমাজ—সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী। পৃঃ ৪৮২)

বাদ দিয়া শেষপদে কেবল 'সূদন' বলিয়া ভণিতা দাও কেন ? সুরসিক মধুসূদন হাসিয়া সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—'হুজুর, গানগুলির প্রতি পদেই মধু, এজন্য শেষপদে কেবল সূদন বলিয়াই ভণিতা দিয়াছি।"

এ সম্পর্কে অপর একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। "কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— 'মধু! তুমি 'মধু' নাম ত্যাগ করিয়া কেন 'সূদন' বলিয়া ভণিতা দাও ?' মধু বলিয়াছলেন, 'মধু' পাছে 'বিষ' হয়, এই ভয়ে 'মধু'নাম দিতে সাহসী হই নাই।''[৭]

মধুসূদনের রচিত চারিটি পালা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম যথাক্রমে—কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর-সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস।[৮]

মধুসূদনের পদগুলির প্রত্যেকটিতেই মধুর-স্পর্শ পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে অপূর্ব ভাব-রসের সঞ্চার করে। এই রস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলিয়াছেন,—'আমাদের বোধহয়, বৃন্দাবনের কোন আভীরবালা কৃষ্ণবিরহে আকুলা হইয়া সযত্নে শুকপাখী পুষিয়া তাহাকে কৃষ্ণবুলি শিখাইয়া, পরিশেষে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই শুকই বোধহয় মর্ত্যে মধুসূদন হইয়া জন্মিয়া থাকিবে।'[৯] যাহাই হউক, মাইকেল মধুসূদন এবং কিন্নর মধুসূদন—যশোহরের এই দুই মধু যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে গৌড়জনগণ সত্যই "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

৭ বঙ্গভাষার লেখক। পৃঃ ৩৬৩

৮ 'বঙ্গভাষার' লেখক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে উক্ত চারিটি পালা ১২৯৭ সালে ৫।১।১ কলেজ স্ট্রীট হইতে প্রসন্নকুমার দত্ত প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন মহিমচন্দ্র বিশ্বাস। বর্তমানে পাঁচকড়ি দে কর্তৃক এই চারিটি পালা 'মধু কানের ঢপ কীর্তন' নামে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯ জন্মভূমি, অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল।

কবিগান

রাম ও নৃসিংহ

১

মহড়া

ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে ॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে,
কুঁজিরে পূজিলে কি গুণে ॥

চিতেন

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমায়ো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজি অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে ॥

অন্তরা

শ্যামরূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি,
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥

চিতেন

শ্যাম, রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছো যাহারো কারণে।
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥

অন্তরা

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধর বংশীবদনো ॥

চিতেন

শ্যাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনা,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদনো, তেজিয়ে সে ধনো,
অধমে রেখেছ যতনে ॥

অন্তরা

শ্যাম, আপনারো অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥

চিতেন

শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কুঁজীকৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে ॥

অন্তরা

শ্যাম, তেজিল শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতি সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরে নিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো ॥

চিতেন

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরের জলো, জগত ব্যাপিলো,
সাগরো শুখালো তপনে

২

মহড়া

প্রাণোনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে ॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।

চিতেন

পার্বতীনাথেরো, অর্ধ শশধরো,
সবিতা অর্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দূরো ভালেতে ॥

অন্তরা

হায়, মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠ দেশো নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রয়েছে ঘোষণা ॥

চিতেন

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্ক সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥

অন্তরা

হায়, সে যেমন ভোলা, তাহাতে
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥

চিতেন

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন মন তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে ॥

অন্তরা

হায়, ত্রিলোচন হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণো যুগলে ॥

চিতেন

ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণো যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্ত মানো,
কপালে কঙ্কনো আঘাতে ॥[১]

৩

মহড়া

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেও না।
মানা করি, কলহ আর বাড়াও না ॥
বিষাদের বাতি, জেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না।

চিতেন

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা ॥

১ ইঁহাদের অল্পকাল পরবর্তী কবিওয়ালা রাম বসুর অনুরূপ ভাবের একটি গান আছে। যথা,—হর নই হে আমি যুবতী ইত্যাদি।

অন্তরা

শ্যাম, নিতি নিতি তবো,
দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি।
এবারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বসেছেন কিশোরী ॥

চিতেন

জিনি মেরুগিরি, মান ভরে ভারি,
মরিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না।

অন্তরা

শ্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এ স্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিতেন

সুখের নিশিতে এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা ॥

অন্তরা

শ্যাম সরমে কি করে, বলিহে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি ॥

চিতেন

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটী,
তো সেটি ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া ঝাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কটূকে না।

মহড়া

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয় ॥
সুহৃৎ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো,
কলঙ্ক ভাজনো হোতে হয়।

চিতেন

এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি দু'দিকেরি,
ঐহিকো আরো পার্থিকো ॥
শ্রীনন্দ নন্দনো, দুখ ভঞ্জনো,
সদা রাখি তাঁরি পায়।

অন্তরা

অমিয় ত্যজে, গরলে মোজে,
উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে,
মরণো হোতে অধিকো ॥

চিতেন

হৃদয়ো মন্দিরো মাঝে, রসরাজে, বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে।
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয় ॥

অন্তরা

মনেরে কোরে চাতক পাখি,
রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি দেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে ॥

চিতেন

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হোলেন যাহাতে।
সেই কৃপাজলে, মনো ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয়॥

অন্তরা

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো॥

চিতেন

হৃদে আছে শতদলো, সে কমলো ফুটিবে।
প্রেম পীযূষো ঘটিবে॥
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায়।

অন্তরা

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতো, দেখিয়ে ভখিতে॥
ত্যজিয়ে এ সুধারসো, কেন বিষ ভখিবো।
কলুষো কূপে ডুবিবো॥
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,
পেয়ে প্রেমধনো সে হারায়।

মহড়া

যেন প্রাণ, অরসিক সহ, মিলন নাহিক হয়।
তুমি আরো অন্য তাপ, দিও শত শত,
যত তব মনে লয়॥

[অসম্পূর্ণ]

৬

মহড়া

শ্যাম, তুমি যত রসিক, রসে পারক,
শ্রীমতী তা জানে না।
ভারি ভূরি কোর না, বঁধু এখানে।
গিয়েছে সে কালো, জানিহে সকলো,
কুবুজা মিলেছে কপাল গুণে॥

চিতেন

নন্দ ঘোষের বাড়ি, ধূলায় গড়াগড়ি,
কড়া দুই ননীর কারণে।
এযে রাতারাতি, শিরে দণ্ড ছাতি,
শৃগাল ভূপতি, হোয়েছো বনে॥

৭

মহড়া

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে॥

চিতেন

প্রাণ তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো,
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্বথা, নিজ জনারে॥

অন্তরা

প্রাণ, আরো এক শুনো, বচনে তোমার,
দাঁড়ালেন কুলের বাহিরে।
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে,
ভাসালে এ জনে, ছলনা করে॥

চিতেন

তোমার চরিত্র, পথিকো যেমত,
হোয়ে শ্রান্তিযুক্ত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চাহে ফিরে ॥

মহড়া

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

চিতেন

আমি রসিকের স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো প্রেম বারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥

অন্তরা

হায়, কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত ভূমে ॥

চিতেন

কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা ॥[১]

হরু ঠাকুর

১

মহড়া।

আর রাধার অভিমান কে সবে,
বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে ॥
আমি যে সই গৌরবিনী, তারি গৌরবে।

চিতেন

যে বংশীর রব শুনি সদা সর্বক্ষণ।
যেন মৃতদেহে সখি আমার, আসিত জীবন ॥
এখনো এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে।

অন্তরা

শ্যামের গুণের কথা, শুনি প্রাণ সই।
ছলক্রমে এক দিনো অভিমানী হই ॥

চিতেন

সে মান ভঙ্গিবে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো।
ধরি যোগীর বেশ ॥
সে সবো স্বপনো হোলো তারো
অভাবে।

১ সংবাদ প্রভাকর। ১ মাঘ ১২৭২ সালের সংখ্যা হইতে (১—৭) সঙ্গীতগুলি গৃহীত।

২

মহড়া

ও সখিরে,
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার
এলো না।
মনেতে করিতে এ বিধু বয়ানো,
সখি এযে পাপো প্রাণে, ধৈরয না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বলো না॥

চিতেন

সই হেরি ধারা পথো, থাকয়ে যে মতো,
তৃষিতো চাতকো জনা।
আমি সেই মতো হোয়ে, আছি পথো চেয়ে,
মানসে করি সে রূপ ভাবনা॥

অন্তরা

হায়, কি হবে সজনী, যায় যে রজনী,
কেন চক্রপানি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভঞ্জে,
রহিল না জানি কারণো॥

চিতেন

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে
হোতেছ, স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি
ভান করি
না এলো মুরারি পাই যাতন॥

অন্তরা

সই রবি কিরণেরো, প্রায় হিমকরো,
এ তনু আমারো দহিছে।
শিখি পিক রবো, অঙ্গে মোরো সবো।
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

চিতেন

সই করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো,
করিলেকো প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভকি সেও ভালো
কি ফলো বিফলে কাল যাপনা॥

অন্তরা

সই দেখ নিজ করে, প্রাণপণো কোরে,
গাঁথিলাম এ কুসুম হার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥

চিতেন

সই খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি, শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম মনে।
তারো সঙ্গে কেন প্রাণো গেল না॥

মহড়া

কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার॥
ইথে যে উচিত তোমার।
করহে মুরারি, অধিনী তোমারি,
সকলি তোমারে লাগে ভার॥

চিতেন

আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো,
পুন করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি।
যে দুখ হলো সে অবলার॥

অন্তরা

ওহে শ্যাম, ভাব দেখি একোবার।
গোকুলেরো সে নীলে।
কিরূপো ব্যাভারো, হোতো নিরন্তরো
সকলি বিস্মরিলে ॥

চিতেন

হোতেম যখন মানিনী,
আপনি করিতে যে ব্যবহার।
সে সবো এখনো, হইল স্বপনো,
স্মরণার্থে রয়েছে আমার ॥

অন্তরা

ব্রজনাথ!
এক্ষণে ব্রজভূমেরো, হয়েছে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি দেখেছে বিশেষো,
কি কহিব সহসা ॥

চিতেন

আগমন কালে মাধবো, আসিবো,
করেছিল এই সার।
কেবল মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা
নতুবা হে সকলি আঁধার ॥

অন্তরা

কেবল এই হেতু প্রাণো আছে
গোপীকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারি, রাধা মনমালি,
জাগিতেছে অন্তরে ॥

চিতেন

দিবানিশি এই ধ্যানো, বাহ্যজ্ঞানো,
হারা হয়ে অনিবার।
কখনো চেতনো, পেয়ে ডাকি প্রাণকৃষ্ণো
কোথায়, দুঃখে কর পার ॥

অন্তরা

আর কি, হবে হে এমন দিন,
পুন যাবে ব্রজেতে।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারি,
যমুনা পার হোতে ॥

চিতেন

আর কি কদম্বতলে, কৌশলে
লবে দান পশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো
সকল ব্রজবাসী জনার ॥[১]

৪

মহড়া

কি হবে।
কোথা গেলে হরি, অনাথো করি,
তেজিয়ে পথ মাঝে।
তব বিরহে, হৃদয়ে বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে,
হরি মরি প্রাণে যে ॥

১ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গীত-রত্নমালা' গ্রন্থে রঘুনাথ দাসের ভণিতাযুক্ত গীতসমূহ রঘুনাথ দাসের বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবৃতি অনুসারে (পৃঃ ৫২) এগুলি যে হরু ঠাকুরেরই রচনা তাহা জানা যায়।

চিতেন

হায়, এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি,
লইতে চাহিলে হে যে।
আবার কিযে ভাবান্তরে, অদেখা আমারে,
হোলে কি মনে বুঝে ॥

অন্তরা

হায়। ওহে তরুগণো, মোরো শ্যামধনো,
দেখেছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিল বিধি, সে প্রাণনিধি,
এইখানে হোয়েছি হারা ॥

৫

মহড়া

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনা জলে,
আমি এমন মোহনো, মূরতি কখনো,
দেখিনি এসে হেথায় ॥

চিতেন

অঙ্গে গৌর চন্দনো চর্চিতো, বনমালা গলায়।
গুঞ্জে বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায় ॥

অন্তরা

সই, সজল নবজলদো বরণো,
ধরি নটবরো বেশ,
চরণো উপরে থুয়েছে চরণো,
এই কি রসিকো শেষ ॥

চিতেন

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ, নখরেরো ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায় ॥

হায়। অনুপম রূপো মাধুরি সখি,
হেরিলাম কি ক্ষণে,
প্রাণো নিলে হোরে, ঈষতো হেসে,
বঙ্কিমো নয়নে ॥

চিতেন

মন্দ মধুরো মুচকি হাসি, চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো,
মন মজিলো হেরে উহায় ॥

অন্তরা

সই, অলকা আবৃত বদনো,
তাহে মৃগমদ তিলোক।
মনহরো সাজো, নাসাগ্রে গজো,
গজ মুকুতার ঝলকো ॥

চিতেন

বিম্বধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।
কিযে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো,
রূপে ভুবন ভুলায় ॥

অন্তরা

সই, বেষ্টিতো ব্রজবালকো সবে,
কি শোভা আ মরি হায়।
গগনেতে তারাগণ মাঝে,
চাঁদ যেন শোভা পায় ॥

চিতেন

সই কেন বা আপনা খিয়ে,
আইলাম যমুনায়,
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায় ॥

৬

মহড়া

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম।
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিশ্রিতো,
কারো মুখে যদি শুনিতেম ॥
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষো ভকিতেম।

চিতেন

যখন মদন মোহন আসি,
রাধা রাধা বোলে বাজাত বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম
সই, আমিও চাতুরী করিয়ে সে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম ॥

অন্তরা

হইয়ে মানিনী যতেক গোপিনী,
বিরহ জ্বালাতে জ্বলিতেম।
সই, ষড়জাল সম, সে রক্ত নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমলো প্রাণ,
সমর্পণো করিতেম।

চিতেন

আগে গুরুজনো, বুঝালে যখনো,
তা যদি গ্রহণো করিতেম।
রিপুগণো বশে, রহিত অনাসে,
মনেরো হরিষে থাকিতেম ॥

মহড়া

হরি ব্রজনারী চেন না এখন।
রাধার প্রাণোধন ॥
প্রভাসো তীর্থে দরশন।
পাইয়ে কৃষ্ণেরে, অভিমান ভরে,
কহে করে ধোরে গোপীগণ ॥

চিতেন

নাহি পীতধটি মুরলী,
গোচারণের সে ভূষণ।
এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি,
দ্বারকা পতি, সোনারো ভবন ॥

অন্তরা

যদুনাথ! আরো কেন দুঃখিনীগণে,
স্মরণো হবে।
গিয়েছে সে সবো, ব্রজেরো ভাবো,
মজেছ গৃহ ভাবে ॥

চিতেন

রুক্মিণী আদি রাজসুতা, বশতা,
সবে সেবে ও চরণ।
রাধা কুরূপিনী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী কি লাগে মন ॥

অন্তরা

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, সে সুখ
বিলাস।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো, পুরাতেছ
অভিলাষ ॥

চিতেন

সত্যভামার মানো রাখিলে, রোপিলে,
পারিজাতের কানন।
তাহে আছো বাঁধা, সাধো প্রিয় সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন ॥

অন্তরা

তোমারে, অকিঞ্চন জন নাথো, কৃষ্ণ জগজনে
কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো,
ও পদে আশ্রয় লয়॥

চিতেন

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে,
যখন শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না লবে শরণো,
দুঃখে গেলে প্রাণো দুখীজন॥

অন্তরা

শুনহে, বহুকালান্তরে, প্রাণবঁধু; পেয়েছি
দেখা।
জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে, আর
নাহিকো সখা॥

চিতেন

সুখ দুখ কৃষ্ণ তব হাত
রঘুনাথ করয়ে নিবেদন।
চল হে নিলাজ গোপীকা সমাজ
ব্রজরাজ নন্দেরো নন্দন॥

৮

মহড়া

ইহাই কি তোমারি মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে।
বল না কি বাদ সাধিলে।
নবীনো পীরিতো, না হইতে নাথো,
অন্তুরে আঘাতো করিলে॥

চিতেন

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো,
কে আনিলো রথো গোকুলে।
অক্রুরো সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো,
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥

চিতেন

শ্যাম, নিশি ভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী
তথা আমি গোপী সকলে।
কিসে হলেম দুষি, তা তোমায় জিজ্ঞাসী,
কি দোষে এ দাসী তেজিলে॥

৯

মহড়া

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজহরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও।
জীবনো উপায় বলে দেও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও॥

চিতেন

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধো না করি,
থাক হরি যথা সুখো পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও॥

১০

মহড়া

পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো।
সখি কও শুভ সমাচার।
জীবন জুড়াও রাধার॥
মথুরা নগরে, মাধবেরো,
দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার॥

চিতেন

না হেরে নবীনো, জলধর রূপো,
আকুল চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান॥
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো,
হরি বিনে সকলি আঁধার॥

অন্তরা

হায়। ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,
মধুপুরে সুখো বিলাসী।
স্বরূপে কহনা সেখানে রাজার
কে রাজমহিষী।

১১

মহড়া

ঐ আসিছে কিশোরী তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে॥
বঁধু ঘুমে ভূমে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে
শুখায়েছে বিম্বাধরো শ্যামচাঁদেরো,
বঁধুর এলায়েছে পীতবাসো,
নারে তুলে পরিতে॥

চিতেন

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত
ওই সই সেই প্রাণনাথ॥
প্রভাতো অরুণো সহ উদয় আসি,
বঁধুর হয়েছে অরুণো আঁখি
নিশি জাগরণেতে॥

১২

মহড়া

নিজ দাসের দোষে ক্ষমা কর, ওগো কিশোরী
পীতবাসো গলে দিয়ে, বলে বংশীধারী।
যদি হোয়ে থাকে অপরাধো চরণে ধরি॥

চিতেন

পোহালেম সঙ্কটে রজনী দুখেতে।
কহিব কার সাক্ষাতে॥
বরং তুমি শুভলে জিজ্ঞাসা কর॥
আমি ভ্রমিলামো বনে বনে,
হারাইয়ে বাঁশরী॥

১৩

মহড়া

ওহে চাতুরী করিয়ে হরি ভুলাও আমায়।
ওহে চতুরেরো শিরোমণি, শ্যাম রসরায়॥
বনে অধরের অঞ্জনো তোমার লাগিল কোথায়।
চিকুরের চিহ্ন হেরি হৃদয়ে তোমার,
তোমার কণ্ঠেতে কঙ্কণো চিহ্ন,
ওই যে হে দেখা যায়॥

১৪

মহড়া

সখিরে গৃহে ফিরে চলো।
শ্রমে শ্রীমতীর শ্রীমুখো ঘামিলো॥
নিকুঞ্জে আজু যাঁওয়া না হোলো॥
ঐ দেখ না কিশোরী, বৃক্ষ শাখা ধরি,
কাতরা হোয়ে দাঁড়ালো।

চিতেন

কিশোরী কিশোরে, দোঁহে একন্তরে,
হেরিব সাধো ছিলো।
তাহে নিদারুণো বিধি, হোয়ে প্রতিবাদী,
সে আশা পুরাতে না দিলো॥

অন্তরা

হায় শ্রীহরি স্মরিয়ে, সুখনা করিয়ে,
যেতে ছিলেম কুঞ্জ কাননে।
তাহে হেন বিঘ্ন, জন্মিলো গো কেন,
আমাদের কি কপাল বিগুণে॥

১৫

মহড়া

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিত কে আছো আমারো॥
পথ শ্রান্তে নহি গো কাতরো।
হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জনো চরণো,
উদয়ে অবশো শরীরো॥

চিতেন

অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো,
আরো না চলে চরণ।
সেই শ্যাম প্রেমো ভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বর যে ভারো অম্বরো॥

অন্তরা

হায় সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গ ভঙ্গিমো,
বয়ানো কোরে তা কবো।
লেগেছে যাহারো প্রবেশি অন্তরে,
সেই যে বুঝেছে সে ভাবো॥

চিতেন

কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো,
না রাখে জীবনো আল।
তারো জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা
সন্দেহ নাহি মরিবারো।

১৬

মহড়া

ও শ্রীরাধে, তোমার প্রেমেরো প্রেমি যে হওয়া ভার।
মহিমা অপার।
তব মায়াতে ত্রিজগতো বশো,
প্যারি তুমি বশো, বল দেখি কার।

চিতেন

গজগামিনী রাই,
জানিয়ে তত্ত্ব জাননা আপনার।
দেখ ত্রিদশেরো পতি যে জনা,
তারে স্থাপিবারো তুমি মূলাধার॥

(ঐ গীতের পাল্টা)

মহড়া

রাধে তুমি কি সামান্যা নারী।
তব প্রেমে বাঁধা বংশীধারী॥
দেখ গো মনে বিচারি।
শ্রীদামেরো শাপে, সেই মনস্তাপে,
উদয় হইলে গোলকপুরী॥

চিতেন

বৃষভানু ঘরে জন্মেছো গো রাই,
করিতে লীলা প্রচার।
রাধা তন্ত্রে শুনেছি মহিমা তোমার।
পূর্ণ ব্রজময়ী তুমি রাধে,
গোলক ধামের ঈশ্বরী ॥

১৭

মহড়া

ওহে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী।
মনে ধরে না ॥
মনো সে প্রেম পাসরে না।
যথা ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা ॥

চিতেন

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝ না।
আমার এ মনমন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ॥

(ঐ গীতের পাল্টা)

ওহে উদ্ধব,
আমি সেই রাধার প্রেমেরি প্রেমাধীনো।
সেই নিত্য বস্তু হে জেনো ॥
আরো সকলি অনিত্য, সেই সত্য সত্য,
এ তথ্য তুমি তো জানো ॥

১৮

মহড়া

সখিরে রসেরো অলসে।
গত দিবসেরো রজনী শেষে ॥
অচেতন হোয়ে স্বপো আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে শ্যামেরে হারায়ে,
কেঁদেছিলাম কত হুতাশনে ॥'

চিতেন

যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাণো শিহরে।
তাই ঘটেছিলো, সই।
অমনি কম্পান্বিতো হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি,
হোরে নিলো বিধি কি দোষে ॥

অন্তরা

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা,
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম।
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম ॥

চিতেন

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বনো অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী,
বদন দিতেছে হুতাশে ॥

১৯

মহড়া

মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে।
তুমি হয়েছো রাধে ॥
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে।
ম্লান শশী মুখো কেন গো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে।

চিতেন

এই দেখে এলেম শ্রীকৃষ্ণ সহিতে
হাস্য কৌতুকে।
ছিলেগো রাই দোঁহে অতি পুলকে ॥

ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল,
উঠিলো কি বাদানুবাদে।

২০

মহড়া

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে।
তবে কি হবে সজনী।
লম্পটো স্বভাবো তার জানি ॥
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ॥
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ॥

চিতেন

ছিলো যে সঙ্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়
বিলম্ব দেখে তায়, হতেছে সংশয় ॥
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার।
গাঁথিলাম সখি গলে দিব কার ॥
যদ্যপি বিস্মৃতো হোয়ে থাকে গুণমণি ॥

অন্তরা

কৃষ্ণ প্রাণা, আমি আমার, অনন্য গতি।
বোলে কি জানাবো তোমায়।
তুমি কি জান না দূতী ॥

চিতেন

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে এতই, বাড়িছে ক্লেশ ॥
আসারো আশায়ে এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ ॥
মাধবো না এসে যদি, এসে দিনমণি।

২১

মহড়া

শ্যামের ঐ গুণেতে ঝোরে গো নয়ন।
সে যে বিপত্তো মধুসূদন ॥
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, ত্রিলোকো তারণ।
মহাঘোর বিপত্তি কালে।
যে ডাকে শ্রীকৃষ্ণ বোলে ॥
সে সঙ্কটে কৃষ্ণ তারো তরেন দুখো নিবারণ ॥

চিতেন

সাধে কি আমারো মনো কৃষ্ণ প্রতি ধায়।
কি গুণে বেঁধেছে, পাসরিতে নারি তায় ॥
যত লীলা করেছেন মাধব।
অন্তরে জাগিছে সে সব ॥
বাঁচাইলেন ব্রজপুরী, ধরি গিরি গোবর্ধন।

মহড়া

সখি শ্যামচাঁদে কর গো মানা।
কোন ছলে যেন এসেনা কদম্ব তলে,
ললিত ত্রিভঙ্গোরূপ, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না ॥

২২

মহড়া

অকূলো পাথারেতে।
ডোবে নৌকা রাখ ওহে প্রাণনাথ ॥
তরি করে টলো টলো, কি হলো কি হলো,
জলেতে ডুবিল অকস্মাৎ।

চিতেন

প্রতিদিনো হরি, এই তরি,
লোয়ে করি যাতায়াত।

এমনো সঙ্কটে, ঠেকিনি কখনো।
তোমারো চরণো প্রসাদাৎ ॥

২৩

মহড়া

বোঝা গেল না।
হরি কেমন তোমার করুণা।
মরি হে কি বিবেচনা ॥
দিয়ে রাধার প্রেমের ডুরি, এলে ম
পুরাতে কুবুজার মনোবাসনা ॥

চিতেন

সকলি বিস্মৃতো, কি ব্রজনাথো,
হোলে একোকালে।
ভেবে দেখ হে গোকুলে,
হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না ॥

অন্তরা

শ্যাম, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,
রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ, জো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি ॥

চিতেন

আরো শুনো হরি, নিবেদন করি,
ব্রজের সমাচার।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে
কোন প্রবলো হেরি যমুনা।

২৪

মহড়া

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
ত্যজিয়ে এসুখো বৃন্দাবন।
দুখিনী রাধায় মদন করে
দগ্ধ হে মদনমোহন ॥
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন।

চিতেন

একে তো সহজে এ ব্রজধাম,
সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কাল্‌গুণেতে, পূর্ণ সুখো সম্পদ
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আর,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কি যে সুশোভন,
সব মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্বার যেন, এ ব্রজধাম,
ধরিল নবযৌবন ॥

চিতেন

মুকুলে মুকুলে, কোকিলে জাল,
করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে, গুঞ্জরে অলি সব ॥
আ মরি আ মরি, এই শোভা হেরি,
হইলে কি সব বিস্মরণ।

মহড়া

আজ বাঁধবো তোমায় বনমালী।
করিয়ে সখী মণ্ডলী ॥
নাগরালি তোমায় যত, করবো হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গো রসেরো, অবশেষো,
দিব মস্তকে ঢালি ॥

২৫

মহড়া

কি কাজো আর ব্রজ ভুবনে।
হায়, সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে ॥
রয়ে রয়ে চিতো, হয় চমকিতো,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে।

চিতেন

হায়, যদবধি হরি, গেছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি, গোপীগণে।
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ,
পরানো গিয়াছে তাহারি সনে ॥

অন্তরা

হায়, কোথা গেলে পাবো,
সে প্রাণো মাধবো,
কিরূপে মিলিবো তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরো, নাগরো বিনে ॥

চিতেন

হায়, রজনী কি দিনো, হোয়ে জ্বালাতনো,
এই আরাধনো, করি গো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো,
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে ॥

অন্তরা

হায়, যে শ্যাম সোহাগে, যারো অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী, সকল স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনা,
সদা করেন গানো, পঞ্চবদনে ॥

চিতেন

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো,
কি কাজো এ ছারো, দেহধারণে।
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ দিব যমুনা জীবনে ॥

অন্তরা

হায়, এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো,
হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বেরো তলো, বিহারেরো স্থলো,
হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে ॥

চিতেন

হায়, ঘটায়ে প্রমাদো, গিয়েছে বিনোদো,
এ খেদে সম্বরি সহি কেমনে।
হে যদু নন্দন বিপদ ভঞ্জনো,
দিয়ে দরশনো, বাঁচাও প্রাণে ॥

২৬

মহড়া

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম তোমার, শ্যামচাঁদেরে ॥
শুয়ে কুসুম শয্যা 'পরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন,
কারো সঙ্গে নাহি বসনো ভূষণ,
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥

চিতেন

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পটো কভু নয়, সরল হৃদয় ॥
তোমারো সঙ্কেতো জানায়ে।
শ্যাম বিহরিছে অন্যের লোয়ে ॥
দেখিবে তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে।

২৭

মহড়া

এ সময় সখা দেখা দেও হে।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ,
আমার আঁখি মনো সদাই দহে হে॥
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়,
হায় হায় হায় হে।

চিতেন

গ্রীষ্ম, বরষা, হিমো শিশিরে, যত দুখো হে।
সব সম্বরনো কোরেছি, কৃষ্ণ বসন্ত যাতনা,
প্রাণে না সয় হে॥

অন্তরা

প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়,
কোকিলের স্বর জাল!
তাহে পড়ে আমি, হরিণী সমানো,
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল॥

চিতেন

জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেন,
নিদয়ো জনার্দন হে॥

২৮

মহড়া

দীননাথ, দীন ডাকে তোমায় হে,
দীনবন্ধু বলে।
পড়ে অপার অকূলে॥
সে কি এমনি দুঃখে জ্বলে।

চিতেন

ওহে নিতান্ত যে সঁপে মন প্রাণ
তব শ্রীচরণ কমলে।
ডাকে সে মনের ব্যাকুলে॥

অন্তরা

তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর মুকুন্দ মধুসূদন নাম।
বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়,
হেলে পায় সুখ মোক্ষধাম।

চিতেন

ওহে তব দীন প্রতি, এ যে বিপরীত
এ কি হে তব লীলে।
না পাই কোন কালে॥

২৯

মহড়া

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
হেরি চিকনো কালো বরণ।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও॥
এ অধীনের মনের বাসনা পুরাও।
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও॥

চিতেন

নির্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন॥
তাহাতে নাহি খোদিতো,
শুনো ওহে ব্রজনাথো॥
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও॥

অন্তরা

শ্যাম শুন শুন, যাও কেন, রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান, আমি করিব শ্রবণ ॥

চিতেন

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধনি কুলবতীর মন।
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥
কোন রন্ধ্রে পূরে ধনি,
রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও

৩০

মহড়া

আবার ঐ দেখ বাঁশী বাজেগো কুঞ্জবনে।
শুনগো সখি, এবার গেল
কুলবতীর কুলমান,
হবে কি, মনে হোলে বিদরিয়ে যায়,
বারে বারে সবো কেমনে ॥

চিতেন

একবার বেজে শ্যামের মূরলী গো,
সই ঐ কাল বিপিনে।
মনো সহ প্রাণো, করেছে হরণো,
মরিতেছি শুরু গঞ্জনে ॥

৩১

মহড়া

অতি কাতরে কিশোরী কয়।
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি
সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি, কয়ে সবিনয় ॥
যেমন্ আছিস্ তেমনি আয় গো,
আর বিলম্ব নাহি সয়।

চিতেন

মুক্তকেশী, হোয়ে আসি গৃহ বাহিরে।
সজল নয়নে সাধে, সবারে ॥
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার,
এসো গো এ সময়।

৩২

মহড়া

ইথে কার্ অসাধ কমলিনী।
বল শুনি হাঁ গো রাধে,
হেরিতে নীলকান্ত মণি ॥
আমরা তো সব তব আজ্ঞাবর্তিনী।
যাবে কৃষ্ণ দরশনে, এতো শ্লাঘা কোরে
মানি ॥

চিতেন

কায় মনো প্রাণো যারো, পদে সমর্পণ।
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কখন ॥
যদ্যপি কাল্ বল তুমি,
আমরা প্রস্তুতো এখনি।

মহড়া

এসেছো শ্যাম, কোথা নিশি জাগিয়ে।
শূন্য দেহ লইয়ে,
এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে ॥
এখন কি হইল মনে, শ্রীমতী বোলে;
কি ভাবিয়ে রাধানাথো
এখন হোলে উপনীতো,
কোথা করিলে প্রভাতো,
শ্রীরাধারে তেজিয়ে ॥

চিতেন

কোন্ প্রাণে সে তোমারে, দিলে হে বিদায়।
তুমি বা কেমনে তেজে, আইলে হেথায়॥
বিদরে আমারো বুকো, তব মুখো হেরিয়ে।

॥ বিরহ ॥

৩৭

মহড়া

তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্॥
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্বক্ষণ।
দরশো পরশো, শুনিতে স্বভাবো,
করিতেছে আরাধন॥

চিতেন

অন্তরূপে আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণো, প্রাণো তুমি জুড়াবার॥
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে,
কার হইবে মিলন।

অন্তরা

প্রাণ, ইহারো কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম্ বিষমো দায়॥

চিতেন

অস্থিরো হোলো এ চারিজনে।
প্রবধি প্রবধো নাহি মানে॥
ইহার বিহিতো, সে হয় ত্বরিতো,
কর প্রেয়সি এখন।

অন্তরা

প্রাণ জীবনো যৌবনো ধনো।
এতো চিরো প্রদো নহে জানো॥

চিতেন

এ তুমি শুনেছো জানতো প্রাণো
অনুগতেরো রাখ সম্মানো॥
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি,
কর সুধা বিতরণ॥

অন্তরা।

প্রাণ এরূপো আশ্বাসো কথায়।
বল কি ফল আছে তায়॥

চিতেন

প্রতি দিনো আসি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয়ো এ আশা রাই॥
ত্বরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,
না সহে যাতনা॥

মহড়া

প্রাণ স্থিরো নীরে বেঁধে প্রস্তরো।
তুমি চঞ্চলো কেন এতো।
যাতে হইবে তব মন প্রীতো॥
তাই কি না হবে, বুঝ না হে ভাবে,
আছিতো অনুগত।

চিতেন

আয়াসো পেয়ে হয় সে সুখোলাভ।
সেই সে সুখেতে সুখো প্রভাব॥
দেখো তার প্রমাণো, চাতক নব ঘনো,
ব্যাভারে কি কি মতো।

৩৬

মহড়া

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো সে মনের আশায়॥
তুমি তো আমারি আছো
গিয়াছো কোথায়।

চিতেন

সুখে থাকো, মনে রাখো, এখন এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যতো ভালবাসো ভাবে বুঝা যায়।

অন্তরা

ওহে, তোমারো ও গুণো প্রাণো,
থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে,
না লাগে কারো গায়॥

চিতেন

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর।
হেন অসাধায়, গুণ আছে কার॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়।

অন্তরা

যদি নারী হোয়ে করে কেউ,
প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক পেলে,
পূরে তারো আশ॥

চিতেন

যে রূপো সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, সেই যে জানে॥
এক মুখে তব গুণো, কোয়ে না ফুরায়।

অন্তরা

ওহে যতো দিনো, দেহে প্রাণো থাকিবে
আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥

চিতেন

তুমি যেমন সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষো লেশ॥
তোমারো রীতো, চরিতো,
জাগিছে হিয়ায়।

অন্তরা

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা
কেমন।
আহা মরি মরি তব, কি সরলো মন॥

চিতেন।

রঘুনাথো কহে কেন, ও বিধুমুখি।
কি দোষো দেখি হোয়েছো দুখী॥
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়।

৩৭

মহড়া

যৌবন কালে যদি নারী, বুঝিতো পীরিত।
তমো গুণে না হইত পূরিত॥
পুরুষেরো হইত বাধিত।
তবে তো হইত প্রেমে, সুখো সমুচিত॥

চিতেন।

সময়ে প্রেমেরো নাহি, করে অকিঞ্চন।
করয়ে কথন্ যায় যৌবনো যখন॥
সে প্রণয়ে হয়ো কিনা, নানা বিঘটিত।

৩৮

মহড়া

বুঝেছি মনেতে।
রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছে মিছি সে মিলন ॥
তাদের ধন লোয়ে কথা,
পীরিতি বা কোথা,
কাকস্য পরিবেদন।

চিতেন

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ
তবু কেমন চরিত্তো, তাহে কদাচিত্তো,
নাহি পাওয়া যায় মন ॥

অন্তরা

রূপে কাম সদৃশো, পুরুষো
অর্থহীন যদি হয়।
সে রসিকো জনে, নারী নয়নে,
না ফিরে চায় ॥

চিতেন

অতি নীচ যদি হয়, নিত্যধন দেয়,
যেচে তাঁরে সঁপে যৌবন :
তাহে কুৎসিত্তো কুজনা, নাহি বিবেচনা,
স্বকার্য করে সাধন ॥

অন্তরা

কেবল অর্থত্তেই লোভো,
মৌখিকো সে সবো,
কহে যে প্রেমো কথন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী,
সহস্রে মেলে একজন ॥

চিতেন

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,
হোলে হয় সর্বভূষণ।
তাদের সেই হয় প্রিয়তমো, সেই মনোরমো,
ধনদে তোষে যে জন ॥

অন্তরা

যার স্বামী অকৃতী, তারে সে যুবতী,
নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক থাক পিতা মাতারে,
এমন দরিদ্রে দিয়েছে দান ॥

চিতেন

যদি কপালে গুণে, পুনো সে জনে,
অর্থ করে উপার্জন,
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
কোরে হর আরাধন ॥

অন্তরা

দেখে অর্থ আছে যারো, সদা নারী তারো,
করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদপদ্মে স্থানো, দিও ওহে প্রাণো,
আমি করিব সহগমন ॥

চিতেন

পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা,
কথাতে করে কেমন।
করে আগাতে যে মনো, না থাকে তেমনো,
হোলে পরে পুরাতন ॥

৩৯

মহড়া

এতো দুখো অপমান।
সাধেয়ো পীরিতে প্রাণ।

নিতি নিতি প্রাণো নৃতনো আগুনো
উঠে না হয়ো নির্বাণ ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে জুড়াবারো তরে,
করে ছিলেম পীরিতি।
আমার সে সকলো গেলো,
শেষে এই হোলো,
সদা ঝরে দু নয়ন ॥

৪০

মহড়া

পীরিতের ও কথা, কোয়েতো ফুরায় না।
প্রাণ, যত কও ততই, উপছে কতই,
পরিসীমা হয় না ॥

৪১

মহড়া

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তব, জীবনো যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ, করে যেই জন ॥
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন।

চিতেন

যেখানেতে না রহিল, মানী জনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান, তারে সঁপে প্রাণ ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক ভাজন।

অন্তরা

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন ॥

চিতেন

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জনো তাহার, ফিরে নাহি চায় ॥
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ ॥

অন্তরা

সখি পীরিতি পরমো ধনো, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারে খার ॥

চিতেন

সামান্য খেদেরো কথা একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই ॥
ঘরে পরে আরো তারে করয়ে লাঞ্ছন।

অন্তরা

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই।
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো সুখে ছাই ॥

চিতেন

হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি ॥
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জন।

অন্তরা

যার স্বভাবো লম্বটো সই, তারো কি এ বোধ।
আছে, কি করিবে তব, প্রেম অনুরোধ ॥

চিতেন

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন।
এরূপো মিলন, না দেখি কখন ॥
রঘু বলে কোথা মেলে দু জনে সুজন।

৪২

মহড়া

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে ॥

শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মিলনো,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে ॥

চিতেন

নিম্বতরু যদি রোপণো হয়ো, শত ভারো
শর্করে।
সে যে মিষ্ট রসো, না হয়ো কখনো,
নিজ গুণো প্রকাশো করে ॥

৪৩

মহড়া

তুমি কার প্রাণ, করি দেহশূন্য
এলে বাহিরে।
হেরে সেরূপো, বাসনা করে ॥
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ,
সেইখানে রাখি তোমারে।

চিতেন

পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো
করিলে বসুমতী।
জ্ঞান হয় প্রাণ তেমতি ॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ,
তব অম্বরে ॥

৪৪

মহড়া

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনী বলি তোমাকে ॥
শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে।

চিতেন

প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো,
নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,
তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে ॥

৪৫

মহড়া

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে ॥
হোতেছে এখনো, নূতনো যতনো,
কি হোলে কি হবে শেষেতে।

চিতেন।

প্রাণ নব অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে,
আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো,
নাই সদা দেখিতে ॥
হেন ভাবো যদি, থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে ॥

৪৬

মহড়া

রহিল না প্রেম গোপনে।
হলো প্রকাশিতে ভাল দায় ॥
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণো যায় ॥

চিতেন

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমারে সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোকো গঞ্জনায় ॥

অন্তরা

হায়, কতজনে কত, বলেছে নাথো,
মরে থাকি মরমে।
বদনো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে॥

চিতেন

হায়, কি পুরুষো নারী, করে ধরাধরি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবী কোথা যাব, লাজে মরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়॥

অন্তরা

হায়, হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে,
সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা তথাপি,
লোকে জানে

চিতেন

হায়, পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিলো জগতময়॥*

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী

১

মহড়া

সই কি কোরেছে হায়।
তোমারো সরলো পরাণো সঁপেছ কারে।
চেন না উহারে প্রাণো সখি রে॥
কত রমণীরো বধেছ জীবনো,
ঐ শঠ জনো, পীরিতি কোরে॥

চিতেন

নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণসখি,
পড়েছে যে দেখি, বিষম ফেরে।
হৃদয়ো মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান,
পুরুষো পাষাণো, চেন না ওরে॥
তুমি লো যেমনো, রমণী ভাজনো,
তোমার এ গুণো, কেবা বুঝিবে।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে॥

মহড়া

রাধারো বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি, তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ ধরেছ হে মথুরায়॥
রাখালেরো বেশো লুকায়েছ বঁধু,
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়।

চিতেন

এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন কিশোরী, ওহে বংশীধারী,
প্রতারণা করো না আমায়॥

অন্তরা

এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি,
বার দিলে গজ পরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো শ্যামো।
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে॥

* হরুঠাকুরের গীত সমূহ সংবাদপ্রভাকর ১ পৌষ ১২৬১ সালের সংখ্যা হইতে গৃহীত।

২

মহড়া

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে॥

চিতেন

বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিতো,
জড়বতো কোন কারণে।
যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥

অন্তরা

একি একি সখি, একিগো নিরখি,
দেখো দেখি সবো, গোপনে।
তুলিয়ো বদনো, নাহি খায়ো তৃণো,
আছে যেন হীনো চেতনে॥

চিতেন

হায়, কিসেরো লাগিয়ে, বিদরায় হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি, প্রেম উপজিলো,
সলিলো বহিছে নয়নে॥
আরো একো দিবো, শ্যামেরো ঐ বাঁশী,
বেজেছিল কাননে।
কুল্যে লাজো ভয়ো, হরিলে তাহাতে,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

৩

মহড়া

আমার মনো নাহি মরে তায়।
তুমি প্রেম করিবারে বলিছ আমায়॥
শুন সজনী, বলি তোমায়।
ইহা জেনে শুনে, ফণির বদনে,
কর দেয় কে কোথায়॥

চিতেন

বারে বারে পীরিতে সই,
বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার।
ইহাতে যতো সুখো সম্পদো,
নাহি অবিদিতো আমার॥
সুধারো কারণে, বল কোনোখানে,
কে কোথা গরলো খায়।

মহড়া

পীরিতি নগরে বিষমো সখী,
মনোচোরে রো যে ভয়।
বসতি ইহাতে দায়॥
নয়নে নয়নে সন্ধানো,
মনো অমনি হরিয়ে লয়।

চিতেন

সন্ধানো করিয়ে মনোচোর,
ভ্রমিছে নগরময়।
কুলেরো রাহিরো হও না,
থেকো সাবধানে লো সদয়॥

মহড়া

হেরি প্রাণ রে,
তব মুখ কমলে, নয়নো খঞ্জন।
ওলো হবে দুখো নিবারণ॥
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতী
বুঝি ভূপতি হব এখন।

চিতেন

কমলো পরেতে খঞ্জন,
যদি দেখে কোনো জন।
অবশ্য তাহারা হয় রাজ্যলাভ,
ওলো এই তো বেদের বচন ॥

অন্তরা

হায়, ইহার কারণে, যাত্রা কালেতে,
শুন ওলো সুন্দরি।
বামে সব শিবে কন্ত,
দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি ॥

চিতেন

তারি ভলো বুঝি আমারে আসি,
ফণিলো এখন।
ছত্রধারী হব তোমারো হৃদয়ে,
পাব হৃদি সিংহাসন ॥

মহড়া

যে কালে সলিলে বটপত্রে ভাসেন শ্রীপাত।
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতী ॥
ইহার তত্ত্ব কথা কহ সম্প্রতি, ও দূতী।
রাধা ছাড়া হরি নয়, সবে কয়।
সই আমার ঐ সন্দ হয় ॥
জানি রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা,
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ॥

চিতেন

তুমি চতুরা গোপী মধ্যে, বৃন্দে সজনী।
সবিশেষ, আমায় কও দেখি শুনি ॥
মহা প্রলয় যে দিন সে কালীন।
শ্যাম সঙ্গ রাই কেন বিহীন ॥
জানি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, প্রধানা
রাই প্রকৃতি।

মহড়া

কহ দেখি সখি রাধারে কেন,
মা রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনী, প্রকৃতিরূপে প্রধানা ॥
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে,
জড়তা হয় রসনা।

চিতেন

যে সীতে সে রাধা, ব্রহ্মরূপিণী
একই জানি দু জনা।
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে,
মা বোলে করে সাধনা।

৬

মহড়া

পরাণো থাকিতে প্রেয়সী,
তোমারে কি তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরী ॥
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো,
ইহারো কারণো, বুঝিতে নারি ॥

চিতেন

ছলো ছলো করে নয়নো,
দেখে প্রাণো ধরিতে নারি।
কি দুখো ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখো মলিনো করি ॥

৭

পীরিতে সই এমন বিবাগী হই,
ভাবি তারো মুখো নিরখিব না।
এ মুখো তারে দেখাব না ॥
বিরহে প্রাণ গেলে, তবু কথা কব না।
পুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো,
তখনো সে মনো থাকে না ॥

চিতেন

সখী না জানি কি ক্ষণে,
সে লম্পটো সনে, হইলো বিধিরো ঘটনা।
অন্তরো সদা উদাসী, দিবানিশি ঐ ভাবনা।
সখী হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,
কালি হোলো দেহ দেখ না।

৮

মহড়া

প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।
যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ,
যাবে লোকে প্রেমিক বলে ॥
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পীরিতি,
জীবনে মরে পীরিতি গেলে।

চিতেন

প্রেমরসে সেই জনো হয়ো রসিকো।
নিরবধি ধরে সে, যে মিলনো সুখো।
স্বপনে না জানে কারে, বিচ্ছেদো বলে।

অন্তরা

প্রাণ সতীরো পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চিরদিনো সমভাবে যায়ো সুখেতে ॥

চিতেন

আশ্চর্য মিলনো হয় সেই দু জনে।
বিচ্ছেদো কাহারো নাম, না শুনে কানে॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে।

৯

ধিক ধিক ধিক আমার ললিতে গো,
ধন্য কুবুজায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায় ॥
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালো তায়।

চিতেন

এতদিন অবধি আমরা কোরে আরাধন
হইলাম বঞ্চিতো, সে হরির চরণ ॥
গৃহে বোসে, অনায়াসে, অতুলো চরণ পায়।

১০

মহড়া

ওরে প্রাণ রে!
কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথায় আমার।
এ সরোবরে, না হেরে তারে,
আমি সবো হেরি শূন্যাকার ॥
আমায় কে দেবে মধু দান।
কারে মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ ॥
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে,
চারিদিকে অন্ধকার।

চিতেন

পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো,
জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম,
তারো মনো রাখিতে ॥

বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে।
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে॥
কি হোলো, কি হোলো,
কমল কোথা গেলো,
তারে কি পাবনা আর॥

১১
মহড়া

সে কেনো রাধারে, কলঙ্কিনী কোরে
রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখী, শ্যামের এ লীলে॥
দ্বারিকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সেই, যে জনো গিরি
ধরিলে।
শিশু বসে ধেনু কারণে, আরো মায়াতে
ব্রহ্মার মন ভুলালে॥

অন্তরা

হায় দেখ প্রাণ-সখি, যোগীজন যারে,
সদা করে ধ্যান।
যাহারো বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে
উজান॥

চিতেন

যার ধেনু রবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যার দরশনে করিতে,
হর পার্বতী, আসিতেন এই গোকুলে॥

অন্তরা

হায় ত্রেতা যুগে শুনেছি সখী,
কর দেখি তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশু পক্ষীর,
ঝুরিতো দুটি নয়ন॥

চিতেন

সীতা উদ্ধারিতে যে জন, জলেতে
ভাসালে শিলে।
যার পদরেণু পরশে দেখো, অহল্যা
মানবী দেহ পেলে॥

অন্তরা

হায় সবে বলে দয়াময়,
পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হোলেন,
বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী॥

চিতেন

হিরণ্য বধিতে যে জন,
নৃসিংহ রূপ করিলে।
প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে
হরি, স্ফটিকের স্তম্ভে দেখা দিলে॥

অন্তরা

হায়! ত্রিপুরারি যার নাম,
জপে অবিশ্রাম, দিবারজনী।
বীণা যন্ত্রে যার গুণো গায়,
লই নারদ মুনি॥

চিতেন

শমন দমন হয় যার নামে,
রামজী তাকে বলে।
মিত্রভাবে যে জন করেছিলে কোলে,
গুহক চণ্ডালে॥

১২

মহড়া

রাই এসো তোমারে,
রাজা করি বিধু বনেতে।
বহুদিনের এই সাধো আছে মনেতে॥
দোহাই রাধারো,
বলে শ্যাম নাগরো,
ফিরিবে নগরেতে।

১৩

সখি ঐ মনোচোরা মোরো,
মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণসখি, ধরিব উহায়॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরো লুকায়।

চিতেন

চোখেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন।
নয়নে নিদিলি, মোরো, দিলেগো কেমন॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম, কি হোলো আমার।

১৪

মহড়া

তুমি কার প্রাণ, মম মন হরিলে এসে।
মৃগনয়নি, নয়নোবাণো হানো অনাসে॥
জর জর জর, কোরে কলেবর,
বাঁধিলে ধনি প্রেমো ফাঁসে।

চিতেন

তোমারো হেরিয়ে আমারো মনে রো
তিমিরো বিনাশেণ
স্বরূপে বল না, ও শশি বদনা, ছিলে কার
হৃদয় বাসে॥

১৫

মহড়া

যে দুখো যুবতী জনার, সে কি তাহা
জ্ঞাত নয়।
জানি তো যগুপি, আসিতো নিশ্চয়॥
ধনলোভে আছে ভুলে,
প্রিয় বোলে তোষে না।

অন্তরা

আপনি শ্রীরামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ।
উদ্ধারিয়ে সীতে অনলে করে দাহন॥

চিতেন

অযোধ্যা নগরে গিয়ে, রাজা
হোলেন শেষেতে।
বনবাসে ছিলেন পুনো সে সীতে॥
নারীর পঞ্চমাস গর্ভকালে কিছু দয়া
হোলো না।

অন্তরা

নল নরপতি তার, দয়মন্তী ভার্যা লোয়ে।
প্রবেশিল বনে, দুইজনে, একত্রে হোয়ে॥

চিতেন

অর্ধেকো বসনো পোরে, নিদ্রাগত যুবতী।
বসনো ছিঁড়িয়ে যায় নৃপতি॥
কাননেতে, রেখে যেতে, তিলেকো
ভাবিলে না।

১৬

মহড়া

কমলিনী নিকুঞ্জে কি কয়।
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো।

ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো।
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ,
নন্দের ভেরী বাজিলো॥

চিতেন

সহচরী কহে কিশোরী,
ব্রজে প্রমাদ হইলো।
মথুরা হইতে প্রাণনাথে হোরে নিতে,
অক্রুরো আইলো॥

অন্তরা

যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায়
আদরিণী বলে ব্রজেতে।
যে শ্যামসুন্দর, মথুরা নগরে যাবে,
নিশি প্রভাতে॥

চিতেন

সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী,
ত্যজে গোকুলে।
বিধু বনে রাধা রাধা রাধা বোলে,
কে বাঁশী বাজাবে বলো॥

১৭

মহড়া

প্রাণ আমি তোমারি।
নিতান্ত জেনো সুন্দরী॥
তুমি যত কর অপমান,
অঙ্গেতে ভূষণো করি।

অন্তরা

প্রাণ তুমি কাদম্বিনী, মনেতে জানি
আমি তো চাতকী।
অন্য মত মোরো, নাহিকো মনেতে,
বিচারিয়ে দেখ দেখি॥

চিতেন

পিপাসাতে পীড়িতো হোয়ে,
যদি ত্যজি এ জীবন।
তথাপি অন্য নীরো, না করি ভক্ষণ॥
ঊর্ধ্বকণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদম্বিনী দেহ বারি

১৮

মহড়া

হরি ব্রহ্মাণ্ড দেখালে বদনে
কৃষ্ণ কি গো জানে॥
বালকো হোয়ে গোকুলে,
মৃত্তিকা ভোজন ছলে,
মায়া করে মায়েরো সনে॥

চিতেন

যশোদা কহিছে ওগো রোহিনী।
কেমনো বালকো কৃষ্ণ, কিছু না জানি॥
নাকট ভঞ্জন সে দিনো করিলে চরণে।

১৯

মহড়া

প্রেয়সী তোমার প্রেমাধার
আমি শুধিলে কি তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেনো ভাবো সুন্দরী॥
তুমি সে ধনো ঘাতকে, দিয়েছ করজো,
পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন

মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,
হইলাম প্রেমো করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে,
লাভে মূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি॥

২০

কমল কম্পিতো পবনে
অলি কাতরো প্রাণে ॥

চিতেন

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো কখনো নাহি বজ্রাঘাত।
অস্থির নলিনী প্রাণে সহে কেমনে।

অন্তরা

হায়, যে দিগে নলিনী হেলে,
মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে, বসিতে না পায়

চিতেন

হায়, গুণ গুণ স্বরে কাঁদে অলি,
অধো বদনে।
ধারা বহিছে অলির ছুটি নয়নে ॥
অলিরো দুর্গতি দেখি, হাসে তপনে।

২১

গমনো সময়েতে,
কেন কেঁদে গেল মুরারি ॥
তাই ভাবি দিবা সর্বরী ॥
জনমেরো মত রাধারে কাঁদালে সই,
বুঝি ব্রজে আসিবে না হরি ॥

চিতেন

হরি কি আসিবে ব্রজে আর,
মনে সন্দেহ করি।
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি,
পুনো আসিতো বংশীধারী ॥

অন্তরা

হায়। ছুটি করে ধরি, কখনো আমায়,
যাই যাই বঁধু কয়।
তখনো শ্যামেরো কমলো বদনো,
নয়ন জলে ভেসে যায় ॥

চিতেন

এতই মমতা শ্যামেরো, যাইতে মধুপুরী।
সজলো নয়নে, উঠিলেনো রথে,
বিধুমুখো মলিনো করি ॥

২২

মহড়া

ব্রজে মাধবো এলো না।
কি হবে বল না ॥
কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,
প্রাণ থাকিতে মিলনো হোলো না।

চিতেন

হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে,
মিছে করি দিন গণনা।
বসন্ত উদয়ো দেখ না ॥

অন্তরা

আখি জলে, তরুমূলে,
সিঞ্চিলাম হায় ব্রজাঙ্গনা।
চির দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো,
আশা তরু তো ফলিলো না ॥

২৩

মহড়া

ব্রজে কি সুখ রোয়েছে।
কি দশা ঘটেছে ॥

সে শ্যামসুন্দরো বিহনে
দেখ না ওগো রাই,
বনের পশুপক্ষী আঁখি ঝুরিছে।

চিতেন

হায়। সহজে শ্রীমতী তোমার
কোমল অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো,
পাষাণো বিদারো হতেছে॥

অন্তরা

হায়। ভ্রমরার দশা দেখ,
এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধূলায়ে ধূসরো, হোরে কলেবরো,
ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥

চিতেন

হায়। সখি কোকিলেরো না করে গানো,
অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহেতে দেখ না প্যারী,
খেদে কুহুরব ভুলেছে॥

২৪

মহড়া

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন হরি।
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরী॥
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরী।
কেন গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা, বাজাইছে বাঁশরী॥

চিতেন

বিধাতা সাজালেন শ্যামে অতি চমৎকার।
বারো একো সাধো ছিলো, শ্রীমতী রাধার॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী।

অন্তরা

হায়, কাননেতে তরুলতা,
ছিল সুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হইলো, বঁধুরে পাইয়ে॥

চিতেন।

কোকিলে পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান।
কমলে বসিয়ে অলি, করে মধুপান
আনন্দে মগনা হোয়ে, নৃত্য করে

২৫

মহড়া।

সখী এই বুঝি সেই রাধার,
মনোচোর, নটবর, বংশীধারী।
ত্যজে সেই বৃন্দাবন
শ্যাম এলেন এখন, মধুপুরী।
আমা সবা পানে, কটাক্ষে চেয়ে,
কোরে নিলো চিতো চুরি॥

চিতেন

মথুরা নগরী কহিছে সবে,
কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রুরো সহিতে, কে এলো রথে,
কালো রূপে আলো করি॥

অন্তরা

শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই,
দেখিলাম আজু নয়নে।
আঁখি মনে রো বিবাদো আমার,
ঘুচে গেল এতদিনে

চিতেন

এত গুণো রূপো, না হোলে সখী,
গুণময়ো হয় কি হরি।
এমনো মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি ॥

২৬

মহড়া

আমার কুচ্ছ হোলে কি, লজ্জা সে পাবে না।
একি পতির খ্যাভার সব, ভেবেছে তাহার,
আমি কেউ নই, মিছে কুলে বন্দী কোরে,
সে গেল আমারে, আমি তোরে পেলেম না ॥

চিতেন

প্রবাসেতে গিয়ে পুরুষের রাজ্যলাভ যদি

সে সবো সম্পদো তেজিয়ে, এসে বসন্ত সময়

আমি তাই ভাবি প্রাণসখি।
সে এমন ইন্দ্রত্ব পেয়েছে কি ॥
বিরহ দাহনে, মদনেরো বাণে,
মনো কি চঞ্চলো হোয়ে না।

২৭

মহড়া

কাল নিশিতে দেখিছি স্বপনে।
বুঝি প্রাণনাথ এসেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে

চিতেন

নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্য গত,
চৈতন্য ছিল না প্রায়।
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে,
জাগালেন বঁধু আমায়।
মৃদু মৃদু হাসে, বসি বাম পাশে,
তন্থ শ্রীঅঙ্গ আলাপনে ॥

২৮

মহড়া

নয়নো সন্ধানে নয়নে মজালে।
রূপে মন ভুলালে ॥
তুমি প্রাণো যে আমায়
কিনিলে বিনি-মূলে।

চিতেন

প্রাণ যে দশ ইন্দ্রিয়, মম শরীরে,
তোমারে হেরে বিভোর।
রসিকে রমণী তুমি রসের সাগর ॥
রস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে।

২৯

মহড়া

কেন সজনী মোরে মরণো নাহিকো হয়।
সুখোকালে সুখো ঋতু, দুখ দেও অতিশয়।
অথচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহে রয় ॥

চিতেন

যারো অনুগত প্রাণো, সে গেল,
তেজে আমায়।
তারো সাথে, সেই পথে,
প্রাণো কেন নাহি যায় ॥

অন্তরা

মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে।
দুখো বোধো নাহি হয়ো, সব অঙ্গ দাহনে

চিতেন

সঞ্জীব শরীরো এ, যে, বিরহ অনলে দয়।
দগধিয়ে মরি সখী, ইহা কি পরাণে সয়॥

৩০

মহড়া

মনো জ্বলে মনো অনলে,
আমি জ্বলি তারো সনে॥
এ পীরিতি মিলনে।
তুয়া দুখে আমি দুখী কি অদুখী,
বিধুমুখী ইহা বুঝ না কেনে ॥

চিতেন

অভিমানো দূরে, না ত্যজিলে প্রাণো,
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ো লক্ষণো, হতেছে এখনো,
দুইজনো পাছে মরি পরাণে॥

অন্তরা

হায়, কাননে অনলো লাগিলে যেমন,
কীটোপতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন।
তোমারো পীরিতে দিবসো শর্বরী,
ততোধিকো আমি হোতেছি দাহন॥

চিতেন

ওলো এ দায়ে যে জনো, করে পলায়নো,
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে।
আমি লো সুন্দরী, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমার ঐ মমতা গুণে।

৩১

মহড়া

আমার মনো চাহে যারে, তাহারো রূপো
নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার, প্রাণো প্রেয়সী।
নয়নো চকোরো, পিয়ে সুধা যারো,
সেই জনো তারো, শারদ-শশী॥

চিতেন

তব বিধু মুখো, হেরিয়ে আমার,
ঘুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি।
সে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখো সিন্ধু নীরে অমনি ভাসি॥

অন্তরা

হায়, কালো কলেবরো
দেখিতে ভ্রমরো,
তাহে ষটপদো, কুৎসিতো অতি।
এ তিনো ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীরো মনো, তাহারো প্রতি॥

চিতেন

কমলিনী মনে ভাবে নিরন্তরো,
নাহিকো সুন্দরো অলি সাদৃশি।
দিবসেতে হেরে, সাধো নাহি পূরে,
মানসেতে হেরে, হইলে নিশি॥

৩২

মহড়া

একা নহে প্যারী, তোমার স্ত্রী হরি,
অনেকেরি তুমি জেনো।
জগতো সংসারে তারো,
সকলি যে আপনো।
জগন্নাথো নাম, কোরেছেন ধারণো,
হরি জগতেরো প্রাণো॥

চিতেন

যে ভকতি করে, সে পায় কৃষ্ণেরে,
কৃষ্ণ ভক্তের অধীনো।
নিতান্ত তোমারো, প্রেমে বশো হরি,
ভেবনা তুমি কখনো॥

অন্তরা

নন্দালয়ে দেখ, নন্দ যশোদারো,
অতিশয় প্রেমে বশো।
যমুনারো তীরে, গোধন চারণো,
আশ্চর্য লীলা প্রকাশো॥

চিতেন

ভ্রাতৃভাবে দেখ, বলরাম মনে,
হয়েছে প্রেম ঘটনো।
শ্রীদামো সুদাম, বসুদাম মনে,
রাখাল ভাবে মিলনো॥

৩৩

মহড়া

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই।
লোকে দণ্ডহারী কবে সই॥

চিতেন

ভাল বোলে ভালবাসি যায়,
প্রাণো সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হোলে তারে, মন্দ বলা যায়।
এতো তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যাজ্য আমায়॥
সখ্যতা করেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই

৩৪

মহড়া

যেতে হোলে মুরারি বৃন্দাবন।
শ্যাম তোমার ব্রজ বালকগণ॥
তোমারে না দেখে, অস্থির ক্ষণেকে,
ক্ষণে হয় অচেতন।

চিতেন

কহিছে দৈবকী, প্রিয় বচনে,
শুন রে প্রাণ গোপাল।
শুনেছি বৃন্দাবনে, তব সব রাখাল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়ে, ভূতলে পড়িয়ে
সকলে করে রোদন।

অন্তরা

সে ব্রজনগরে, নন্দেরো ঘরে,
কাতরা নন্দরাণী।
নবনী করে, ডাকে উচ্চস্বরে,
কোথারে নীলমণি॥

চিতেন

ঘরে ঘরে ফেরে, তোমার তরে,
কখনো গোষ্ঠেতে ধায়।
ভ্রমেতে পথে পথে, ডাকিছে কৃষ্ণ আয়।
শিরে করাঘাত করে, যমুনা নীরে,
তেজিতে যায় জীবন॥

৩৫

মহড়া

তোমা বিনা গোপীনাথ্,
কে আছে গোপীকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার॥

ওহে ব্রজহরি, মরে রাধা প্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার।

চিতেন

দীনবন্ধু দুখো ভঞ্জনো,
অকিঞ্চনো জনের ধনো।
কেন হোল হে, হেন নিদারুণো॥
কুলাইতে পারো, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো,
রাধার ভার কি হোলো এত ভার।

৩৬

মহড়া

কোথারে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেলো।
নবীন কালে দেহে ছিলে,
প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হোয়ে হারা, হোয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের হোলো॥

চিতেন

নবীন বয়সে, রঙ্গরসে,
দিনে দেখা হোতো শতবার।
নীরস নলিনী বোলে এখন ভ্রমর,
চায় না ফিরে একবার॥
আগে প্রাণ হোলো,
তার পরে হোলো যৌবন ঘটনা।
বিধাতার একি বিবেচনা,
যৌবন গেল, প্রাণ তো গেল না॥
আমি কি ছিলেম, কি হোলেম,
আরো বা কি হই,
অনুতাপে তনু শুখালো।

৩৭

মহড়া

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্র রায়। হের না ও বয়ান।
রেখো সখি, দুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলমান॥

চিতেন

নব ঘন শ্যামরূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মূরলী বয়ান॥
মোহনা রূপসী, শশি দেখে রূপবান।

৩৮

মহড়া

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মান
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালবাসো প্রাণ॥
মনে তোমায় একবারো,
নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান॥
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান॥

চিতেন

তুমি বল প্রেয়সী আমি, তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস, নাহি কোন দিন॥
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ।

৩৯

মহড়া

ঐ কালরূপেতে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো
বাঁকা না হোলে॥
হরি তোমার আশ্চর্য লীলে॥

যারো কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায়, করে আরাধন॥
নারী নাহি পারে ধৈর্য হোতে,
এই ব্রজমণ্ডলে

চিতেন

কতরূপে হোলে তুমি, কত অবতার।
না জানি তোমার লীলা অতি চমৎকার॥
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার।
করিলে হে মনোচুরি, যত অবলার॥
মোহন বাঁশীর গানে, বৃন্দাবনে,
ব্রজাঙ্গনা মজালে।

৪০

মহড়া

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়॥
মনেরো তিমিরো যাবে মনোমিলনে।

চিতেন

সাজগো সাজগো সাজ, সাজ তুরিতে।
সুচিত্রে চম্পকোলতা, আরো ললিতে॥
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখিগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন॥
রাধা বোলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে॥

৪১

মহড়া

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাক একবার।
শুনরে কোকিলে শুন শুন,
বসি শুন মিনতি আমার॥
হরি হারা হোয়ে আছো মৌনে বসিয়ে,
মধুর রবো শুনি যে আর।

চিতেন

এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রোয়েছ কেন, ওরে কোকিলো॥
হরি গুণো গানে পিক কররে এখন,
শুনে প্রাণো জুড়াক শ্রীরাধার।

৪২

মহড়া

তুমি হে ব্রহ্ম সনাতন।
অপার মহিমা জনার্দন॥
শুন হে শ্রীমধুসূদন।
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুরারি;
ধরেছিলে গিরি গোবর্ধন।

চিতেন

কত রূপে কত লীলে করেছ,
ওহে দৈবকীনন্দন।
গোলকো তেজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে,
প্রকাশো করিলে বৃন্দাবন॥

অন্তরা

হায়, শিশুকালে শকটো ভঞ্জন
করেছিলে শ্যাম রায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডো উদরো মাঝে,
দেখাইলে যশোদায়॥

চিতেন

আরো এক, কুঞ্জ কাননে,
লোয়ে ব্রজ গোপীগণ।

মহা রসো কোরে অন্তর্ধান হোয়ে,
হোলে চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥

অন্তরা

হায় কাঞ্চন হোলো কাষ্ঠের তরি,
শুনেছি পুরাণেতে।
অহল্যা পাষাণী মানবী হোলো,
পদরেণু হইতে ॥

চিতেন

দ্রৌপদীরে যখন বিবস্ত্রা করে,
দুষ্টমতি দুঃশাসন।
বস্ত্রধারী হোয়ে, বস্ত্র দান দিয়ে,
কোরেছিলে লজ্জা নিবারণ ॥

অন্তরা

হায়, শুনেছি তুমি পাণ্ডব সখা,
বনমালী কালিয়ে।
রহিলে বলীর দ্বারেতে দ্বারী
প্রেমে বশো হইয়ে ॥

চিতেন

হিরণ্যকশিপু করিলে বধ
নৃসিংহরূপ মোহন।
প্রহ্লাদ ভক্তেরো কারণে দিলে
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন ॥

৪৩

মহড়া

তোমারি প্রেম কারণে।
আমি অবতার ব্রজভবনে ॥
রাই বুঝিয়ে দেখ মনে।
রাধা রাধা বলি, বাজায়ে মুরালী
গোচারণ করি বিপিনে ॥

চিতেন

বংশীধারী কহে কিশোরী,
এত বিনয় কর কেনে।
রাধে বিনোদিনী জানতো আপনি,
যত লীলা করি যেখানে ॥

অন্তরা

হায়, অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে,
রামরূপে অবতার।
জনক দুহিতা, তুমি হে সীতা,
গৃহিণী ছিলে আমার ॥

চিতেন

জটাধারী হোয়ে, তোমারে লোয়ে,
ভ্রমিলাম কাননে।
বন্ধন করিয়ে সাগর বারি,
বোধেছি লঙ্কার রাবণে ॥

অন্তরা

হায়, দেখ না ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ,
আসিয়া বৃন্দাবনে।
প্রেমে কত জনা, করে আরাধনা,
চাহি নে কারো পানে ॥

চিতেন

নিকুঞ্জ কাননে করি মহারাস,
প্যারি তোমারি সনে,
পরশুরামরূপে নিক্ষত্রি করি,
জানে তিন ভুবনে ॥

মহড়া

ওহে নারায়ণো, আমারে কখনো,
বলো না জানকী হোতে।
সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে ॥

দুর্জয় রাবণো, করিয়ে হরণো,
রাখিলো অশোকো বনেতে।

চিতেন

কহিছে রুক্মিণী, ওহে চক্রপাণি,
আসিছে পবনো সুতে,
রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো,
আমি তো হব না সীতে ॥

৪৪

মহড়া

ওহে কৃষ্ণ রাই কেন কৃষ্ণবর্ণ ব্রজে হোল।
কুবুজা কুৎসিতা নারী, হলো সুন্দরী,
হেমাঙ্গিনী রাধার শ্রীঅঙ্গ কালো ॥

চিতেন

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী,
বিনয় বাক্যেতে কয়।
কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ,
শুনো দয়াময় ॥
রাধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল শ্যাম
সেই রূপে প্রাণ সোঁপে তোমার প্রেমে
বৃন্দাবন ধামে ॥
গমনো কালেতে, কংসেরো রাজ্যেতে,
রাহু যেন আসি শশী ঘেরিলো।

অন্তরা

তাই জান্তে এসেছি, বলতে এসেছি,
বল্‌তে হবে তোমারে।
কিসে এমন হলো,
কিসে সেরূপ গেলো শ্যাম,
হায় হায় কি কালো দংশিলো রাধারে ॥

চিতেন

যেদিন হইতে মথুরাতে, করিলে পদার্পণ।
সেই হতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন ॥
তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হলো।
কুলে কালি, মানে কালি,
ছিল রূপ তাও কালি হলো ॥
কে যে তেজে তাম্বুল বেণী, ওহে চিন্তামণি,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিললো ॥

মহড়া

বঁধু কও দেখি কোন্‌ ভাবেতে তেজে
মধুপুর,
আইল অক্রুর, শ্রীবৃন্দাবনেতে।

চিতেন

বৃন্দে বলে কালাচাঁদ হে, করি নিবেদন।
কখনো দেখিনে বঁধু হে অক্রুরের আগমন ॥
বামাজাতি গোপ রমণী,
পলকেতে প্রমাদ গণি,
নিরানন্দ দেখি কেন নন্দের আলয়েতে।

৪৫

বিরহ

মহড়া

পীরিতের কি ধারো ধারো তুমি,
সে তো নবীনা নারীরো কাজ নয়।
কখনো রাজা, কখনো প্রজা,
কখনো বা যোগী হতে হয় ॥
সখি আঁখি মনো প্রাণো, সদা সাবধান,
ধ্যানো শবসাধনেরো প্রায় ॥

চিতেন

আগে মাথায় করিয়ে কলঙ্কের ডালি,
কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।
মান অপমানো,
সই রে নাহি থাকে কুলো লাজোভয়॥
দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন,
দাহন করয়ে নিজ কায়।

অন্তরা

সখী পীরিতেরো অনন্ত আকারে,
অন্ত নাহি তার, অন্তরে থাকে।

চিতেন

আগে অতি অন্তরঙ্গতা জানাবে তোমারে,
অথচ অন্তরে তাহা নয়।
অপরূপ অসম্ভব অবিরত হইবে উদয়,
সখি আঁখির নিমিখে, কতো বিভীষিকে
সুখে দুখে হাসায় কাঁদায়॥

৪৬

মহড়া

আমি তো সজনি জানি এই,
যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।
পরেরি সনে কোরে প্রণয়।
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয়॥

চিতেন

প্রেয়সীর দুখে যে নহে দুখী,
আপন সুখে সুখী সদায়।
তবু তার মুখ না হেরিলে সখি,
আঁখি জলে আঁখি ভেসে যায়॥

অন্তরা

আমারে যে জন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতে সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,
বিনা মূলে তার দাসী হই॥

চিতেন

কিঞ্চিৎ চাতুরী যাহার হেরি,
মনেতে বিবেক উপজয়॥

৪৭

মহড়া

গমন সময়েতে কেন কেঁদে গেলো মুরারি।
তাই ভাবি দিবা শর্বরী।
জনমের মত রাধারে কাঁদালে, সই,
বুঝি ব্রজে আসিবে না হরি॥

চিতেন

হরি কি আসিবে ব্রজে আর মনে সন্দেহ
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি পুনঃ
আসিত বংশীধারী॥

অন্তরা

হায়। দুটি করে ধরি যখন আমায়
যাই যাই বঁধু কয়।
তখন শ্যামের কমল বদন,
নয়ন জলে ভেসে যায়॥

চিতেন

এতই মমতা শ্যামের যাইতে মধুপুরী।
সজল নয়নে, উঠিলেন রথে,
বিধুমুখ মলিন করি॥

৪৮

মহড়া

রাধার বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি তোমায় শ্যাম রায়।
রাজার বেশ ধরেছ হে মথুরায়।
রাখালের বেশ লুকায়েছ বঁধু,
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়॥

চিতেন

এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম ভাগ্যোদয়
পাঠালেন কিশোরী, ওহে বংশীধারী
প্রতারণা কোরো না আমায়॥

অন্তরা

এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি,
বারদিলে গজ পরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ ঠাম শ্যাম,
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে॥[১]

ভবানী বণিক

বোঝা গেল না হরি,
তোমার কেমন করুণা।
জানা গেল নাহি নারীবধের ভাবনা।
ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনের বাসনা।
সকলি বিস্মৃতো, ব্রজনাথ,
হোল কি একোকালে
তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
ভেবে দেখ হে গোকুলে, করিলে কি লীলে,
তা কি তোমার পড়ে না মনে।
শ্যাম, নন্দ উপনন্দ সুনন্দ,
আরো রাণী যশোমতী
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ,
বলে লোটায় ক্ষিতি॥
আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
ব্রজেরো সমাচার
কি কর মাধব, সে অতি চমৎকার।
ব্রজ-গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা॥

২

সখি, কও শুনি সমাচার
আসিবেন সে হরি পুনঃ
কি ব্রজে আর।
হবে কি আমার হেন কপালে আবার
মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে
কিরূপ ব্যবহার।
না হেরে নবীন জলধররূপ,
আকুল চাতকি জান,
দিবানিশি আমার সেই শ্যাম-ধ্যান।

২ নিত্যানন্দ বৈরাগীর সঙ্গীতসমূহ সংবাদ প্রভাকরের ১ অগ্রহায়ণ, ১ পৌষ এবং ১ ফাল্গুন ১২৬১ সালের সংখ্যা হইতে এবং ৪৭ ও ৪৮ সংখ্যক গীত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার হইতে গৃহীত।

জীবন যৌবন ধনপ্রাণ,
হরি বিনে সকলই আঁধার।
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,
মধুপুর-সুখবিলাসী,
স্বরূপ কহ না যেখানে রাজার কোন মহিষী
ব্রজের চূড়া ধড়া নাকি ত্যজেচেন শ্যামরায়।
কুবুজা নাকি বামে শোভা পায়
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি,
কি দিলেন উত্তর তার॥

মহড়া

বঁধু কার কখন মন রাখবে।
তোমার এক জ্বালা নয় দু-দিক রাখা,
বল প্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচবে।
সমভাবে কেমনে রবে॥
সবে তোমার এক মন।
তায় করেছে প্রেমাধিনী দুঠেঁয় দু জন॥
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ,
হাসাবে কায় কাঁদাবে॥

চিতেন

এক ভাবে পূর্বে ছিল প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী, মন তারি ঠাঁই
রাখতে আমার অনুরোধ।
প্রাণ, তোমার প্রমাদ হবে,
সে করিবে ক্রোধ॥
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব করে কি,
দেশান্তরী করিবে॥

একবার কুঞ্জবনে
কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে কোকিলে।
মধুর কুহু ধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ,
জুড়াবে গোপীগণে।
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি
তমাল-ডালে॥
জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর,
রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্বাণ হয়,
কৃষ্ণ প্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণ নাম নিলে॥
বসন্ত সময় ব্রজে হল না বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে
কোকিলেরে কয়
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যে, কৃষ্ণপদ পঙ্কে,
অঙ্গ ফেলে আছে রাই ;
জুড়ায় কমলিনীর জীবন,
ব্যথার ব্যথী এমন কে,—
ওরে পক্ষ, হও স্বপক্ষ, দুখিনী বলে॥
আমরা দুখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বনে ত্রিভঙ্গ,
অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর,
শোন রে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন
ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে॥

মানিনী শ্যামচাঁদে রাধে কি অপরাধে।
কে গেল বলো গো শুনি এ বাদ সেধে
ঠেকিলাম আজু এ কি প্রমাদে।
ম্লান শশীমুখো কেন লো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদ ॥
এই দেখে এলাম,
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্যকৌতুকে,
ছিল গো রাই অতি পুলকে।
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল
উঠিল কি বাদানুবাদে ॥

৬

মহড়া

ভাল ভাল হে শ্যাম, কালা কলঙ্কী নাম,
থাক আমার ব্রজপুরে।
আমার কাজ কি আর সতী নামে,
মন যেন তোমার প্রেমে, সদাই রয় হে।
বলে বলবে কলঙ্কিনী হে।
ছলের জল নিতে এসে, না পারি কর্মদোষে,
তবে কালামুখ দেখাব শেষে কেমন করে

খাদ

প্রেমে না মজিলে, কলঙ্কিনী হলে,
পায় না তোমারে ॥

ফুকা

আমি প্রেমসাগরে ডুবেছি, কাল ভালবেসেছি,
সুখে আছি গোকুলে গোপকুলে
কেবল জ্বালায় কুটিলে।
তাই বলে কি কৃষ্ণ-নিধি,
সৃজিলে চিন্তজ্বর ব্যাধি,
আনতে মহাজন ঔষধি, ছিদ্র ঘট দিলে ॥

মেলতা

তোমার এই কি হে উচিত হয়,
অসাধ্য দায়, কি দায় ঘটালে ॥
হয়ে কলঙ্কী সতী হই কেমন করে ॥

চিতেন

কলঙ্ক ঘুচাবে শ্যাম বল্লে আমায় ॥

পাড়ন

তোমার দৈব কথা, পেলেম মনে ব্যথা ॥

ফুকা

তোমার এই কষ্ট তা দাসীর প্রেমের দায়
আমার কলঙ্কিনী নাম ঘুচাবে,
সতীত্ব সব জানাবে,
দেখাবে এই নন্দালয়।
শ্যামরায় মনে মনে সন্ধ হয়।
ব্রজে যারা সতী আছে,
তাদের গৌরব ভেঙ্গে গেছে,
আমার গৌরব রাখিতে পাছে,
তোমার গৌরব যায়

মেলতা

আছে সকল অঙ্গে আমার,
কলঙ্কের অলঙ্কার, কালাচাঁদ হে।
আমি ডুবেছি প্রেম কলঙ্কের সাগরে ॥

অন্তরা

প্রেম কলঙ্কিনী হলে কি শ্যাম পাওয়া যায়।
সতী নারী হয়ে হরি, ধ্যান করে কেও পায়
না তোমায়।

তার সাক্ষী গোলক ধামে, ছিল একজন
নারী বিরজা নামে,
উন্মাদিনী তোমার প্রেমে, হলো জলসই
তার ভাগ্যক্রমে।
শুন তার প্রমাণ বলি,
একদিন চন্দ্রাবলী
প্রেম কলঙ্কের ডালি নিলে মাথায়॥

চিতেন

কলঙ্ক হলো বলে পেলেম তোমায়॥

পাড়ন

যুগে যুগেতে শ্যাম, কৃষ্ণ কলঙ্কী নাম,
যেন বলয়ে শ্যাম আমার জগৎময়॥

ফুকা

যদি শুক্ল বস্ত্র কালি হয়,
উত্তম শোভা দেখা যায়,
শুনিতে কেমন চমৎকার।
আর এক প্রমাণ আছে তার।
প্রেমের দায়ে গগনচাঁদে,
কলঙ্কের দাগ পদে পদে,
পরেছি তাই মালা সাধে,
শ্যাম কলঙ্কের হার॥

মেলতা

এ দাগ জন্মে আর মিটবে না,
ঘুচালে ঘুচবে না, কালাচাঁদ হে।
যেন কলঙ্ক হয় জন্ম জন্মান্তরে॥[১]

রাম বসু

॥ সপ্তমী

মহড়া

তবে নাকি উমার তত্ত্ব ক'রেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে, শুন শুন তোমার মেয়ে
কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে,
কৈলাসে যাই বোলে।
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুখের কথা,
উমা সব শুনেছে॥
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

চিতেন

তারা হারা হোয়ে নয়নের,
তারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ
উমা কই॥
আমার সেই হারা তারা,
ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে,
মা মা, মা বোলে॥
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

---

১ ভবানী বণিকের ১, ২, ৪ ও ৫ সংখ্যক গীত 'বাঙ্গালীর গান' হইতে এবং ৩ ও ৬ সংখ্যক গীত 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান' হইতে গৃহীত।

ভাল হোক্, হোক্, ওহে গিরি,
যাই আমি নারী তাই, ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ॥

চিতেন

আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কতদিন।
দিনের দিন তনু ক্ষীণ,
বারি হীন, যেন মীন ॥
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে,
আস্তে তো যেতে হয়।
যেন না হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে,
এলো হি হিমালয় ॥
মুখে করি হা হা রব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এল জীবন দিলে।

২

মহড়া

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজ-রাজেশ্বর, হোয়েছেন জামাই ॥
শিব এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর
এখন নাই ॥
যারে পাগল পাগল বোলে,
বিবাহের কালে সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের শব, অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার ॥
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই ॥

চিতেন

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো,
সঙ্গে শিবো পরিবার ॥
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেলো।
আমার মা কৈ, মা কৈ, বলে উমা ঐ,
ব্যগ্রা হোয়ে দাঁড়ালো ॥
বলে তোমার আশীর্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীরো দুখো ভাবতে হবে নাই।

অন্তরা

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্,
সদাই হোতো মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ॥
দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি, যে সুখো হয়
আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি
জানিবে আর ॥
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হোয়ে বিভোর ॥
শুনে আনন্দময়ীর, আনন্দ-সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

অন্তরা

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয় ॥

চিতেন

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ,
কতদিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেল সম,
মম হৃদয়ে গাঁথা ॥
আমার লম্বোদর না কি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোনারো কার্তিক,
ধূলায় পোড়ে লুটাতো ॥
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই।

মহড়া

একবার আয় উমা,
তোমারে মা করি গো কোলে ॥
বিধুমুখে ওগো জননী,
ডাকো জননী বোলে ॥
তুমি তো ভাব না মা বোলে ॥
তোমা বিনে সে দুখো গেছে।
সে সব কথা, কব উমা, তোমারো কাছে।
বর্ষাবধি, পরে যদি, অঙ্গনে দেখা দিলে।

চিতেন

মেনকা কহিছে উমা তোমা বিহনে।
অন্ধকারো ছিল সবো, গিরি ভবনে ॥
ঘুচিল তিমির নিশাচর।
উমা মা আসি, পূর্ণ শশী, হইলে উদয় ॥

অঞ্চলে অঞ্চলের নিধি,
বিধি আনি মিলালো ॥

মহড়া

কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে ॥
শুনিয়া জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে ॥
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী,
কনক বরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকল পরা ॥
আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে ॥

চিতেন

গৌরী কোলে কোরে, নগেন্দ্র রাণী,
করুণা বচনে কয়।
উমা মা আমার, স্বর্ণলতা,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥
মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি,
পারি নে যে দেখে আসি ॥
আমি জীবন্মৃত হোয়ে, আশা পথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে ॥

অন্তরা

মরি ছি ছি ছি, একি কবার কথা,
শুনে লাজে মরে যাই।

তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই।
মাখে অঙ্গেতে ছাই ॥

চিতেন

তুমি সর্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ,
সে দুখো ঘুচাতে নারো ॥

মহড়া

ওহে গিরি, গা তুল হে,
মা এলেন হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয় ॥
কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য,
তায় তাচ্ছল্য করা নয়।
আঁচল ধোরে তারা,
বলে ছি মা, কি মা, মা গো, ও মা,
মা বাপের কি এম্‌নি ধারা ॥
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।

চিতেন

গত নিশি যোগে, আমি হে,
দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার, হারা তারা ধন
দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
বলে মা কই, মা কই, মা কই, আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে ॥

অমনি দু বাহু পশারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি আমি নয়।

অন্তরা

মা হওয়া যত জ্বালা।
যাদের, মা বলবার আছে, তারাই জানে।
তিলেক না হেরিয়ে, মর্মে ব্যথা পাই,
কর্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে ॥

চিতেন

তোমারে কেউ কিছু বলবে না,
দেখে দারুণ পাষাণ।
আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ ॥
তোমার তো নাই স্নেহ।
একবার ধর ধর, কোলে কর,
পবিত্র হোক্ পাষাণ দেহ ॥
আহা এত সাধের মেয়ে,
আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়।

॥ সখী-সংবাদ ॥

৬

মহড়া

মান কোরে মান রাখ্‌তে পারি নে।
আমি যে দিগে ফিরে চাই,
সেই দিগেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধর বরণে ॥
অতএব অভিমান, মনে করি নে ॥
আমি কৃষ্ণ-প্রাণা রাধা।
কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা।

হেরি ঐ কালোরূপ সদা,
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা দু নয়নে ॥

চিতেন

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দ, করি মান।
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ ॥
শ্যামকে হেরব না আর সখী।
বোলে চক্ষু মুদে থাকি ॥
সে রূপ অন্তরেতে দেখি ॥
কৃতাঞ্জলী, বনমালী,
বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥

৭

মহড়া

শ্যাম কাল মান কোরে গ্যাছে,
কেমন আছে, দূতী দেখে আয়।
কোরে আমারে বঞ্চিতে,
গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হোয়ে খণ্ডিতে মরি হরি প্রেমের দায় ॥
ছলে আমার মন ছলেছে।
আগে বুঝবে মন দূর থেকে।
(চোখে দেখে গো)
কয় কি না কয় কথা ডেকে ॥
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়, অপ্রণয়,
অমনি সেধো গো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায় ॥

চিতেন

সাধ কোরে কোরেছিলাম দুর্জয় মান,
শ্যামের তায় হলো অপমান।
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না রেখে মান ॥
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে,
রাগে রাগে গো,
পড়ে আছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে ॥
ছিল পূর্বের যে পূর্বরাগ,
আবার একি অপূর্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার, আদর ভুলে যায় ॥

অন্তরা

যার মানের মানে আমায় মানে।
সে না মানে, তবে কি কর্বে এ মানে ॥
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

চিতেন

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান।
সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান।
রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান, অপমান ॥
এখন মানান্তে প্রাণো জ্বলে।
জ্বলে জ্বলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ॥
আমার সেই কালো জলধর,
হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়।

৮

মহড়া

কর্তে রাধার মানো রক্ষে, উভয় পক্ষে,
যেন মানো রয়।

কোরে এ পক্ষে পক্ষপাত,
যে পক্ষে থাক রাধানাথ,
জানি প্রেম পক্ষে শ্যাম আমার বিপক্ষ নয়

মহড়া

শ্যামের আদর মাখা অঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ গো।
আদর বাড়ায় মান তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ ॥
আমরা যখন যে মান করি,
আছে তার পায়ে ধরাধরি,
সখী আজ কিছু রাধার আদর নূতন নয় ॥

চিতেন

সাধে কি সাধতে বলি মাধবে,
সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ।
এমন হয় গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সয়, অপমান ॥
সখী আমার মান গেল গেলো,
জান গেল গো
বংশীধারীর মান থাকে তো,
তা হোলেই ভালো

মহড়া

এ ত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি,
এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
শুনো শুনো, স্বরে কেনো,
অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে ॥
কৃষ্ণ বই, কে আর বসন্তে পারে সই,
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ॥

জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ॥
আরো পতঙ্গেরি মধ্যে,
কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ॥

চিতেন

বসন্ত আসিতে গোপীকার,
কেন প্রাণ জুড়ালো।
জ্ঞান হয়, ঋতু নয়, দয়াময়, মাধব এলো ॥
দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ।
মনেরো আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে,
ডাকিতেছে সই ॥
আরো কমলিনীর কমল, চরণে ধোরে,
সুখে গানো করে অলিপুঞ্জে।

১১

মহড়া

আছে খত নে পথে বোসে, কে রমণী সে,
শ্যাম কি ধারো কিছু তার।
হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালি ক'রেছিলে কোন্ রাজার ॥
প্রেমধার ধার তুমি কার ॥
খতে লেখা রয়েছে ওহে শ্রীহরি।
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী
মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই ঢেরা সই আর হবে কার ॥

চিতেন

ওহে গোবিন্দ, মনে সন্দ হোতেছে।
দিয়েছ দাসখত কোন্ রমণীর কাছে ॥

মহড়া

দেখব কেমন সুন্দরী কুবুজা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥

মহড়া

রাধার মান তরঙ্গে কি রঙ্গ।
কমল ভাসে, কুমুদ হাসে, প্রমোদ রসে,
ডুবেছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ॥

মহড়া

ভঙ্গি বাঁকা যার, সেই কি বাঁকা শ্যামে পায়
আমরা সোজা মন পেয়ে সই,
কৃষ্ণের মন পেলেম কই,
মিললো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায়॥

১২

মহড়া

প্রাণ রে প্রাণ।
নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ বাণ॥
বুঝি মানের অভিপ্রায়, মানচণ্ডীর তলায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে নর বলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ,
প্রাণঘাতকী সন্ধান॥
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ।
রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে খড়্গহস্ত হোয়েছ॥
ধোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল,
কর ছুতো লতায় কথায় কথায় অপমান॥

চিতেন

তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান,
যখন্ কোরেছ বাড়াবাড়ি।
তখনি জেনেছি, আজ হোতে,
প্রেম ছাড়াছাড়ি॥
তোমার ভালবাসা এতো নয়।
আমার প্রাণ জলাবে, দেশ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশয়॥
আমি সর্বত্যাগী হই, তোমার বাঞ্ছা ঐ,
তাই তো কোরেছ আজ এমন
সর্বনেশে মান॥

১৩

মহড়া

ঐ খেদ হয়।
তবু বল পুরুষ ভাল-মানুষ নয়॥
যখন দক্ষযজ্ঞে সতী, ত্যজে ছিলেন প্রাণ,
তখন মৃতদেহ গলায়,
গেঁথে রাখলেন মৃত্যুঞ্জয়॥

চিতেন

কথায় কথায় কোরে অভিমান,
তিলে কোরে বাজে তাল।
ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল॥
যদি পুরুষ পাতকী হবে।
তবে পাণ্ডবেরা, নারীর সঙ্গে
বনে কেন বেড়াবে॥
দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধোরেছিলেন ব্রজে রাধার পদদ্বয়॥

১৪

এ ভাবের ভাব করবে কতদিন।
তুমি প্রাণপণে মন জোগাও না,
পরিত্যাগো কর না,
আমি যেন হোয়ে আছি জালে গাঁথা মীন

॥ বিরহ ॥

১৫

মহড়া

ভাব দেখে করি অনুভাব,
ভাব বুঝি ফুরালো।
দিনের দিন রসহীন, হোলে প্রাণ,
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো॥
একি ভাব, গ্যাছে পূর্বের সে সব ভাব,
অভাবে ভাব মিশালো॥
তোমায় লোকে কয়, রসময়।
মিথ্যা নয়, সে রস পরের কাছে হয়॥
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।
তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি,
হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তি শতকেতে পাঠ এগুলো॥

চিতেন

সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রণয়,
নূতন নয় পরিচয়।
তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান,
বিরস বদন কেন হয়॥
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে।
ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে॥
চক্ষে রেখে চাও না পোড়া চক্ষে।
এখন সদাই বদন বাঁকা,
হোলে পর দেখা,
সে সব শশিমুখের হাসি কেমনে গেলো।

অন্তরা

প্রাণ যে মনে ভুলালে এ মনো আমার,
কই আর সে মন,
কেমন কেমন দেখতে পাই।
কোন্ পথে হারালে মন, ওরে প্রাণ
আমিও সেই পথে যাই॥
নাই তোমার এখন সে সুহাস্য, সুদৃশ্য বচন
কথা হয়, যেন কে কারে কি কয়,
প্রাণ সদাই অন্য মন
তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ।
ওরে প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান॥
কোন্ রাজ্যে ধান, কোন্ রাজ্যে বান॥
আমি হাজা প্রজা বোলে, জলে জ্বলালে,
আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো॥

মহড়া

তারে বোলো গো সখী,
সে যেন, এ পথে এসে না।
পোড়া লোকে মন দুষে দেয় গঞ্জনা॥

চিতেন

আকিঞ্চন সুতে, গলেতে গেঁথে,
পরেছিলাম প্রেমো হার।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে,
বিড়ম্বনা বিধাতার॥
সখী সে কোথা, আমি কোথা।
না জেনে, না শুনে, লোকে কয় নানা কথা॥

আমি পীরিত করিতাম,
প্রাণে প্রাণ সঁপিতাম,
তা বুঝি কপালে হোলো না ॥

১৬

চিতেন

প্রাণ বাঁধাতে কি করে প্রাণ,
মন বাঁধায় মজালে।
আমার প্রাণ, এক সমান, আছে প্রাণ।
তুমি রাগ কোরে পীরিতে ভাগ বসালে

১৭

মহড়া

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে।
আমি দেশে যাই মনো দেও ফিরায়ে ॥

চিতেন

মধুর প্রয়াসে আমি, আইলাম, তব স্থানে
নলিনী কেন মগ্ন হোলে মানে ॥
আশা না পুরায়ে দিলে মধু,
কেতকী কলঙ্ক কর শুধু,
মিছে দ্বন্দ্ব কোরে, জ্বলাও হে আমারে,
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে ॥

১৮

মহড়া

তোরে ভাল বেসেছিলাম
বোলে কি রে প্রেমে
আমার দুকুল মজালি।
দু মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি ॥

সই কি সে বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি।
কোরে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে, চোখে দেখে, ঠেকেছি ॥
যেমন মৎস্য মাংস ভোগী,
হোয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন
সেইটে ঘটালি ॥

চিতেন

পীরিতে মজিয়ে চিরদিন রব,
প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে কি বিড়ম্বনা ॥
আমি তোরি জন্যে হোলেম পরের বশ।
আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম,
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ ॥
আগে দেখয়ে বাড়াবাড়ি,
কল্লি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি ॥

পতি বিনে সই, সতির মান কই,
আর থাকে।
হায় আমি যেন হলেম সতী,
বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হ'য়ে কি কর্ম তার,
শিব ডরাতেন যাকে ॥
আমার হোলো যার মানে মান
সে কই মান রাখে।

ছি ছি কি লজ্জা, আই গো আই।
অন্য দিনের কথা দূরে থাক,
সর্বনেশের পর্ব কটা মনে নাই ॥
হোলেম পতির পরিত্যাজ্য,
থাকিতে না দেয় রাজ্যে সই,
আবার রাজার মসিল কালো
কোকিল ডাকে ॥

চিতেন

পতি পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হোলে দু'জনার, তবেই ধর্ম রয় ॥
হোলো তার আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্যা, কাজে ত্যজ্যা সই,
লোকের যেমন নদী চড়ার সনন্দ ॥
আমায় তাচ্ছিল্য দেখি তার,
দয়া হবে বল কার,
আমার পতি দত্ত জ্বালা, জুড়াবে কে ॥

অন্তরা

হায় আমার এ কথা, অকথ্য,
সত্যবাদী পতি আমার।
আমি আশা দিয়ে, গেল মন ছলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার ॥

চিতেন

ফুলে বন্দী হোয়ে ওগো সই,
মূলে হারা হই।
কত হব গো রমণী হোয়ে,
অনঙ্গ বিজয়ী ॥
আমার ধিক ধিক যৌবনে।
কাননের কুসুম যেমন সই,
ফুটে আবার শুখায়ে রয় কাননে ॥

আমায় পেয়ে কুলনারী,
বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরু সৈন্যে বেড়া চারিদিকে।

২০

মহড়া

তুমি কার প্রাণ।
হানো কার পানে নয়ন বাণ ॥
তোমার নূতন যে প্রিয়তম,
হয় নি তার কোন ব্যতিক্রম,
কেন পরের দেহে থেকে বধ পরের প্রাণ ॥

২১

মহড়া

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে প্রাণ
জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হলেম তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন অনল নির্বাণ ॥
হেরি চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ মাসের পথ।
কথা শুনে প্রাণ জুড়াবে দেখায় দণ্ডবৎ ॥

২২

মহড়া

আমার পর ভেবে সই, পর সকলি হোয়েছে।
আমি যে পর ভজিলাম সখী,
পরসুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী,
সে পরে পর ভেবেছে ॥
অতঃপরে না জানি কি কপালে আছে।

যার লাগি ঘরে হ'লেম পর, সে ভাবিল পর।
পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরম্পর ॥
পরম ভাজন, ছিল যে জন,
পরোক্ষে সে হাসিছে ॥

চিতেন

না বুঝে সই পরের প্রেমে মজলাম একবার।
সখি, সেই পরে, তারোপরে,
পরে, মন ছিল আমার ॥
সে পর বিধির সঙ্ঘটন, পরম ভাজন।
তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে দিলাম মন ॥
আবার তারে, অন্য পরে,
পর কোরে রেখেছে।

২৩

মহড়া

ওরে পীরিত তোর জ্বালা,
তবে ঘুচাতে পারি।
ত্যজে সুখ সাধ, লোক পরিবাদ,
যদি পরের মরণে আপনা না মরি ॥
ত্যেজে খল, এ সব ছল চাতুরী।
তোরে ভেবে পরের মত পর।
সোয়ে দুখ, বেঁধে বুক, একবার দেখব
হোয়ে স্বতন্তর ॥
হোয়ে আত্মসুখে সুখী, আত্মকুশল দেখি,
পর উপকারো জন্মে না করি ॥

চিতেন

তব অদর্শনে প্রাণ যদি তব ধ্যানে না থাকে।
পথে দেখা হ'লে যদি আর,
সখা বোলে না ডাকে ॥
যদি ভুলে পর দত্ত সুখ
নয়নে, হেরি নে, কোন লম্পট শঠের মুখ
যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো,
আপনার যৌবনো আপনি সম্বরি ॥

অন্তরা

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন,
আপনারে ভেবে আপনা।
মনে প্রাণে এক ঐক্যতা কোরে,
দূরে তেজি পরের ভাবনা ॥

চিতেন

পর কাতরা যেমন কুস্বভাব,
পরের দায়ে বাঁধা যাই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায় তারি
পিছু পিছু ধাই ॥
জানি প্রাণের অরি তুই রে প্রাণ।
দুখে দই, তবু সই, কথা কই,
রেখে সম্মান ॥
তুই তো পলাস্ আমায় ফেলে,
আমি তোরে ভুলে,
উলটে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি।

২৪

মহড়া

ওরে পীরিত তুই আমার
মনে থেকে ছেড়ে যা।
হবে নিবৃত্তি, এ সব প্রবৃত্তি,
আপনার মন হবে আপনি সোজা.

২৫

মহড়া

প্রাণ বোলো না প্রাণ।
ছি ছি হাসবে লোকে, আমার পাকে,
হবে শেষে অপমান ॥
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ ॥
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর,
যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন

নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
যে জন স্থূলে ভুল, এ ত্নটি আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা ॥
তেজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান
কর পূজ্য ধনের অপমান।

অন্তরা

যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ
বল তার সুখ।
আমায় কেন, বোলে প্রাণ,
বাড়াও দ্বিগুণ ত্নখ ॥

চিতেন

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়েছে সেদিন।
এখন হোলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ
কিন্তু কর্মে ফল হীন ॥
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
হোলো সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।

২৬

মহড়া

আমি প্রেম কোরে কি এত জ্বালা সই
কেউ বলে না ভাল, কলঙ্কিনী বই ॥
আমি তো কখনো কারো, মন্দকারী নই
তবে কেন বলে গো লোকে,
কুল-কলঙ্কিনী এলো ঐ ॥

চিতেন

যে দেখে আমারে সেই করে লাঞ্ছন।
প্রাণ জুড়াব কোথা, স্থান নাহি এমন ॥
ঘরে পরে করে গঞ্জনা,
আমি মরমেতে মরে রই।

২৭

মহড়া

পোড়া প্রেম কোরে কি, পোড়ায় আমার
জন্মটা গেলো।
যতদিন হোয়েছে মিলন,
একদিন নাই তার কান্না বারণ,
পোড়া শিবের দশা যেমন,
তাই আমারো হোলো ॥

চিতেন

পোড়া প্রেমে মনে হ'লো, কি দশা আমার;
কর্ম ভোগের যেমন কপাল আমার;
এমন খুঁজে মেলা ভার ॥
অস্থি ভাজা ভাজা হলো প্রেমের দায়।
ভেবে তোর গুণাগুণ, মনের আগুন,
জ্বলছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায় ॥
হোলে আমার সঙ্গে দেখা, সদাই মুখ বাঁকা,
তুই তো আর আর
লোকের কাছে থাকিস ভালো ॥

২৮

মহড়া

কও বসন্ত রাজা।
তোমার কোথায় সে প্রবাসী প্রজা।
একা গেলে একা এলে,
দুখিনীর কি কোরে এলে,
তোমায় কি সে পাঠায়ে দিলে,
আমায় করতে ভাজা ভাজা।
আনলে তারে, যে যার ধারে হে,
সব যেতো বোঝা বোঝা ॥
তুমি নারীর বেদন জানো না।
ঋতুরাজ হে, কেন তারে সঙ্গে কোরে,
আনলে না ॥
কর অবলার উপরে বল
ভাল খল, দিলে পুরুষের বদলে
নারীর সাজা।

চিতেন

গ্রীষ্মে, বরিযে, আশার আশ্বাসে,
প্রাণ রহেছে।
তার পর শারদ শিশির,
বিরহিনীর প্রাণে সয়েছে ॥
আমার প্রাণোকান্ত না আসায়।
ঋতুরাজ হে, তুমি হোলে
শীতান্ত কৃতান্ত প্রায় ॥
যে জন ধারে তোমার রাজকর, দেশান্তর,
তারে আনতে না পারলে না কোরে সোজা।

আছি বিরহ বাসরে,
নাথে রে ভেবে অন্তরে,
শর শয্যায় করিয়া শয়ন।
সংগ্রামে পাণ্ডবের হাতে,
ভীষ্মদেবের দশা যেমন ॥

চিতেন

দেখলে না সে চক্ষে, যত বিপক্ষে
প্রাণ দেখালে।
দেখ বনের পক্ষ, সে বিপক্ষ, বসন্ত কালে।
তুমি উল্টা বিচার কোরো না।
ঋতুরাজ হে, রাজাতে কি শুকো ধরে না
কোরে তোমার এ রাজ্যেতে বাস,
সর্বনাশ হোলো,
দুখিনীর ভাগ্যেতে দুকুল হাজা ॥

মহড়া

ঘর আমার নাই ঘরে।
মদন কর দিব কি তোমার করে ॥
ভূমি শূন্য রাজা তুমি,
পতি শূন্য সতী আমি,
আমার স্বামী গৃহশূন্য,
কাল কাটালেন পরে পরে ॥
সর সর পঞ্চশর হে, ডর করি নে ও ডরে
আমার জীবন শূন্য এ জীবন।
ঋতুরাজ হে, শূন্যগৃহে,
সৈন্য লয়ে কি কারণ ॥

৩০

মহড়া

সব জ্বালা জুড়ালো।
আমার প্রবাসী নিবাসে এলো।

তুমি পেলে তোমার প্রজা,
আমি পেলেম আমার রাজা,
এখন তুমি মদন রাজা,
কার কাছে কর লবে বলো ॥

৩১

মহড়া

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে,
এই কি সেই আসি ।
সুখের আশে, দুখে ভাসে,
বঁধু তোমারো প্রাণ প্রেয়সী ॥
বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপসী ।
সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময় ।
আশা দিয়ে আমারে যাওয়া উচিত নয়
আশা পথ চেয়ে আমি,
নয়নো নীরে ভাসি ।

এসো এসো এসো দেখি,
প্রাণ একি, দেখি চমৎকার ।
অপরূপ আগমন, হইল তোমার ॥
শশী সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন ।
[illegible] ॥
আমারে বঞ্চনা কোরে,
কোথা পোহালে নিশি ।

৩২

মহড়া

প্রাণ তুমি আমার নহ, আমার হবে কি ।
মনে মনে মনাগুণে,
আমি জ্বলবো বই আর বলবো কি ॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে
আদরে ডাকি ।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে ।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ,
তোমায় বলি নে ॥
ফলহীন বৃক্ষের কাছে,
সাধলে কাঁদলে ফলবে কি ।

চিতেন

আমায় বোলে, আমার ছোলে ।
প্রাণ দিলে পরেরই করে ।
তুমি বন্দী হোয়ে আছ তার,
প্রেমেরি ডোরে ।
বিরল পেয়ে তুমি তার মধু খেয়েছ ।
আপনি এখন রসহীন হোয়ে এসেছ ।
বিরস মুখের হাসি দেখে,
বল কে হবে সুখী ।

অন্তরা

তুমি ছিলে যখন আত্মবশে রসে জুড়াতে ।
পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে

চিতেন

আমার যা হবার হলো,
প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ ।
সন্ধি যোগে সে শশীর স্থিতি দণ্ড নয়
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ,
নিত্য গ্রহণ হয় ॥
সারা নিশি, সর্বগ্রাসী,
দিনে ও চাঁদমুখ দেখি ।

৩৩

মহড়া

এমন ভাব রাখা ভাব কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে॥
ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর,
এখন তার—ভাবে ভাবালে॥

চিতেন

স্বভাবে অভাব আজ, দেখি হে তোমার।
একি ভাবের দেখা, কও সখা, আবার॥
অনুরোধ প্রবোধিতে মন,
ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

অন্তরা

মরি মরি, তোমার ভাবে ঝুরি,
জান কত ছল।
মুখে বঁধু, যেন মধু, হৃদে হলাহল॥

চিতেন

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ রস, নাই এখন সে পাপ।
মন ভেঙ্গেছে, আছে,
লোক দেখা আলাপ॥
দেখে আঁখি হইত সুখী,
তা কি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে।

৩৪

মহড়া

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে।
তারো মৃতপতি, কেন বাঁচালে॥
বিরহিনীর দুখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা।
আমার পতি তো বুঝে না।
আমি একা, সে অদেখা,
শত্রু বুঝাব কি বোলে॥

চিতেন

অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।
একবার মনে করি, ভয়ে ভজব মৃত্যুঞ্জয়।
আবার ভাবি তায় কি হবে।
রতি তো পতি বাঁচাবে॥
একবার মদন, হোয়ে নিধন,
নারীর গুণে জীবন পেলে।

অন্তরা

মরি কি তার গুণের পতি।
কি গুণে বাঁচালে রতি॥
অসতীরে সুখী কোরে,
সতীর কোরে দুর্গতি॥

৩৫

মহড়া

রতি কি, তারো নিজ পতি,
করে না দমন।
পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন।
নির্বিবেকী নারী সে কেমন।
আমরা নিজপতি জনে,
চাইতে না দিই কারো পানে।
সে কেমনে, পতিধনে,
পরে সোঁপে, ধরে জীবন॥

চিতেন

বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহী যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ॥
যত কোকিল কুহরে, তত হানে পঞ্চশরে।
অবলারো প্রাণ মারে,
স্মর শরে, করে দাহন॥

অন্তরা

রতি যদি পতিব্রতা,
সে কোথা তার, পতি কোথা।
তবে কেন পঞ্চবাণ,
ফেরে গো আমাদের হেথা॥

মহড়া

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো॥
উপায় এখন কি করি বলো॥
তুমি এ পথে এলে।
করে কু-রব, কুচক্রী সকলে॥

দিনান্তরে দিতে দেখা,
বুঝি সখা, তাহা ঘুচিলো।

চিতেন

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানাজানি কানাকানি, করে রিপুগণ॥
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে॥
না পেলেম প্রাণ জুড়াইতে, লাভে হোতে,
দুকূলো গেলো॥

অন্তরা

[কোরে সাধ, এত পরিবাদ,
সয় কি অবলার
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর॥

চিতেন

না করিতে চুরি,
লোকে চোর বলে আমায়।
মনের কথা, মর্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায়॥
মনে মনাগুণ দয়।
যেন চোরের স্বপন সম হয়॥
গুমুরে গুমুরে বঁধু, হৃদের মধু,
হৃদে শুখালো।] [১]

[ ] ১ এই অংশের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অংশটিও পাওয়া যায়।

অন্তরা

সরমে, মরি মরমে, লোক যদি হাসে।
তোমার লজ্জায়, আমার লজ্জায়, বাঁচিন কি সে।

চিতেন

দুজনে গোপনে, যদি অন্ত কথা কয়।
অমনি চমুকে উঠে, অভাগীর হৃদয়।
ফুটিতে না পারি হায়।
যেন বোবার স্বপ্ন সম প্রায়।
মনাগুণো মনে জ্বলে, নয়ন জ্বলে,
হোয়ে প্রবলো।

৩৭

মহড়া

এই কোরে প্রেম গোপনে রেখো।
কেহ না জানে, তুমি আমি বই,
কথা প্রকাশ কোরো না কো ॥
দেখো প্রাণ, অতি সাবধানে থেকো।
তোমায় আমায় ঐক্যতা।
কেউ শুনে না যেন একথা ॥
পথে দেখা, হলে সখা,
নয়ন ঠেরে, সঙ্কেতে ডেকো!

চিতেন

পীরিতের আশা, আমার নিরাশা বা হয়
কুল নারী, সদাই করি, কলঙ্কেরি ভয় ॥
যৌবন করেছি দান,
তার দক্ষিণা দিলাম কুলমান ॥
না হই যেন অপমানী,
গুণমণি. দেখো হে দেখো।

অন্তরা

অবলা, আমি সরলা, তায় কুলবতী।
প্রেমের আশে, পাছে শেষে,
বলে অসতী ॥

চিতেন

মনের মিলনে, মনে থাকব দু জনা।
তুমি কেবা, আমি কেবা,
চেনা যাবে না ॥
যেন চাতকিনী প্রায়, প্রেম সমানে
থাকবে দু'জনায় ॥
মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখা,
লুকায়ে থেকো।

৩৮

মহড়া

এতদিনে সই, প্রাণনাথের আমার,
মান ভঙ্গ হোয়েছে।
ক'দিন কথা ছিল না,
ডাকলে দেখা দিত না,
সে আজ হাসি মুখে আসি বোলে গিয়েছে ॥
ছিল যে সন্দ, সে সব দ্বন্দ্ব ঘুচেছে ॥
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।
কোন্ ছল পেয়ে প্রাণ, কর্বে যে মান,
বাঁকা বাঁকির দফা রফা কোরেছি ॥
গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতে মনে তার,
এখন সে দোষে নির্দোষী বিধি কোরেছে।

চিতেন

ভালবাসি বোলে, ছলে কৌশলে
প্রাণনাথের হোতো মান।
নারী হোয়ে সদা প্রেমের দায়ে,
সাধতে যোতো প্রাণ ॥
যারে তিলেক, না দেখলে মরি।
তারে একলা রেখে, একলা থেকে,
ত্রিরাত্রি কি প্রাণো ধরিতে পারি ॥
যে জন হাসালে কাঁদালে,
চরণে ধরালে সই,
সে আজ আপন সাধে এসে,
সেধে গিয়েছে।

অন্তরা

আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়,
কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর।

নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই,
জ্ব'লে মরবো নিরন্তর।

মহড়া

আজ শুনলাম সই, প্রাণনাথের প্রাণনাথ
আছে একজন।
সময়ের দোষে হ'লো কর্ত্রী হোয়ে কর্তা সে,
এখন সেই ফাঁদে পড়েছেন·
আমার সাধের ধন॥
সদা তারি, আজ্ঞাকারী,
প্রাণনাথ এখন।
সে যে সিংহবেশে সর্বনাশী।
কল্লে গ্রাস প্রাণনাথকে,
যেমন রাহুতে গ্রাসে শশী।
নূতন কুমুদ পেয়ে সুখে
আমোদ করেন তিনি,
আমার প্রাণ চকোরের হোলো
হুতাশে মরণ॥

চিতেন

আমি জানি আমার প্রাণনাথ,
আমারি বশীভূতো।
এখন কেমন কেমন দেখি সই,
আগে জানি নে তো॥
যখন নূতন পীরিত আমার সনে।
এ পথে, বঁধু আসতো যেতো,
চেত না কারো পানে॥
এখন সে পথ পেয়ে সখা,
এ পথ গ্যাছেন ভুলে,
আমি মাসান্তরে ঘরে পাইনে দরশন॥

৩৯

মহড়া

শুনি, নাম বসন্ত, তার আকার কেমন।
তারে দেখলে পরে সই, মনের বেদনা কই,
মনে মনে এসে কেন, করে মন হরণ॥
যার জ্বালাতে জ্বলি তার, পাইনে দরশন
অদর্শনে অবলার দহিছে পরাণ।
না জানি কি প্রমাদ ঘটে, দেখলে সে বয়ান॥
কি দুরন্ত, সে বসন্ত সই, অশান্ত কোরেছে,
আমায় বিনে আলাপন॥

চিতেন

বসত করি রাজ্যে যার, জন্মে তার,
দেখা পেলেম না।
ভূপতি সতীর, দুঃখ ভাবলে না॥
কার করেতে যোগাই কর ভাবি নিরন্তর।
সদা স্মর হেনে শর, করে জর জর॥
সেনাপতি সঙ্গে ফেরে তার,
দুরন্ত কৃতান্ত সম অনঙ্গ মদন॥

অন্তরা

সখি যার প্রতাপে, অঙ্গ কাঁপে,
মনে কত ভয়।
এলো এলো, দেখা হোলো,
এমনি জ্ঞান হয়॥

চিতেন

ছিল যে রাবণসুতো ইন্দ্রজিতো,
ছিলো যারো নাম।
লুকায়ে সখি করিত সংগ্রাম॥

সেই মত কি ঋতুরাজ শিখেছে সন্ধান।
মায়ামেঘে কায়া ঢেকে, হৃদে হানে বাণ॥
লুকি যুদ্ধ করে কেন সে,
বিরহিনী নারীর প্রাণো করে বিমোচন॥

৪০

মহড়া

থাক্ রে প্রাণ,
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙা লোকের কুনীত মন্ত্রণায়,
সাধের পীরিত ভেঙে তুমি আছ তো ভাল॥
দেখা শুনো পুনঃ হবে হে,
ভাব আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্যের হাস্য কৌতুক।
পথে দেখা হ'লে, যাব চলে,
অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ॥
শেষে ভালবাসা ভাব, হোলো ভাল লাভ,
সুখের আশা কোরে,
প্রেমের আশা ভাঙিলো।

চিতেন

পীরিতেরো সাধ ঘুচাল,
দুখে জ্বলালে জীবন॥
না জানি কারণো, কও কেন,
ভাঙ্গলো তোমার মন॥
যা হোক ভালবাসিলে।
খেয়ে আমার মাথা, পরের কথায়
পীরিত ভেঙ্গে পালালে॥

কোরে আমার উপর রাগ,
রাখলে যার সোহাগ,
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল।

অন্তরা

তোমার পীরিতি কি রীতি,
হোল হে যেমন,
হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পলায়॥

চিতেন

বিবিমতে আমায় মজালে,
দুখে জ্বলালে হৃদয়॥
বুঝে দেখ মনে, দর্পণে, মুখ দেখা বই নয়॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান।
বল ভালবাসি,
সেটা কেবল দেঁতোর হাসি, হাস প্রাণ॥
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান,
পেলেম ভাল জ্ঞান
এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল।

৪১

মহড়া

বসন্তেরে শুধাও, ও সখি।
আমার নাথেরো মঙ্গল কি॥
নিবাসে নিদয় নাথো, আসিবে না কি॥
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
দিনে শতবার গণি দিন॥
আশারো আশায়ে আছি,
আশা-পথ নিরখি॥

চিতেন

প্রাণনাথো যে দেশে আমার,
করিছে বিহার।
এ ঋতুরাজার, তথা অধিকার ॥
তার শুভ সংবাদ যত।
সকলি তা জানে বসন্ত ॥
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হব সুখী

অন্তরা

হায়। কাল আসিব বোলে
নাথো করেছ গমন।
ভাগ্যগুণে যদি,
হোলো সে মিথ্যাবাদী, চারা কি এখন ॥

চিতেন

সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে
আমি কেমনে, ভুলিব তারে।
পতি, গতি, মুক্তি অবলার।
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার ॥
তাহারো কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি।

৪২

মহড়া

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন ॥
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন।
সে দহিছে বিনে প্রাণনাথ।
করহীনে করে করাঘাত ॥
এ সব লাঞ্ছনা হোতে,
বরঞ্চ ভালো মরণ ॥

চিতেন

প্রাণনাথো বিদেশো গমন, করিল যখন।
পিছে পিছে তার, গ্যাছে আমার মন ॥
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ।
বসন্তে হোতেছে অপমান।
জীবন রোয়েছে বোলে,
হোতেছি গো জ্বালাতন ॥

৪৩

মহড়া

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আশা-পথ নাহি চায় ॥
কি দিয়ে গো প্রাণসখি, রাখিব উহায় ॥
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার ॥
বাঁচি তো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ॥

চিতেন

গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হোলো কাল, এ যৌবন কাল ॥
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না ॥
আমি যেন রহিলাম,
তারো আসারো আশায়।

অন্তরা

হায়! ষোলকলা পূর্ণ হোলো
যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায় ॥

অন্তরা

কৃষ্ণপক্ষ প্রতি পদে হয়, শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষে হয়, পুন পূর্ণোদয়॥
যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়॥
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্য গমন প্রায়।

৪৪

মহড়া

বাঁচলাম প্রাণ।
বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়॥
আগে ভেবেছিলাম পীরিত,
ভাঙ্গলে যাবে প্রাণ,
এখন বাঞ্ছা করি যেন নিত্যি এমনি হয়।
একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে,
তার আতঙ্ক কি রয়॥
যখন আখণ্ড ছিল পীরিত।
ও আতঙ্ক হোত, ভঙ্গ হোলে হব
ও সুখে বঞ্চিত॥
দেখ ভাঙ্গা শঙ্কা যার, ভেঙ্গে গেছে তার,
আমি এক আঁচড়ে পেলেম প্রেমের পরিচয়॥

চিতেন

যে অনলে আমায় পোড়ালে
তুমি কি তায় পুড়বে না।
যার দোষে প্রেমো যাক ভেঙ্গে,
তাতো গড়ে না॥
প্রেমের ধাঁ ধাঁ থাকে যতদিন,
বাঁধা থাকতে হবে, সমভাবে হোয়ে
অধীনের অধীন॥

সখা নাই সন্দ,
আছে কি দ্বন্দ্ব,
আমার কোমল প্রাণে এখন
সকল জ্বালা সয়॥

অন্তরা

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্কে আছি,
আর তো ভোগায় ভুলবো না।
না এলে তুমি, এখন আর আমি,
পায়ে ধোরে সাধবো না॥

চিতেন

আভাঙ্গা পীরিতের যত ভয়,
ভাঙ্গলে তত থাকে না।
অলি দেখে কলির ত্রাস ধরে,
ফুটলে ছাড়ে না॥
এখন নই আমি সে কলিকে।
সকল দেখে শিখে, হোয়েছি হে
প্রেমে বড় ব্যাপিকে॥
পারি সাঁতরে সাগর, পার হোতে নাগর,
কাণ্ডারী যদি হে মনের মত হয়।

৪৫

মহড়া

ঘরের ধন ফেলে প্রাণ,
পরের ধনকে আগুলে বেড়াও।
নাহি জান ঘর বাসা,
কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীরে কোরে নিরাশা,
অসতীর আশা পুরাও॥

রাজ্য পেয়ে ভার্যের প্রতি,
কর্মেতে লুকাও।
যেমন প্রাণ হে সত্যবাদী,
আমি তেমনি কর্মনাশা নদী।
ছুঁলে পরে, কর্ম নষ্ট হয় যদি ॥
আমি সতী হোয়ে করি পতির মান্যমান্,
তুমি অন্য ফুলে গিয়ে জীবন জুড়াও ॥

চিতেন

দৈবযোগে যদি এ পথে,
প্রাণ কোরেছ আজ অধিষ্ঠান।
গেল দুখ্, হ'লো সুখ,
দুটো দুখের কথা বলি প্রাণ ॥
তোমার মন হোলো যার বাগে।
গেল চিরকাল ঐ পোড়া রোগে।
আমার সঙ্গে দেখা দৈব যোগাযোগে ॥
কথা কচ্ছ হে আমার সনে,
মন আছে সেখানে,
মনে কর সখা, পাখা পেলে উড়ে যাও ॥

৪৬

মহড়া

আমার পতিকে বোলো,
দেশের ভূপতি বসন্ত।
যদি সে রৈল দেশান্তর,
কে দিবে রাজার কর,
হবে কি কোকিল রণে প্রাণান্ত।
সে তো জানে না,
ঋতু বসন্ত কেমন দুরন্ত।
অঙ্গে দে কর, বলে দে কর।

বলি সর, ওরে পঞ্চশর,
আমারদের ঘরেতে নাই ঘর ॥
মদন যে করে করের তরে,
এমন আর কে করে,
ওরে সাধে কি করেছে শিব শাপান্ত।

চিতেন

ভার্যে রেখে মদন রাজ্যে সই,
কান্ত গেল দেশান্তর।
সজনি, দিবা রজনী, বিরহে দহে কলেবর ॥
যেমন আমার কপাল পোড়া।
তেমনি সই, হর কোপে ঐ,
অনঙ্গের সর্বাঙ্গ পোড়া ॥
মদন সেই পোড়ার ভয়েতে
পুরুষকে ধরে না সই,
এসে কামিনীর কাছে হোলো কৃতান্ত।

৪৭

মহড়া

যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোতে চায়।
আমায় সঁপিয়ে মদনে, সে রৈল সেখানে,
এখানে সতী মরে পতির দায় ॥

৪৮

মহড়া

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি, আর বলা হোল না ॥
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নিলজ রমণী বোলে, হাসিতো লোকে।

সখি ধিক থাক আমারে,
ধিক সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন

একে আমার যৌবনকাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময়ে প্রাণনাথ, প্রবাসে গেলো॥
যখন হাসি হাসি, সে, আসি বলে।
সে হাসি, দেখিয়ে ভাসি নয়ন জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন্ চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না।

অন্তরা

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে,
কাঁদিলাম সজনি।
অনাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি॥
একি সখি হোলো বিপরীত,
রেখে লজ্জার সম্মান।
মদনে দহিছে এখন অবলার প্রাণ॥

৪৯

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ,
কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশিমুখে,
কান্নাও আছে চোকে,
বচনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে॥
কোরে মান,
প্রেমের দুই পক্ষ সমান জানালে।
আমার এ পক্ষে, না কোরে বিপক্ষতা।
এক চক্ষে নিদ্রা যাও, আর চক্ষে জেগে রও
না পক্ষে দুই পক্ষে শীলতা॥
তোমার মানেতে নাই কৌশল,
না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়ন জলে।

চিতেন

মান তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে,
প্রাণ তো ভেঙ্গে বল্লে না।
আকারে ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
বুঝলাম যেমন মন্ত্রণা॥
আমায় নিগ্রহ কর্বে না কি নিদ্ধার্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য করলে প্রাণ,
আপনায় আপনি নও ধৈর্য॥
ওলো পূর্ণ চন্দ্রাননে, আধো আধো পানে,
আধো-চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে।

অন্তরা

তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান,
আজ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখ্‌লে সে মান,
ম'লে ও রাগ যায় না প্রাণ,
অথচ আমার প্রাণে সুদৃষ্টি॥
আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি॥

৫০

মহড়া

তোমার মানের উপরে মান কোরে আজ
মান বাড়াব।

আমায় আজ যেমন কাঁদালে,
পায়ে ধরে সাধালে,
আমি আজ তেমনি কোরে কাঁদাব ॥

চিতেন

প্রাণ যে কোরেছ নিদারুণ মান,
সাধতে গেল আমার প্রাণ।
কোন দুষি নই, তবু সকল সই,
প্রেম সম্বন্ধে মান্যমান ॥
কেমন কোরেছ পীরিতে পদানত।
সঁপিলাম ধন-প্রাণ,
তবু মন পাইনে প্রাণ,
অপমান প্রাণে সব কত ॥
কর কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন কপাল মন্দ,
গোবিন্দ জুড়ান তো প্রাণ জুড়াবো ॥

মহড়া

হায় রে পীরিতি
তোর গুণের বালাই নে মরি।
যখন যারে পাও,
তার কি সুখো দুখো সব ঘুচাও,
তুল সিংহাসনে কর পথের ভিখারী ॥
তোমার তরে, সদা ঝোরে হে,
কি পুরুষ কি নারী।
একবার যার সঙ্গে যার পীরিত হয়।
সে তার নয়নতারা, আর কিছুই নয় ॥
ভাবি জন্মে যারো মুখো না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি

চিতেন

কি ক্ষণে, এ প্রেম লাগলো প্রেম,
আমি জন্মে ভুলতে পারি নে।
দুখো ভোগ, অনুযোগ,
তবু না দেখলে তো বাঁচি নে ॥
কেমন কোরে রেখেছিস আমায়।
তারে না দেখলে প্রাণ,
আর কোথাও না জুড়াও ॥
মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে না,
আমি চতুর্বর্গ ফল সেই চাঁদ বদন হেরি ॥

অন্তরা

হায়, প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি,
তিলেকো না হেরে, বিরহ বিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি ॥

চিতেন

প্রেম সুধা পানো, যে করে,
তারো নাহি থাকে কোন খেদ।
স্বপক্ষ, বিপক্ষ, প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ ॥
নাই উঠে বসতে শক্তি যার।
শুনে প্রেমের কথা, যাও সাত সমুদ্র পার ॥
প্রেমে বোবার কথা শুনে, কানায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি ॥

৫২

তোরা বল দেখি সই,
পুরুষের মান যায় কেমন কোরে

আমার মান সমাধান,
কোরে পায় ধোরে যে সই।
আমি নারী হোয়ে কোন মুখে
তায় সাধা পায়ে ধোরে ॥

চিতেন

ভেবেছিলাম মনে, মজে মানে,
আপনার মান বাড়াই।
তাহে একদিগে মান, রাখতো গো সই,
দু দিগ বা হারাই ॥
যখন মান কোরে, মানিনী হোয়ে,
রই গো মনের দুখে।
কতবার,
তখন প্রাণনাথ আমার,
মানের দায়ে, ব্যাকুল হোয়ে,
প্রাণ দিয়ে মান রাখে ॥
এখন আমার মান, ভেঙ্গে দিয়ে,
উলটে মান কল্লে সই,
এবার তার মানের মান, থাকে কিসে,
তাই ভাবি অন্তরে ॥

৫৩

মহড়া

যার ধন তারে দিলে প্রাণ বাঁচে প্রাণসখি
হোয়ে পরধন গচ্ছিতে,
প্রাণ যায় পরীক্ষে দিতে,
যেমন অনলে পোড়ালে রাম জানকী ॥
যে কণ্টক, আমার পাড়ার লোক,
কবে কে, করে কলঙ্কী।
আশায় আশায় প্রাণ রেখে এত কাল।
মানে না কালাকাল, যৌবনের যৌবন কাল,
আজ আমার অকালেতে সকাল।
আমার অঙ্গে কাল, সঙ্গে কাল,
তায় কাল এ বসন্ত কাল,
হোলো তিন কালে নারী সারা চারা কি ॥

চিতেন

পেয়েছি পতিদত্ত নিধি,
তায় বিবাদী বিপক্ষ ছয় জন।
মন্মথ না হয় সম্মত,
সদাই সে আকুল করে মন ॥
হোলো এই তো সুখ সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্মহীন, স্বপতি পরাধীন,
যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায় ॥
এই উভয় সঙ্কটে সই,
দুদিগে সারা হই,
পতি ভাবলে না সতীর দশা হবে কি ॥

৫৪

মহড়া

সখি বলব কি এ দুখিনীর এ জ্বালা
বারো মাস।
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হোয়েছে যেন সীতের বনবাস ॥
যদি কই, তবেই সই, সর্বনাশ।

চিতেন

ভাল শুভক্ষণে, তাতে আমাতে,
এক রজনী দেখা সই।
তারপর আমিই বা কে, সেই বা কে,
কর্মে পাওয়া গেল কই ॥

কেমন হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার।
চক্ষে দেখতে পাই, দুঃখে মোরে যাই,
করে না সাপক্ষ ব্যাভাব॥
আমি লজ্জা খেয়ে যদি, করি সাধাসাধি,
উল্‌টে সে করে আমায় উপহাস॥

অন্তরা

সই, আগে ছিলাম সুখে, নাবালিকে,
এখন সে কলিকে ফুটলো।
মধুমতী হেরে বঁধু বিগুণ,
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে উঠলো॥

চিতেন

পূর্ণ ষোলকলা, ষোড়শীবালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।
কৃষ্ণপক্ষে যেন দিনের দিন,
হচ্ছে কলানিধি ক্ষয়॥
আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন।
কল্লে না বক্ষে, সঁপে বিপক্ষে,
আগুলে বেড়ায় পরের ধন॥
রেখে একলা অবলারে, বিরহ বাসরে,
করে সে পরের সঙ্গে সহবাস॥

৫৫

মহড়া

প্রাণনাথেরে প্রাণসখি
তোমরা কেউ বুঝাও॥
আমি বোল্লে তো শুনবে না,
স্বভাব দোষ ছাড়বে না,
বলবো না কোথা যেও না যেও।
যৌবন যায়, একবার তায় শুনাও॥

কেমন পড়েছি বিষ-নয়নে তার।
ফুটল এ মুকুল, না হয় অনুকূল,
ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার॥
থাকতে বর্তমানে পতি, সতীর এ দুর্গতি,
পাবতো সকল জ্বালা ঘুচাও।

চিতেন

বুঝলাম মনে মনে, কোকিলের গানে,
ডুবলাম কলঙ্কে এবার।
তেজলাম সকল সুখো ভোগে যায়,
মোজলাম বিচ্ছেদে তাহার॥
আমি সাধে কি সাধিনে গো তায়।
দেখলে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়,
সে যেন চোখের মাথা খায়॥
হোলে কি গুণে পরের বশ,
ছেড়ে সে ঘরের রস,
গোপনে দুটো কথা শুনাও॥

৫৬

মহড়া

মান যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে।
কুলবালা, এ অবলা,
শেষে ভেবে কি প্রাণ যাবে॥

চিতেন

পীরিতে মজাতে সখা, দেও হে দেখা,
দিনে শতবার।
ক'রে প্রাণোপণ, দিয়ে মন,
মন জোগাচ্ছ আমার॥
জানি পুরুষ পাষাণ অতি নিদয়।
প্রাণ রমণী আমি করি কত ভয়॥

আমার এ প্রাণ, তোমায় দিলে প্রাণ,
শেষে আমারো কি হবে ॥

৫৭

মহড়া

যে কোরেছে যাহারো সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ॥
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষগুণ,
না করে বিচার ॥

চিতেন

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন, কোরেছে হরণ ॥
মান অপমান দেখ না,
দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার।

অন্তরা

ওরে প্রাণরে, গরিমা নাহিক প্রেমিক দেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ॥

চিতেন

গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় তুথি।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি ॥
দিনান্তরে দেখা না হোলে,
মনপ্রাণ দহে দোঁহাকার ॥

৫৮

মহড়া

তোমার প্রেম হোতে প্রাণ,
বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।
পীরিত হোলো আর ফুরালো,
চোকে দেখতে দেখতে গেলো,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে বসেছে ॥

৫৯

মহড়া

ছিলে প্রাণ যে দেশে,
সে দেশে কি বসন্ত আছে।
যত এদেশের কোকিলে,
আমায় স্থির হোতে না দিলে,
সেখানে কি তেমনি কোরে,
ডাকতো তোমার কাছে ॥

৬০

মহড়া

আমার প্রেম ভেঙ্গে প্রাণ,
কার প্রেমে সঁপেছ।
এমন রসিকা, নারী কোথা পেয়েছ ॥
বদন তুলে কথা কও হেসে,
প্রাণ বুঝি আভাসে।
তুমি ভালবাস কি, সে ভালবাসে ॥
তুমি যেমন, সে কি তেমন,
তুই তুজনে মিলেছ ॥

৬১

মহড়া

কার দোষ দিব কপালেরি দোষ আমার।
যেমন প্রাণনাথ, প্রাণে দেয় আঘাত,
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
আছে স-পক্ষ রে, বিরহী জনার ॥

করে অঙ্গে যে রঙ্গ, প্রকাশিতে লজ্জা পাই।
অঙ্গে কর দিয়ে, কর সাধে গো সদাই ॥
ভয়ে পুরুষে না ধরে, নারী বধ করে সই,
এমন মেয়েমুখো রাজার রাজ্যে নমস্কার ॥

চিতেন

সময়েরি গুণ সখি রে,
করে হীনজনে অপমান।
কোথা গো জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি,
হেন স্থান।
একে দুঃসহ বিরহ, নির্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কালগুণে কাল বসন্ত উদয় ॥
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন, অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার ॥

অন্তরা

সই আমি যার, সে আমার ভেবে
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন,
সে আমার কাল হোলো ॥
তবে মরণ ভালো।

চিতেন

প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন,
গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার,
এমন কে আছে আমার ॥
হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল।
আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল ॥
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো সই,
কালা কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥

৬২

মহড়া

যাক প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে,
পতি নিন্দে হয়।
আমি মরি, সহচরী, করিনে সে ভয় ॥
দেখ আমি মোলে কত শত নারী
মিলবে তার।
সখি সে বিনে, কে আছে গো আমার ॥
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে,
কে দুষবে তারে সই,
আমার পূজ্যধন বই তো তেজ্যধন নয় ॥

চিতেন

গেল গেল, কুলো কুলো, যাক কুল,
তাহে নই আকুল।
লোয়েছি যাহার কুল,
সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন আমায়।
অকূলের তরী, কূল পাব পুনরায় ॥
এখন ব্যাকুলা হোয়ে কি,
দুকূলো হারাবো সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥

৬৩

মহড়া

এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চাক না চাক, সখা সুখে থাক,
কেন দেখা দিয়ে, একবার ফিরে গেল না ॥

চিতেন

জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ,
যদি নাহি এল নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে ॥
আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
তরু সমূলে শুখালো, শেষে এই হোলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না।

৬৪

মহড়া

কাল বসন্তের হাতে,
যায় বা সতীত্ব সৌরভ।
যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ,
তায় বা করে গো আঘাত,
কত সই গো সই মূহু কুহু রব ॥

চিতেন

শিশির নিশির যন্ত্রণা,
সই এ হোতে ছিল তো ভালো।
বসন্ত, হোয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো
মনের কথা কই এমন কে আছে।
দেশের রাজা যিনি, নারী বধেন তিনি,
তবে আর দাঁড়াব কার কাছে ॥
আসি সপ্তরথি মেলে আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব ॥

৬৫

মহড়া

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥
সে যে গিয়েছে দূরদেশ।
আছি কি মরেছি, করে না উদ্দেশ।
পতি হোয়ে সঁপে গেল, মদন দুরন্তে ॥

চিতেন

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে, প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ ॥
জানো না কি কমল কলি, ফুটিবে মাসান্তে।

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো না কি তার দয়া, রমণী রতনে ॥

চিতেন

কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন দান,
দেখিয়া সুলোক ॥
করে করে কোরে সমর্পণ।
তারে বল্লেন, সুখে কোরো হে পালন ॥
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে ॥

৬৬

মহড়া

কও দেখি প্রেম কোরে,
প্রেমেরি মান থাকে কিসে।
তুমি তো, প্রেমে পণ্ডিত,
কত প্রেম কোরেছ এই বয়সে ॥

চিতেন

বাসনা করেছি মনে হে, করিব পীরিত।
অপমানের ভয়ে প্রাণ, সদা সশঙ্কিত ॥

সাধে পাছে রটে, পরিবাদ।
ডুবিবে অবলার কুল, এ বড় প্রমাদ॥
হোয়ে প্রেমাধিনী, অপমানী,
না হই যেন শেষে।

৬৭

মহড়া

এ বসন্তে সখি,
পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে।
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চ বাণেতে॥
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ,
হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ॥
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে।

পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ,
বিরহী রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন॥
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর।
রাজা পঞ্চশর।
অঙ্গে হানে পঞ্চশর॥
তাহে ঊন-পঞ্চাশত, মলয়-মারুত সই।
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চ যোগেতে॥

অন্তরা

সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,
তার কিরণেও দহে প্রাণ॥

চিতেন

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের সে প্রধান।
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি,
পঞ্চম দুখেতে প্রাণ॥
যদি দ্বিপঞ্চদিগেতে চাই, পঞ্চ রিপু পাই।
পঞ্চ সহকারি নাই॥
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চতপাতে।

অন্তরা

সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা খাণ্ডব কানন,
জ্বালায়ে ছিল যেমন।
তেমতি এ দেহ জ্বলাচ্ছে সখি,
বসন্তের চর পঞ্চজন॥
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে,
করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদী, হয় গো আসি,
প্রতিবাসী পঞ্চজন॥
বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে, প্রাণে সয়েছে,
এ পঞ্চ কদিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না,
সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে।

॥ সখী-সংবাদ ॥

৬৮

মহড়া

ওহে, এ কালো, উজ্জলো, বরণো,
তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্মিলে॥

যে বলে, সে বলে, বলুকো কালো।
আমার নয়নে লেগেছে ভালো॥
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পুজিতাম জবা বিল্বদলে॥

চিতেন

আরো তো আছে হে, অনেকো কালো,
এ কালো নহে তেমন।
জগতের মনোরঞ্জন॥
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা।
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা॥
জনমের মত ঐ কালো চরণে,
বিকায়েছি, যে বিনিমূলে॥

অন্তরা

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এই তো, জ্ঞান ছিলো।
সে কালোর কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো॥

চিতেন

এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া,
সুন্দরো নাহি আর।
কালো রূপ জগতের সার॥
ত্রিলোকে এমন আর, নাহি কো হেরি।
ওরূপের তুলনা কি দিব হরি॥
কালোরূপ আলো করে হে সদা,
মোহিতা হোয়েছে সকল॥

অন্তরা

একে কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ।
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন॥

চিতেন

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিল হে দৃষ্টান্ত স্থল।
কালো তো নীলকমল॥
সে কালোর কালত্ব দেখেছ সবে।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে না ভেবে॥
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবন মণ্ডলে॥

৬৯

মহড়া

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারি নে স্থির নির্ণয় যে করিতে॥
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি,
নির্মলো যমুনা জলেতে।

চিতেন

নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি, আজ একি দেখ দেখি॥
জলে কি এমনো, দেখেছো কখনো,
বল দেখি ওগো ললিতে॥

অন্তরা

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলো মাঝেতে।
প্রস্ফুটিতো তমালো, বৃক্ষ যারো কালো,
ঐ ছায়া কি ইথে॥

চিতেন

আরো সখি কালোচাঁদ কি আছে।
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে ॥
বল দেখি সখি, কালো চাঁদ কি,
উদয় হয় দিবসেতে ॥

৭০

মহড়া

ওগো, চিনেছি চিনেছি, চরণো দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে ॥
যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে, কলঙ্কিনী বলিয়ে ॥

চিতেন

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আ মরি সই ॥
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

৭১

মহড়া

ওগো কৃষ্ণ কথা কবে যদি, ধীরে ধীরে কও,
কেউ যেন না শোনে।
ও নামে বিপক্ষ বহু আছে এখানে ॥
কহিতে বাসনা থাকে,
বোলো আমার কানে কানে।

চিতেন

আলস্যক্রমেতে, ভ্রমেতে, করি কৃষ্ণ রব।
ও নামেতে খড়্গহস্ত, আমার প্রতি সব
হিরণ্যকশিপু রাজ্য, হয়েছে এই বৃন্দাবনে ॥

৭২

মহড়া

দেখ কৃষ্ণ তুমি ভুল না।
আমি কালো ভালবাসি বোলে,
আমায় ভাল কেউ বাসে না ॥
আমারে শ্রীচরণে ঠেলো না।
নাহি কোন সম্পদো আমারো,
কেবল দিবা নিশি ঐ ভাবনা ॥

চিতেন

আমি তব লাগি, সর্বত্যাগী,
হোলেম কালাচাঁদ।
রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ ॥
আমারে যে বলে শ্যাম,
এমন দুখের দোসর কেউ মেলে না ॥

৭৩

মহড়া

মথুরার বিকিতে যেতে গো বড়াই।
ভালো আর কি পথে নাই ॥
জানতো এ পথের দানী, লম্পটো কানাই।
যারে ডরাই তাই ঘটে,
অনিলে তারি নিকটে,
আপন জোরে যৌবন লোটে,
না মানে দোহাই ॥

চিতেন

কি করিলে, কি করিলে, আনিলে কোথায়
দাঁড়ায়ে কে গো, কদম্ব তলায় ॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ছাঁদে,
না জানি কি বাদ সাধে,
মরি যারো পরিবাদে, ঘটে পাছে তাই ॥

৭৪

মহড়া

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কে বোলেছে
ব্রজকিশোরী ॥

চিতেন

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই,
শুধাই গো তোমায় ॥
মণিহারা ফণিপ্রায়, মাধব তোমার।
প্রিয় দাসী বোলে বদন তুলে,
চাইলে না একবার ॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,
দেখো মুখো, ফাটে বুকো, আ মরি মরি ॥

৭৫

মহড়া

কে সে জন,
নারী দ্বারে করিছে রোদন ॥
কোথা হোতে এসেছ,
তার কি যে প্রয়োজন ॥
আ মরি মরি, কি রূপের মাধুরী।
শুধালে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন ॥

চিতেন

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়,
শুন ওহে যদুরায়।
দ্বারের সংবাদ কিছু, নিবেদিই তোমায় ॥
দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার ॥
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ॥

৭৬

মহড়া

আর নারীরে করি নে প্রত্যয়।
নারীর নাই কো কিছু ধর্মভয় ॥

অন্তরা

নারী মিলতে যেমন, ভুলতে তেমন,
দুই দিগে তৎপর।
মজয়ে পরে, চায় না ফিরে,
আপনি হয় অন্তর ॥

চিতেন

উত্তমেরে ত্যজ্য ক'রে অধমে যতন।
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ পথে গমন
তার প্রমাণ বলি প্রাণ,
নলিনী তপনে ত্যজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধুবিতরয়

৭৭

মহড়া

একবার বিচ্ছেদ কোরে প্রাণ,
তোমার মন বুঝব হে।
তোমার মন যদি খাঁটী হয়,
বিচ্ছেদ জ্বালা সোয়ে রয়,
তবে দুটি মন একটি কোরে থাকব হে ॥

অন্তরা

ওহে প্রাণনাথ হে।
বিচ্ছেদের পর মিলন পর,

সে প্রেমে বাড়ে সুখোদয়।
গ্রহণান্তে যেন শিশির কিরণ,
সুবর্ণ দাহনে সুবর্ণ হয় ॥
জানি যত সরল ভাব,
তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ,
ওরে প্রাণ,
কুটিল স্বভাব গুণে অভাব ঘটাবে ॥

৭৮

দেখি দেখি তোর খেদে,
বাঁচে কি না বাঁচে প্রাণ।
তুই তো যা এখন, ফিরে দিয়ে মন,
তোরে সাধতে যাই তো
তখন করিস অপমান ॥

৭৯

মহড়া

তবে,
কি হবে সজনি
নাথো মান কোরে গেলো।
প্রাণ সই,
আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলতে হোলো ॥

চিতেন

বিধিমতে প্রাণোনাথেরে করিলাম বারণ।
কোরো না কোরো না, বধু প্রবাসে গমন ॥
সে কথা না শুনে প্রাণোনাথ,
অকালে সকালে প্রেমে হানলে বজ্রাঘাত।
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধলাম তারে,
তবু না রহিলো ॥

৮০

মহড়া

এমন প্রেম কোরে একদিন,
চিরদিন কে বিচ্ছেদের বোঝা ববে।

চিতেন

দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি,
ক্ষান্ত আছি পীরিতে।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ,
বিচ্ছেদের সঙ্গেতে ॥
মনে ঐক্য আছে, ঋক্য গেছে মিটে
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়,
যাই নে তারো নিকটে ॥
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস,
মিছে ধোরে বেঁধে পীরিত ঘটাবে ॥

৮১

মহড়া

ওগো ললিতে গো,
তোরা দেখে যা গো,
রাই কেন এমন হোলো।
কইতে কইতে কৃষ্ণকথা,
এলো খেলো স্বর্ণলতা
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে,
আছে কি মোলো ॥

৮২

মহড়া

ডুবে শ্যাম সাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাই রাধার ভাগী কে হবে।

ধরাধরি কোরে তোলো,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো,
হরি ধ্বনি শুনে ধনি, উঠে দাঁড়াবে ॥

৮৩

মহড়া

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি সেই প্রেমের বশে,
প্রেম-রসে তুষতে প্রাণ ॥

৮৪

মহড়া

কেবল কই কথা লোকলজ্জাতে।
আমার যৌবন ধন, গিয়েছে যখন,
সখা তুমিও গিয়েছ আমার সেই পথে

৮৫

মহড়া

কোকিলে কর এই উপকার।
যাও নাথেরো নিকটে একোবার ॥
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিঠুরো নাগরো আছে যথায়।
পঞ্চ স্বরে গানো শুনাওগে তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী,
অবশ্য মনে হইবে তার ॥

চিতেন

বিরহী জনারো, অন্তরে হানো,
কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর ॥

একলা অবলা আমি বালা।
আমারে যেরূপ দিলে জ্বালা ॥
তাহারে তেমতি পার হে জ্বলাতে,
প্রশংসা করি তোমার ॥

অন্তরা

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথো,
কোকিল বুঝি নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত,
বসন্ত সময়ে নিবাসে ॥

চিতেন

কিম্বা কোকিল আছে, নাই তারো,
সুস্বর তব সমান।
কু-রবে, বুঝি হানতে পারে না বাণ
অতএব বিনতি করি এখন।
কোকিলে তথায়ে কর গমন ॥
তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে প্রাণ আমার ॥

৮৬

মহড়া

সে যেন, এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা ॥

চিতেন

শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে,
জলেতে নাহি জুড়ায়।
বিষপ্রায়, যদি চন্দন মাখি গায় ॥
শেল সম হোলো, কোকিলের গান।
মলয় মারুত অগ্নি সমান ॥

এ দেশের, এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,
পুন পদার্পণ হবে না ॥

৮৭

মহড়া

এই বড় ভয় আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেমধন,
শেষে হাসবে শত্রুগণে ॥
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানি নে ॥
প্রেম-সুধা আস্বাদন,
সদা করিতে চাহে পোড়া মন,
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো, দিব হাতো,
ফণির বদনে ॥ অথবা
বিচ্ছেদ কণ্টক আছে, ফুটে পাছে,
কমল চরণে ॥

চিতেন

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আশে, মজে শেষে, কুল বা হারাই ॥
একে তরুণো তরী,
তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী।
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো
দেখ যেন ডুবে মরিনে ॥

৮৮

মহড়া

কে তুমি তা বলো।
এলে প্রেম বাজারে, যৌবন ভরে,
হ'য়ে চলো চলো ॥

চিতেন

শশিমুখি, তোমায় দেখি, মৃগ-নয়নি।
কোরে পদার্পণ, পরের মন,
হরো ইঙ্গিতে ধনি ॥
প্রিয়ে চেয়ে চিতো হরিলে আমার,
ঢেকে বদনে অঞ্চলো।

৮৯

মহড়া

এমন ভাবিক নাবিক দেখি নাই।
না হোতে পার, যমুনার,
মাঝখানে বা কুল হারাই ॥
কি হবে মনে ভাবি তাই।
একি জ্বালা কালা কর্ণধার ॥
হোলো প্রাণ বাঁচানো ভার।
কাঁপে তরঙ্গে অঙ্গ, ও করে রঙ্গ,
আমায় বলে ধর রাই ॥

চিতেন

তুলে তরণীর উপর, নটবর,
করে কত ছল।
বলে দেখিছ কি, রাই, যমুনা প্রবল ॥
তুমি প'রেছ রাই নীলবসন।
মেঘ ভেবে বাড়ে পবন ॥
বলে তরঙ্গের মাঝে, উলঙ্গ হোতে,
একি লজ্জা আই গো আই ॥

চিতেন

তরি করে টলোমল, উঠে জল,
হেরে হারাই জ্ঞান।
এ সময় বলে সই, কই পশরা দান ॥

আমি ভেবে হোয়েছি আকুল।
অকূলে বুঝি যায় কুল ॥
পেয়ে ঘোর সঙ্কটে, যৌবন লোটে,
না মানে কংসের দোহাই।

৯০

মহড়া

রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যামসাগরে, কালো নীরে
কিশোরী ডুবিলো ॥

চিতেন

জুড়াইতে সুখী, চন্দ্রমুখী
দিলে কালো জলে ঝাঁপ।
পরিতাপ ঘুচাতে পেলেন মনস্তাপ ॥
কিসে হবে পরিত্রাণ।
রাই জানো না সে সবো সন্ধান ॥
কুলবতী হোয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো ॥

৯১

মহড়া

লয়ে দুগ্ধ দধি, পশরাতে, সাজায়ে সকল,
ভাবিতেছি তাই সখি
যাব কি না যাব আজ, মথুরার বিকি।
বসেছে নূতনো দানী, নন্দেরো নন্দনো নাকি।

চিতেন

বড়ায়েরো মুখে একি, গো সখি,
শুনি পরমাদ।
ঘুচিলো আমাদের সবো, বিকি কিনি সাধ
যে কথা শুনি দানীরো কথা,
গিয়ে কুল হারাবো কি ॥

অন্তরা

নিতি নিতি, বিকি কিনি, করি দধি সর্।
গোপজাতি ধর্ম এই, ইহাতে দিই রাজকর ॥

চিতেন

এ বড় বিষমো হলো, বসিলো,
দানী এ পথে।
কি দানো তাহারে সখি, হবে গো দিতে ॥
শুনেছি রসিকো দানী,
না জানি সে চায়ো বা কি ॥

৯২

মহড়া

জলে জলে কে গো সখি।
অপরূপো রূপো দেখি ॥
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী ॥

অন্তরা

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই।
ওগো প্রাণো সই ॥
নিরখি নির্মল জলে অনিমেষে রই ॥

চিতেন

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে
আবার ভাবি সে, যে শশী কুমুদোবান্ধব,
হৃদয়ো কমলো কেন, তা দেখে হবে সুখী।

৯৩

মহড়া

হোয়েছি তোমার বাঁশীর দাসী,
তাই আসি বনে।
কুলবধূ, বধ বঁধু সুমধুর তানে ॥

মহড়া

হর নই হে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদ লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

চিতেন

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত,
কেন করিতেছ বারে বার ॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো,
দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি ॥

অন্তরা

হায়, শুন শম্ভু অরি,
ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হও না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে নহে এতো জটাভার ॥

চিতেন

কণ্ঠে কালকূট নহে,
দেখ পরেছি নীলরতন।
অরুণো হোলে নয়ন,
কোরে পতি বিরহে রোদন ॥
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি ॥

মহড়া

কোকিলে কি সময়ো পেলে।
তুমি এতদিন কোথা ছিলে।
কালগুণে কাল, তুমিও হোলে
একে তো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী ॥
হয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ,
নারী বধিতে এলে।

মহড়া

রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর হিত্‌কারী নয় ॥

চিতেন

পাণ্ডব খাণ্ডব বন, দহিল যখন।
নানাজাতি পক্ষী তাতে, হইল দাহন ॥
কোকিলে মরিত যদি তায়।
তবে কি কু-রবে প্রাণো যায় ॥
বিরহিনী বধিবারে বাঁচাইল ধনঞ্জয় ॥

২৭

মহড়া

তুমি হও মহাজন অবলার ॥
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেম ধন,
আমার যৌবন হবে জামিনদার।
পীরিতেরি খাতক, আমি হব হে তোমার
পরিশোধ না হবে প্রণয়!
মন বাঁধা থাকিবে আমার,
প্রাণ যতদিন রয় ॥

সুদে সুখো তুচ্ছ চিরদিন,
ম'লে এ ধারে হবে উদ্ধার।

চিতেন

এসেছি পীরিতের দেশে প্রাণ,
প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি, প্রাণো,
সঁপে প্রাণ জুড়াই॥
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বঞ্চিতো কোরো না বঁধু, কিঞ্চিতো আমায়॥
আপনার কোরে, লও আমারে,
প্রেমনিধি দিয়ে পার॥

৯৮

মহড়া

পূর্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে।
নিজে বিপক্ষেরে দিয়ে পতির মৃত্যুবাণ,
দেখো মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে॥
নারীর হাতে সঁপে ধন প্রাণ,
প্রাণ খেতে বোসেছে॥
আমি সাধ করে কি করি খেদ।
নারীর মন্ত্রণাতে, দিতে পারে,
ভাই ভায়ে কোরে বিচ্ছেদ॥
ধোরে তিলোত্তমা নারী মোহিনীরো বেশ,
দেখ সিন্দ উপসিন্দু প্রাণে মেরেছ॥

চিতেন

ঘুনাগ্রেতে যদি করি দোষ,
তিলে কোরে বোসো তাল।
না জানি কারণো কও প্রিয়ে,
কেমন পুরুষের কপাল॥
তুমি আত্মছিদ্র লুকায়ে।
পেলে পরের ছিদ্র,
পাড়ায় পাড়ায় বেড়াও ঢেঁড়রা ফিরায়ে॥
নারীর নাই কিছু মমতা, দারুণ বিধাতা,
কেবল পুরুষে বধিতে যৌবন দিয়েছে॥

অন্তরা

যদি অবলা অবলা, বল তবে প্রাণ,
সবলা কে আছে আর।
বলে চতুর্গুণ, ছলে অষ্টগুণ,
ভাবের অন্ত পাওয়া ভার॥

চিতেন

কামিনী কোমল কে কহে রে প্রাণ,
হৃদয় অতি কঠিন।
এক ঐক্যে, এক বাক্যে,
এক পক্ষে, থাকে না একদিন॥
যেমন সসর্পে গৃহেতে বাস।
হোলে দুষ্টা ভার্যা, বেড়ায় গর্জে,
খেলে খেলে এমনি ত্রাস।
ধনি, তা নৈলে রে প্রাণ,
বধে পতির প্রাণ,
দেখো রাজকুমারী সতী কোটাল ভজেছে॥

৯৯

মহড়া

গেল তিন দিনে প্রেম চিরদিনে,
বিচ্ছেদ গেল না।
রসাভাষে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে,
পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হোল না॥

হোলো তিন দিনে ছাড়াছাড়ি।
পোড়া বিচ্ছেদের কি, হয় গো সখি,
অবলারি সঙ্গেতে এত আড়ি ॥

চিতেন

আমার কপালে অল্প ভোগ,
প্রেমের কল্পযোগ, করা ভার।
ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ,
কেবল কর্মভোগ হোলো সার ॥
কেমন হাবাতে কপাল আমার।
প্রেমের উদ্যোগী যে, সম্ভোগী সে,
হোয়েছিল ভুটিবার কি একটিবার ॥
আমার অকলঙ্ক চাঁদে, কলঙ্কেরি দাগ,
বিচ্ছেদ একবার তো সেটা মনে ভাবলে না॥

১০০

মহড়া

বোলে প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদ কে তার,
ডেকে নে যেতে।
থাকে আরো ধার আমি শুধে আসবো চার,
এত তসিল ক'রে কেন মসিল বরাতে ॥
খাজে আসি আসি এমন
বিনয় ভিক্ষা মাগাতে।
দিয়ে উদোর ঘাড়ে তুলে,
বুদোর ঘাড়ে মোট,
আমায় ফেলে গেল ফাঁকের শাঁকের করাতে।
দিয়ে মনের বনে, আগুন,
প্রাণ জ্বলালে সে,
তবু পারে না বিচ্ছেদের বাসা পোড়াতে ॥

আপনি শাসন না কোরে এই,
যৌবনের তালুক,
আমি তারে কি বোলেছি পত্তনি দিতে

১০১

মহড়া

হায় বিধাতা, এই কি আমার কপালে।
একি প্রেম ঘটনা, কি লাঞ্ছনা,
ভেকের বাসা কমলে ॥

চিতেন

আমি জন্মে জানি নে প্রেম যাতনা,
মনে পড়ে না।
সই তুমি মজালে তোমার,
ধর্মে সবে না ॥
স্বর্ণ পিঞ্জরে আছে সজনি,
কেন বায়স এনে বসালে।

১০২

মহড়া

ওহে বাঁকা বংশীধারী।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা,
কুবুজা নারী।
বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব,
নাহি চাতুরী।
রাধা সে সরলা রমণী।
তুমি নিজে বাঁকা আপনি ॥
মথুরা নাগরী পেয়ে,
হরি ফিরিছ চক্র করি।

১০৩

মহড়া

নটবর কে গো সে সখি।
তার নাম জানি নে, কালো বরণ,
ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি ॥
যাই যদি যমুনার জলে,
সে কালা কদম্বতলে,
হাসি হাসি বাজায় বাঁশী
বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন

ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার।
সে যে মন্মথ মন্মথরূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার
চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য মানে,
একবার হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ॥

১০৪

মহড়া

নৈলে কিছুই নয়।
বটে সুখোনিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয় ॥
সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়।
উভয়ে উত্তম, পরিশ্রম, যদি করে।
তবে যতনে, এ ধনে, রাখিতে পারে ॥
সুখের সুখী, দুখের দুখী,
দোঁহে দোঁহার হোয়ে রয় ॥

১০৫

মহড়া

বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন ॥
কত দিনো প্রাণো তুমি, হোয়েছ এমন।
প্রিয় বাক্যে প্রেয়সী বলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায়।
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন, সুধাবরিষণ ॥

১০৬

মহড়া

সখি প্রেম কোরে অনেকের এই দশা হয়
শুধু তুমি আমি বোলে নয় ॥

চিতেন

যা বলিলে প্রাণসই, সকলি স্বরূপ।
মজেছি পীরিতে, তেজিবে কি রূপ ॥
দেখো দেখো সজনি, থেকো সাবধান।
রাখো আপনি, আপনারো মান ॥
দুখে কর সুখো জ্ঞানো, ভেব না সংশয় ॥

১০৭

মহড়া

আগে মন ভেঙ্গে শেষ যতন ॥
আর কি এ প্রেম গড়ে।
সেধ না এখনো প্রাণো,
কেবল রাগ বাড়ে ॥
মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণে,
বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে ॥

চিতেন

প্রাণ যদি এক বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফল পায়, কোরে তায় কত যতন ॥
তুমি খল স্বভাবী প্রেম তরুরো,
মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে ॥

১০৮

মহড়া

যা ভাবো তা নয়।
মনের সাধ গেলে কি, বল দেখি,
অনুরোধে প্রেম কি রয়॥
মিছে আর কোরো না বিনয়।
বিনে ঐক্য, বিনয় বাক্যে প্রাণ,
বল পর কি আপনার হয়॥

চিতেন

মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ।
মন ভুলবে না.
আর খুলবে না সই বিচ্ছেদের বাণ।
দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে আর বল নিতি৷
কে যাতনা সয়।

অন্তরা

জাগা ঘরে যায় চুরি,
এমন তো ভেব না প্রাণ।
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে,
হোয়েছি সাবধান॥

চিতেন

কু-তর্কে লওয়াবে কি আর সতর্কে আছি
হব খলের বশ, এখন নাই সে রস,
নিজ মনকে বেঁধেছি॥
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি, এখন,
এখন তত্ত্ব কর নগরময়॥

১০৯

মহড়া

দেশ চলালেম প্রেম কোরে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জ্বলতেছি॥

চিতেন

না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে,
একে হোলো আর।
আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম,
শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার॥
একে নব ভাব, অনুরাগ, পড়ে মনে।
প্রাণ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে॥
চোরে রো রমণী যেমন সই,
তেমনি মর্মে মরে আছি॥

১১০

মহড়া

যাও প্রাণনাথের কাছে
বিচ্ছেদ একোবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হানে গো তায় বিচ্ছেদ বাণ,
যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমায় বোলে,
মনে পড়ে তার॥
রাখো রাখো এই বিনতি অধীনি জনার॥
যাতে মত্ত আছে সে যে মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুসঙ্গতো ভঙ্গ॥
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি,
অমনি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে, রবে না সে আর॥

চিতেন

বিরহিনী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবন কালে হোয়েছি আশ্রিতা তোমার॥

ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদ দায়,
নাথো না জানে।
অন্য নারীর প্রেমো সুখে, আছে সেখানে।
তারে জ্বলাতে পার না,
আমায় দেও যাতনা
ছি ছি, অবলা বধিলে
নাহি পৌরুষো তোমার ॥

অন্তরা

সকাতরে হাঁ-রে বিচ্ছেদ
করি তোরে বিনতি।
কামিনীরো প্রাণো রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

চিতেন

হোয়ে আমারো অন্তরের অন্তর,
নাথের অন্তরেতে যাও।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়,
প্রণয় তো ঘটাও ॥
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তার,
দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থলে ভুল,
ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কূল রক্ষা কর কুলজার ॥

মহড়া

ওহে প্রাণোনাথো,
পীরিত হোলো বিচ্ছেদের প্রজা।
শুনেছি প্রেম নগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে,
রসিকেরে প্রাণে মারে, সেই দুরন্ত রাজা ॥
প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা ॥

প্রেমের দেশে প্রাণোনাথো হে,
বিচ্ছেদ ভূপতি।
তার আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি,
কেমন কোরে করবো পীরিত ॥

চিতেন

তুমি নিত্য নিত্য বল
আমায় প্রেমো করিতে।
মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়,
প্রাণ রে, তোমায় প্রাণ দিতে।
নূতন প্রেম বাজার, বিচ্ছেদ রাজার,
অধিকার।
নবীনা যুবতী, করিলে পীরিতি,
বিচ্ছেদ তো কর লবে আমার ॥
শেষে আমাকে পাবে না,
হবে হে লাঞ্ছনা,
কেবল কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা ॥

১১১

মহড়া

প্রেমের কথা, যেথা সেথা,
কারো কাছে বোলো না।
আছি ভাল দু'জনায়,
অনেকে বিবাদী তায়,
জান না যে পরের ভাল,
পরে দেখতে পারে না ॥

১১২

মহড়া

এবার আমি পণ করেছি,
মনকে পীরিত ছাড়াবো।

ঘুচলো আশা পথ,
এমন ভণ্ড প্রেমে দণ্ডবৎ,
বরং বিচ্ছেদেরে নিয়ে প্রাণ জুড়াবো ॥

মহড়া

আহা মরি কি যে ভালবাসো আমারে।
বলিতে তোমারো গুণ, লোহায় লাগে ঘুণ,
জলে আগুন জলে আবার পাষাণ বিদরে ॥

মহড়া

ছেড়েছি পীরিতের আশা,
পীরিত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও।
যার সঙ্গেতে এসেছিলে আমার অঙ্গেতে,
সে গেল আর তুমি কেন,
দুখিনীর মুখ দেখতে চাও ॥

চিতেন

তাই তে বলি পীরিত
আমি ছেড়ে যাও তুমি।
এক্ষণে, তোমারি সনে,
থাকবো কেমনে আমি ॥
তুমি পীরিত আত্মসুখে সুখী।
অনাথিনী, বিরহিনীর,
কাছে তোমার কার্য কি ॥
তুমি পর, আমি পর, সেও তো পর,
পর মজানে পীরিত তুমি,
মিছে আর অঙ্গ জলাও ॥

১১৩

মহড়া

দ্বারী একবার বল্ তোদের,
কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী,
তোমায় দেখবে বোলে,
আছে বোসে রাজপথে ॥
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে ॥
তোদের রাজা না কি দয়াময়।
দুখিনীর দুখ দেখলে,
দেখবো কেমন দয়া হয় ॥
ইথে হবে তোমার পুণ্য,
কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে ॥

চিতেন

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা,
রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলেম কংসালয় ॥
মনে অন্য অভিলাষো নাই।
রাখাল রাজার বেশ,
কেমন শোভা দেখে যাই ॥
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি করি ধরি করেতে ॥

অন্তরা

তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী।
তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে
কালোবরণ ফণী,
আমরা সেই জালায় জলি ॥

চিতেন

বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার,
আর তো না দেখি উপায়।
ফণিমন্ত্র জানে তোদের রাজার দ্বারী,
তাই রে এলেম মথুরায়॥
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়।
রাজার দৃষ্টি মাত্রেই, সে বিষো নির্বিষো হয়॥
কৃষ্ণপ্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিষে,
ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধো নাই জুড়াতে॥

মহড়া

যদি বেঁচে থাকি ওগো সখি,
শঠের সঙ্গে আর পীরিত করবো না।
না কোরে প্রেম ছিলাম ভালো,
কোরে একি জ্বালা হোলো,
লজ্জা সরম সকল গেল, কেউ ভাল বলে না।
পীরিতের বাজারে সই, আর যাব না।
মিছে ছল কোরে বোলে কি বে-ফল।
মনের মিলন ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো,
হংস মুখে পীরিত যেন দুগ্ধ জল॥

চিতেন

পীরিতে জীবন জুড়াতে,
সখি পরের হাতে সঁপেছিলাম প্রাণ,
আমার কুল গেল, কলঙ্ক হোল,
ঘরে পরে সবাই করে অপমান॥
পীরিত সুহৃদ হোয়ে হোল বিপক্ষ।
যেমন খলের মিলন জলের লিখন,
সত্ত সত্ত ঘুচে গেল সম্পর্ক॥
দেখে কুতর্ক কু-ব্যবহার, সতর্কে আছি এবার,
পরের পরকীয় রসে ভুলবো না॥

১১৪

মহড়া

কও দেখি হে নূতন নাগর,
একি নূতন ভাব রাখা।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
ছ মাসে ন মাসে তোমার পাই নে কো দেখা।
এমন নূতন ভাব,
কে তোমায় শিখালে সখা॥
কেবল পর মজাতে জানো।
থাকো আপন সুখে, পরের দুখে,
দুখী হও না কখনো॥
তোমার তাদৃশী পারিতি, দেখি ওরে প্রাণ
যেমন খলের পীরিত বলে জলের রেখা॥

চিতেন

নূতন প্রেমে আমায় মজালে,
কোরে নূতন আকিঞ্চন।
নূতন ভাব, ধোরে নূতন স্বভাব,
হোরে নিলে মন॥
নূতন প্রেম বাড়াবার লেগে।
এসে নিত্যি সখা, দিতে দেখা,
নূতন নূতন সোহাগে।
এখন কোথা রৈল তোমার,
সে সবো নূতন ভাব,
ছুতো লতা কর বদনো বাঁকা॥

অন্তরা

প্রাণ যদি এত ছিল মনে, তবে কেনে,
মজালে আমায়।
আমি অবলা, কুলেরো বালা,
এত জ্বালা কি সহ্য যায়॥

চিতেন

শীলতা সমতা, কোথা ওরে প্রাণ,
কোথা নূতন আলাপন।
নূতন ছল, এমন নূতন কৌশল,
কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন ॥

১১৫

মহড়া

তোমার, বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে
প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হোলেম তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল নির্বাণ।
বৃষক্রিমি সম আমি,
করি বিষ খেয়ে অমৃতজ্ঞান ॥

চিতেন

গেল গেল পীরিত গেল প্রাণ,
ভাল বাঁচিল জীবন।
দরশন, পরশন, ঘুচলো প্রাণ এখন ॥
হোলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ মাসের পথ।
কানে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবৎ ॥
পাষাণ হোয়ে, থাকবো সোয়ে,
পারো যত কর অপমান ॥

মহড়া

এ ভাবের ভাব রবে কতদিন।
প্রাণ যতনে মন যোগাও না,
পরিত্যাগো কর না,
আমি যেন হোয়ে আছি জালে গাঁথা মীন

চিতেন

যে ভাব ছিল পূর্বেতে প্রাণ,
সে ভাব দেখি নে।
তোমার অভাব দেখে, স্বভাব দোষে,
আমি ভুলতে পারি নে ॥
দেখা হোলে, সখা বোলে,
আদরে ডাকি।
তুমি বল ভাল তো জ্বালা,
এ পাপ আবার কি ॥
আপন বোলে,
সাধতে গেলে তুমি ভাবো ভিন ॥

১১৭

মহড়া

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ
বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছু থাকো থাকো বোলে
ধোরে রাখবো না।
আমি কোন দুখের কথা।
তোমায় বলব না ॥
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ,
আমারি গেলো ॥
সদা রাগে কর ভর,
আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায়,
দুঃখ দিও না ॥

চিতেন

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হোলো এপথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা,
তোলো ও বিধুবদন ॥
পীরিত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি,
অনেকের দেখি ॥
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হোলে বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মানিক পাব না।

১১৮

মহড়া

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি ॥
লুকালে কি প্রাণ হরি,
ও প্রাণ হরি ॥
এসে বনে কুলো হরি,
কে জানে বধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি,
মরি বোলে হরি হরি ॥

চিতেন

হরি নিয়ে বিহরি বনে,
এই ছিল প্রয়াস।
বনমালা বনকেলী, করিতে নিরাশ ॥
না জানি কি অপরাধে,
ত্যেজিলে দুখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখো সাধে,
গেলে হে বিষাদো করি।

১১৯

মহড়া

জলে জলে, কে গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি ॥
দেখ সই নিরখি ॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাবভঙ্গী প্রায়
মায়া কোরে ছায়ারূপে
সে কালা এসেছে কি ॥

চিতেন

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল ॥
তারের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
চকিতে দেখিতে আমার,
জুড়ালো দুটি আঁখি ॥

অন্তরা

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমনো রূপো, বারি মাঝেতে ॥

চিতেন

আজ সখি একি রূপো নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় ॥
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী ॥

অন্তরা

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইতো নই,
ওগো প্রাণসই।
নিরখি নির্মল জলে, অনিমেষে রই ॥

চিতেন

কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডুবিল জলে রাহুরো ভয়ে ॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ বান্ধব,
হৃদয়ে কমলো কেন তা দেখে হবে সুখী।

মহড়া

প্রেমতরুতে সই, চারটি ফল ফলে।
শুন ফলের নাম, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
সময়ে এক বিন্দু দিলে, সুখসিন্ধু উথলে ॥

করবে উত্তম পীরিত প্রাণ রে ;
সে প্রেম কি সামান্যেতে হয়।
তুমি নবীনা যুবতী, পীরিতে নূতনো ব্রতী
পীরিত হবে কি মন তোমার তেমন নয় ॥
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম করা উচিত নয়।
দেখো ভগীরথ মোক্ষ প্রেমের আশাতে,
করে মন্ত্র সাধন কিম্বা শরীর পতন,
আনিলেন গঙ্গা ভারতে ॥
দেখ প্রহ্লাদের যন্ত্রণা,
হরিনাম তবু ছাড়লে না,
তার তাইতে হোলো শেষে সুখোদয় ॥

চিতেন

শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী।
দুর্গায় ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে,
সদাশিব হোয়েছেন যোগী ॥
তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই।
একবার চাও পীরিতকে
আবার চাও বিচ্ছেদকে,
দ্বিধা মন কর রসময়ই ॥
যে জন পীরিতকে রত হয়,
প্রেমধর্মের ধর্ম এত নয়,
দেখো প্রেমের দায়ে শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥

মহড়া

তোমার প্রেম গেছে তবু প্রাণের প্রাণ,
মান রেখে কথা কই।
কত পুরুষ তুমি পাবে,
সবাই তোমার মন যোগাবে,
আমার প্রাণ কে জুড়াবে,
প্রাণ তুমি বই ॥
গেছে রস, তবু আছি তোমার বশ,
ভগ্নভাবে মগ্ন রই।

চিতেন

কল্পতরু যদি কৃপণ হয়,
তবু রয় মহত্ত্ব।
কতজন সুখো ফলো প্রয়াসে,
পড়ে থাকে নিয়ত ॥
তোমার তেমনি ভাব হোয়েছে।
ওরে প্রাণ রে, আর কি সাধ আছে ॥
কেবল লুব্ধ আশায় প্রাণ পোড়ে আছে ॥
প্রিয়ে সাধিতে মনের সাধ,
আর এখন চারা কি,
হব দত্তহারী যদি মনো ফিরে লই।

১২২

মহড়া

ঘরে ঘর করা ভার হোল সখি,
আর তো বাঁচি নে।
একে মদন সর্বনেশে,
নারীর প্রাণ জ্বালায় গো এসে,
পতি হোল কন্যা রেশে,
চায় না সতীর পানে ॥
ইচ্ছা হয়, ত্যেজে লোকালয়,
বাস করি বনে ॥
মদন শর হানে সই যত,
সে যে কর দিতে নয় রত।
কেবল ঘর আগুলে পড়ে থাকে,
পাণ্ডু রাজার মত ॥

চিতেন

বসন্তে থাকিতে পতি সতীর হয় প্রমাদ।
ভাল আমার মেনে, ভাগ্যগুণে,
ঘয়েছে সই, হরিষে বিষাদ ॥
কোথা সঙ্গদোষে পড়ে,
রতিরঙ্গ আলাপ ছেড়ে,
আমার প্রাণপতি এসেছে এবার,
শান্তি শতক পড়ে ॥
নাথের রঙ্গ দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে সই,
সদা দাহন করে আমায় অনঙ্গ বাণে ॥

১২৩

মহড়া

ঋতুরাজ নিলাজ ভূপতি।
যে ধারে কর, দেশান্তর,
রৈল সে, তার দায়ে বধে সতী ॥

চিতেন

অন্যায় দেশে রেখে সই, গেছে প্রাণনাথ।
সে পেলে কি ধন, এখানে মদন,
দেয় তার স্ত্রীধনে আঘাত ॥
অশান্ত বসন্ত রাজা,
প্রাণনাথ পলাতক প্রজা,
না ধরে সে নিষ্ঠুরেরে,
আমায় দেয় দুর্গতি।

১২৪

মহড়া

প্রাণ তুমি এ পথে আর এসো না ॥
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা,
মনেতে বুঝবে না।
তুমি যার, এখন তার, পুরাও বাসনা ॥
তোমা হোতে সুখো যা হবার।
প্রাণ তা হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার ॥
দেখা হলে মরি জ্বলে,
এ দেখা দিও না ॥

চিতেন

আগে তোমায় দেখলে সখা,
হত পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখলে
ঘটে হরিষে-বিষাদ ॥
এসো বোসো বলা হোল দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা,
বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে,
আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা ॥

অন্তরা

তা বলা নয় উচিত হয়, না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমার, করিবে ভর্ৎসন ॥

চিতেন

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ-যুগান্তে
অনাদর নাহি কোরো, সেই নূতন পীরিতে
নব রসে সে যে রঙ্গিণী
প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনি ॥
আমায় যেমন জ্বলয়েছিলে,
তারে জ্বালা দিও না ॥

বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে,
দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয়।
যেন এবার আর তা না হয়,
এক ভাবে ভাব রয়,
শেষেতে দেশে না হই অপমান ॥

১২৫

মহড়া

এসো নূতন প্রেম করি
প্রাণ বাঁধা রেখে প্রাণ।
রাখবো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেমডোরে,
প্রেমের প্রহরী থাকবে আমার দু'নয়ান ॥
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান,
হও প্রাণের প্রাণ ॥
হবে এ বড় পরিবর্ত সম্বন্ধ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখবো অন্তরে,
প্রাণ বোলে ডাকলেও আনন্দ ॥
যাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই,
যেন কেউ কারে,
হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ ॥

চিতেন

না হোতে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা,
না হয় সুখোদয়।

১২৬

মহড়া

মান ভিক্ষে দেও আমারে প্রিয়ে এখন।
ধনি আজকের মত মান, করি সমাধান,
একবার বদন তুলে কর বিবাদ ভঞ্জন ॥

১২৭

মহড়া

যৌবন রথে কে তুমি রে প্রাণ,
পীরিতশূন্য যুবতী।
রূপে থমকে থমকে, চপলা চমকে,
কেন পাগল কোরে বেড়াও পুরুষ জাতি
প্রেমিকেরা প্রতি তুমি, কর ডাকাতি।
কুচগিরি উচ্চ পেয়ে, মদন করে কেলি ॥
কোথা আছে করি কুম্ভ প্রাণ,
দাড়িম্ব কি কদম্ব কোল ॥
হেরে মুখো মনোহর,
লজ্জা পায় শারদ শশধর,
কেন কমল বনে নাহি ভ্রমরের গতি ॥

১২৮

মহড়া

সেই তুমি আমিও সেই।
প্রেম গেল কোথায়।
ইহার কি অভিপ্রায় ॥

কোনরূপে ত্রুটি দেখতে না পাই,
দেখা হোলে তোষে কথায় ॥

চিতেন

তখন হোতে এখন অধিক আদর,
দেখি প্রিয়ে তুমি কর আমায়।
অদ্যাপি আমারো,
দোষো করি গুণ গাও,
শুনি যথা তথায় ॥

১২৯

মহড়া

আর সহে না কুহু স্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস্ নে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।
শুন হে নিরদয়, এ তো সুখের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে
ব্রজবাসী সবে ভাসে নয়নজলে।
হয়ে কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল,
কি গোপ কি গোপীকুল,
পশুপক্ষীকুল বিরহে সকলি ব্যাকুল ॥
ব্রজে বকুল মুকুল, অধৈর্য অলিকুল সব,
কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে ॥

চিতেন

বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয় ॥
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহিণী, কৃষ্ণ কাঙালিনী,
ধুলাতে পড়ে রয়েছে ॥

বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে
শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তার কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে।

অন্তরা

এমন দুখের সময়, কোকিল পক্ষীরে,
কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে ॥

চিতেন

অধরা ধরাসনে পড়ে রাই,
চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় স্বাপক্ষ হও পক্ষ,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বধিস নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা,
দুখিনীর কথা রক্ষা কর ॥
কোকিল দেখলি তো সচক্ষে,
মরণের অপেক্ষে আর নাই,
হয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত সকলে।

১৩০

কথা কও বদন তোল হও সদয়,
এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্যে, এলেম অপার্যে,
তোমার অংশ রাজ্যে
অংশ ল'তে আসি নাই ॥
অধোমুখে যদি থাকো শ্যাম,
কুবুজার দোহাই।

তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,
কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য,
তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য,
যেন সর্বস্ব ল'তে এলেম, ভাবছো তাই।

চিতেন

রঙ্গিণী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা
বাক্যছলে কৃষ্ণে কয়।
ছিলে নব্য রাখাল, হলে ভব্য ভূপাল,
সভ্য এখন কংসালয় ॥
আমার এই দশা আমি এখন সেই বৃন্দে,
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
পার তো চিন্তে, কেন সচিন্তে,
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্ত নাই ॥

তাই শুধাই তো সুধামুখী রাই তোমা
হয়ে বিরাগী কি বিরাগে,
কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায় ॥
ও যে ধন্য ষট্পদ অন্যদিগে নাহি চায়
কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,
তাহে সুখো নাহি কো সুখভুঞ্জে,
পাইয়ে ওঁ পাদপদ্মের সুধা,
ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায় ॥

চিতেন

ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,
চন্দ্রামুখীর প্রতি কয় ॥
ওগো রঙ্গদেবী একি রঙ্গ,
পদোপ্রান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ।
ও যে সাধিছে সাধের কাজ,
কি সাধে অলিরাজ,
পদপঙ্কজ রজ মাখে গায় ॥

অন্তরা

ও রাই, কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য,
এ আশ্চর্য অলি কোথাকার।
হয়েছে শরণাপন্ন, দেখি চরণে তোমার ॥

চিতেন

অরণ্যের অলি বলো, কি জন্যে ব্যাকুলো,
অন্যে শুধালে না কয়।
অতি কুণ্ঠিতেরো প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
কল্লে তবাঙ্গে আশ্রয় ॥
ওকে শুধাও দেখি রাজকন্যে,
অলির বাঞ্ছা নি ধনের জন্যে,
করে ব্রহ্মাদি তপোধন,
যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায়।

১৩১

মহড়া

আমরা কার কাছে প্রাণ জুড়াবো।
ছিল জীবেরি জীবন, সে বংশীবদন,
হারালেম তারে হে উদ্ধবো ॥
ফুটিলো মালতীলতা, এ সময়ে মাধব কোথা,
গাঁথিয়ে হার কার গলায় আর পরাবো।

চিতেন

উদ্ধবেরে হেরে সব ব্রজাঙ্গনা কয়।
আমরা এতদিনে কৃষ্ণবিনে হলেম নিরাশ্রয়॥
এ সুখো বসন্তকালে,
শ্যামকে কোথা রেখে এলে,
সব শূন্য বিহনে সেই মাধবো।

১৩৩

মহড়া

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ॥
কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়,
হয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি রূপেরে না দেখি শেষ॥

ধুতুরা পীযূষ বঁধু করেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমারো মুখো, করি অনুমান
তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন,
আঁখি দুটি ঊর্দ্ধে উন্মীলন।
মধু ভিক্ষা করে বঁধু ভ্রমিতেছ নানা দেশ

১৩৬

মহড়া

পরেরো মন্ত্রণায় বাদ কোরে
প্রেমের সাধ কেন ঘুচালে।
সেধে আপনার কাজ,
কেবল আমায় মজালে॥
যখন নব ভাব ছিল সে এক মন,
এখন সে মমতা, সকল কথা
হোলো যেন শরতের মেঘের গর্জন।
ছিল নয়নের দেখা, তাহে ক্ষতি কি সখা,
কেন সে প্রবৃত্তির পথে কণ্টক দিলে॥

চিতেন

এ সুখেরো প্রবৃত্তি কিসে নিবৃত্তি হোলো,
বল দেখি প্রাণ।
মনের খেদে, মরি সেই বিবাদে,
ঝরে দু নয়ান॥
পরে ভাঙ্গলে মন তার কি এমনি হয়।
এখন ডাকলে সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥
তোমার এ পথো ভুলায়ে
সে পথে নে গেল যে,
এমন বশীকরণ বিদ্যা সে কোথায় পেলে।

অন্তরা

আমার আশাবৃক্ষে অনেক দুঃখে,
ফল পরীক্ষে করা হোলো না।
আজন্ম কালাবধি, সাধনের নিধি,
দিয়ে বিধি দিলে না।

চিতেন

এ বড় তিতিক্ষে, আমার এ পক্ষে,
ব্যথার ব্যথী কে হোলো।
দিয়ে প্রেমের শিক্ষা পড়া,
হরে নে গেল॥
ভালো গোপনে দিয়ে দীক্ষে,
সদা লই পক্ষে টান, তোমার রে প্রাণ,
কৃষ্ণপক্ষ হোয়েছ আমার পক্ষে।
আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যে পক্ষে উদয়চাঁদ,
কেন মায়ামেঘের আড়ে কায়া লুকালে॥*

* রাম বসুর গীতসমূহ সংবাদ প্রভাকরের ১ আশ্বিন, ১ কার্তিক, ১ অগ্রহায়ণ, ১ মাঘ ও ফাল্গুন, ১২৬১ সালের সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ভোলা ময়রা

মহড়া

আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
শ্যামবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই,
বিল্বদলে আমায় পূজলি কই?

চিতেন

যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ,
তা কি ঘুচাতে কেহ পারে!
নিদর্শন তোমারে।
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনত্ব
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে?
নিম্বতরু যদি রোপণ হয়,
শতভার শর্করে,
সে মিষ্ট রস না হয় কখন,
নিজগুণ প্রকাশ করে॥ *

এন্টনি ফিরিঙ্গি

মহড়া

জয় যোগেন্দ্র-জায়া মহামায়া
মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে
যে ডাকে তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
বিপদকালে ডাকি,
দুর্গা কোথায় মা,
দুর্গা কোথায় মা;
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম এই কি মা?

খাদ

অতি কুমতি কুপুত্র বলে,
আপনিও কুমাতা হলে—
আমার কপালে!
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণকুলে,
ধর্ম তেমনি রেখেছ!

ফুকা

দয়াময়ী,
আজ আমায় দয়া করবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি
দয়া করেছ!

মেলতা

জানি তোমার চরণ সাধন করি
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী;

* এই গীতটি সঙ্গীতকোষ (পৃঃ ২৫১) হইতে গৃহীত। ভোলানাথের অপরাপর পরিচয় পূর্বেই (পৃঃ ৭৯-৯১) দিয়াছি।

দেখ, সকল ফেলে,
ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
আবার শূন্য করে সোনার কাশী,
ওগো শ্যামা সর্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

চিতেন

নাম কেবল করুণাময়ী,
করুণাশূন্য হয়েছ।
মা তুমি দক্ষ-রাজকুমারী,
দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে ;
শিব বিহনে, শিব অপমানে
মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি,
দক্ষরাজায় নিদয় হলি—
আপনি মলি, তারেও মেলি
পিতার দুঃখ ভাবলি নে।

পাড়ন

তখন যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে—দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে—
তার বুকে পা দিয়েছ।

ফুকা

তুমি তার' তার' তার',
না তার' না তার'
আপনার গুণে ত'রবো ;

দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো।
আমার অন্তে শমন এলে,
অজপা ফুরালে,

মেলতা

দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।

চিতেন

মা, অসাধ্য তোমার সাধন,
কোরলে সাধন,
কেবল তায় নিধন হ'তে হয়।

পাড়ন

একবার তারা বলে যে ডেকেছে,
সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো
মায়ের ধারা নয়।

ফুকা

মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে,
রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;

মেলতা

তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে,
তার দুঃখ ভাবলি নে,
তারে ধ্বংস করে ভগবতী,
নিদয় হ'লি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখলি নে॥

অন্তরা

আগে ছিল তা কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডঙ্কা—
অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল ক'রে তার সোনার লঙ্কা
দগ্ধ ক'রে এসেছ।

মেলতা

দয়াময়ী মা গো,
কোন্‌কালে বা কারে তুমি
দয়া ক'রেছ ?*

গোরক্ষনাথ যোগী

চিতেন

গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ
ত্যজিয়া বৃন্দারণ্য।

পরচিতেন

কারে বল সই শুনতে রাধার যন্ত্রণা,
ও যে শ্যাম চরণচিহ্ন।

ফুকা

সখি ঐ যার পদচিহ্ন,
সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝলে না,
অরণ্যে রোদন করিলে এখন,
ঘুচবে না মনের বেদনা।

মেলতা

রাধার সুখের ত কপাল নয়,
তা হ'লে কি এমন দশা হয় ?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হ'য়ে, পড়ে ভূতলে।

মহড়া

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই,
কি হবে ব্যাকুলা হ'লে ;
এখন ভ্রান্তি পরিহরি
বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

খাদ

কেন ব্রজধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম,
রাধার দুঃখের কপাল না হলে।

ফুকা

মনে জ্ঞান হয়, জন্মান্তরে,
আমার কৃষ্ণ হ'রে,
সখি নিছিলাম কার ;
বুঝি সেই পাপে এই মনস্তাপে,
দহিল প্রাণ গোপীকার।

মেলতা

নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায় ;
রাধার প্রাণ যায়,
গোকুল ভাসে দুঃখ সলিলে।†

* প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান, পৃঃ ৪১-৪৪।
শাক্ত পদাবলী অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১২৯-৩১।
অনেকের মতে ইহা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর রচিত (বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ১৯৫)। এণ্টনির অপরাপর গীতসমূহ পূর্বেই (পৃঃ ৯১-৯৮) দেওয়া হইয়াছে।
† গুপ্তরত্নোদ্ধার, পৃঃ ১৯৪-৯৫।

লোকে যুগী

মহড়া

কোথা নীলমণি রে
একবার দেখা দে বাপ ধন,
আমার আয় কোলে।
এলেম তোর আশায় প্রভাস তীর্থে,
দুরন্ত দ্বারীর হাতে, প্রাণ যায় রে।
কাঙ্গাল বলে প্রহার করে,
এ সময় নীলমণি রে,
দেখ এসে বহির্দ্বারে।
একবার মা বলে প্রাণ বাঁচাও রে,
প্রভাসকূলে ॥

খাদ

আমি তোর জননী, পুত্র তুই নীলমণি
জানুক সকলে ॥

ফুকা

আমি তোমার শোকে নীলমণি,
হয়েছি কাঙ্গালিনী, যেন পাগলিনী প্রায়
তোর আশায় বেঁচে আছি নন্দালয়।
কেঁদে দুটি নয়ন গেছে,
শোকে তনু ক্ষীণ হয়েছে,
কেবল মাত্র প্রাণ রয়েছে,
তাও বুঝি আজ যায় ॥

মেলতা

একবার অক্রূর মুনি তোরে,
আনলে হরণ করে,
ওরে নীলমণি রে,
আবার দশা নারদ-মুনি ঘটালে ॥

চিতেন

শ্রীকৃষ্ণ করবেন যজ্ঞ প্রভাস কূলে।

পাড়ন

যজ্ঞের পত্র পেয়ে, পুলক চিত্ত হয়ে,
অতি বেগে ধেয়ে, চল্লেন সকলে ॥

ফুকা

শুনে মুনির মুখে সুসংবাদ,
পুরাইতে মনের সাধ।
যশোদা প্রভাসে যায়, স্নেহের দায়,
বৎসহারা গাভীর প্রায়।
অশ্রুবারি পূর্ণ চক্ষে,
রোদন করে কৃষ্ণ শোকে
ধারা বহে মনোদুঃখে, বক্ষ ভেসে যায় ॥

মেলতা

করে দ্বার বাৎসল্য ভাব,
শুনে তাই দ্বারী সব, প্রহার করে,
বলে কেশব রে এই কল্লি বাপ শেষকালে ॥

অন্তরা

তোর মা হয়ে এই দশা হোলো কপালে।
মার খেয়ে প্রাণ গেল আমার
এসে তোমার প্রভাসকূলে
তুই রইলি বাপ যজ্ঞস্থলে,
আমি দ্বারে কাঁদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
ভাসি দুটি চোখের জলে,
এসে প্রভাসে আমায় কাঁদায়ে
গোপাল তুই রে সুসন্তান, কল্লি অপমান,
এ অপমান আর যাবে না মলে ॥

চিতেন

পূর্বেতে জানলে এমন আর আসতেম না

পাড়ন

তোমার সংবাদ পেয়ে,
এলেম আকুল হয়ে ॥

ফুকা

গোকুলবাসী লয়ে পেলেম যন্ত্রণা।
এক প্রাণে ছিল পুত্রশোক,
তার উপরে বিষম শোক,
হলো মৃত্যুশোকের প্রায়,
প্রাণ যায়, ঘটলো এসে একি দায়,
লোকের মুখে একি শুনি,
তোর মা হলো দৈবকিনী,
তবে কেন রতনমণি, কাঁদালি আমায় ॥

মেলতা

আমি কি তোর মা নই
শুনে কি প্রাণ রয়!
ওরে গোপাল রে,
এখন কি বলে ফিরে যাব গোকুলে ॥*

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য

আজ কৃষ্ণ! চল হে নিকুঞ্জবন,
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই,
লহ তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই, চাহিয়ে ও চন্দ্রবদন
তুমি যে ছলে শ্যামরায়, এলে মথুরায়,
হয়ে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত;
করলে সে যজ্ঞ সমাধনে,
হ'ল তা জগতে বিদিত।
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম;—
শীঘ্র আসি' তাও পূর্ণ কর শ্যাম!
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে করেছি
সবযজ্ঞের আয়োজন!
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়,
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ,
তোমারি ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ ॥
করে যজ্ঞের সঙ্কল্প প্যারী
আছেন যজ্ঞ বেদিতে বসিয়ে
সজল জলধরে করিয়ে ধ্যান,
তৃষিত চাতকিনী হোয়ে।

* লোকে যুগী বা লক্ষ্মীকান্ত যুগী উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গোর কবিরাজ তাঁহার দলে সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করিয়া যোগান দিতেন। লোকে যুগীর কোন রচনার পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ যুগীর নামাঙ্কিত প্রাপ্ত একটি মাত্র সঙ্গীত (প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান, পৃঃ ৭৬-৭৮) এখানে উদ্ধৃত হইল। সম্ভবত ইহাই লোকে যুগীর রচিত বা তাঁহার দলে গীত হইত।

তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, করে সংস্থাপন,
সমিধ আপনারি অঙ্গ ;
যোগিনীর প্রায়, আছেন মৌনে,
ত্যজিয়ে সখীর অঙ্গ ॥
করেছেন রাই আত্মমন সংযোগ,—
অপেক্ষা নাই সবই হয়েছে ত্রিযোগ।
আপনি কর্তা হয়ে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
দুঃখিনীর যজ্ঞ কর সমার্পণ ॥

বিরহ বিষেতে জরা ;
আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার,
বহিতে দুঃখের পসরা ॥
আমার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এমন,
যেন এ দেহের সঙ্গেতে,
করিছে প্রাণ আকর্ষণ
মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ কোরে ॥

সজনি গো! আমায় ধর গো, ধর,
বুঝি কি হ'ল আমার।
নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,
কে আসি প্রবেশিল অন্তরে ॥
দারুণ বসন্ত তাপে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে,
কৃষ্ণরূপ ভাবতে ভাবতে রাই ;
হলেন অচেতন, ধীরে সখীগণ,
রাইতে রাই আর নাই।
তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয় ;—
একি দায় বিশ্বম্ভরের প্রায়,
কে আমার হৃদয়ে উদয় ?
হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার,
পশিল আমার হৃদি পিঞ্জরে।
রাই, ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহরে।
একে কৃষ্ণবিহনে দেহ শূন্য,
এতে অন্য ভার কি সয় গো সই।
এ দুঃখিনীর তাপিত, অঙ্গেতে
কে আসি হ'ল অবতীর্ণ,
একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে,

এমন দুঃখের সময় কালাচাঁদ,
কেন দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয়।
আমার অন্তরে প্রাণ, বিচ্ছেদ দাবানল,
পাছে তাঁর শ্যাম অঙ্গ সই, দগ্ধ হয় ॥
অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,
কার বা অসাধ ?
কিন্তু ললিতে! কপাল গুণেতে,
ঘটিল হরিষে বিষাদ ॥
কৃষ্ণবিলাসের সই, আমার এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ,
তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ।
সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিলে,
জুড়াই সই! তেমন কপাল আমার নয় ॥

৪

তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে,
কৃষ্ণ বলে ধরতে যায় ॥
আমরা তায় বলি করে ধরি,
ও রাই ধোর না গো ও নয় শ্রীহরি ;
তবু, কই কৃষ্ণ বলে, প্যারী মূর্চ্ছা যায় ॥

রাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আসি কংসধাম।
শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে,
পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম।
ব্রজে শ্যামবিচ্ছেদ প্যারী প্রলাপ দেখে—
(রাধানাথ হে!) তোমার রাই বলে,—
হৃদ্‌পদ্মের নীলপদ্ম নিলে কে।
কেন এমন হলেন প্যারী
নারী বুঝিতে নারি,
শ্যাম হে, তোমার,
সমাচার দিতে এলেম মথুরায়,
একি ভ্রান্তি হ'ল শ্রীরাধার, কহ শ্যামরায়।
কেউ বা বীণে লয়ে, বসন্তরে,
বিনয়ে বীণের প্রতি খেদ জানায়।
ওরে ও বীণে! ব্রজে শ্যাম বিনে,
বীণে আজ শান্ত স্বরস কে বাজায়॥
কেবল নারদ বাজায় বীণে, সে বিনে,
তুই সাজবি নে, বাজালে স্বরস বাজবি নে;
বলি শোন্ বীণে রে, আমরা নবীনে রে,
বীণে কি নারী করে শোভা পায়।
তুই ত যাবি নে রে, যাবি নে যথা শ্যামরায়।
হরি বিনে মোর বীণে,
তোর রসেতে আর ডুবিনে,
ও রস ভাবি নে রে—ও রস ভাবি নে-
বলি বারে বারে, যা বীণে, যমুনা পারে,
না গেলে সেই মধুপুরে, কৃষ্ণ পাবি নে।
তুই কাঠের বীণে, বসন্তে রে,
কৃষ্ণবোল বল বীণে—বল বিপদ যায়॥

মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ করে রাই,
বনফুলের মালা গেঁথে পাঠালে।
আজ কুব্জার প্রেম সম্বোধনে,
বসে রাজ সিংহাসনে,
হ্যাদে হে চিকণকালা!
রাই দিলে চিকণ মালা,
ও মালা কার গলায় দিব মধুমণ্ডলে॥
কুসুম হার করে লয়ে,
বৃন্দে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায়;
বধু হে, এলে রেখে, শ্রীমুখ না দেখে,
শোকে রাই অশোক বনে সীতার প্রায়
তোমার মধুর বৃন্দাবন,
কুঞ্জবন ফেলে রাখে,—
মনের বিষাদে, তোমার বিচ্ছেদে;—
বসন্তে কিশোরী, বনে ভ্রমণ করি,
"কোথায় হে বনমালি!" বলে কাঁদে
রাধার চোক্ষের জল চন্দন-মাখা,
মালায় আছে রেখা, লেখা কৃষ্ণনাম;
কৃষ্ণ, তায় পথে পথে কাঁদালে॥
করে চিত্র বিচিত্র সাজালে
(শ্যাম হে, তোমার গরবিণী রাই
বনের কুসুম তুলে, নানা জাতি,
জাতি যুথী,—
দগ্ধ হয়ে শ্যাম শোকে,
মুগ্ধ মধুর বন দেখে শ্যাম হে!
তোমার গরবিণী রাই,
মধুর ভাবে গেঁথেছিল মধুমালতী

হয়ে বিচ্ছেদ ব্যাকুল, বকুল ফুল,
গেঁথে মালা প্যারী সে জ্বালায়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, গেঁথে কৃষ্ণকলি,
মূর্চ্ছা যায় কৃষ্ণ বলে পড়ে ধূলায় ॥

কৃষ্ণ দেখ হে, একবার দেখে যাও,
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।
ব্রজের দুখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হয়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে গেল॥
বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ।
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ তাপে দগ্ধ,
তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।
শুক সারী ডাকে না হে কৃষ্ণ বলে;
মধুকরের মধু মধু রব, সে রব নাহি হে
কোকিল নীরবে বসে আছে তমালে।
হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন!
এ মধুর কাল ফলে শুকাল॥
কেন শ্যাম, তার গোকুলে পাঠালে বল
ব্রজধাম ঋতুরাজের আগমনে,
নব, নব, তরুলতা সব,
সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে,
তাহে মলয় সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন,
বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল॥

৭

বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে
সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি,
কি দুখের দুখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত রাই বলে।
বৃন্দাবন-বাসিনী আজি কি প্রমাদ ঘটালে।
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কোন্ ক্ষণে,
পত্র দৃষ্টি মাত্র চিত্ত চমৎকার
যেন ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায়,
পড়লেন এই রাজসভায় হরি,
যেন শক্তিশেল বিঁধলো হৃদ-কমলে॥
শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ,
হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়,—
ওহে কৃষ্ণসখা,
দেখ দেখহ কৃষ্ণের কি ভাব উদয়।
যেন কি ধন হয়েছেন হারা,
কি মনের দুঃখে,
চক্ষের বারি বক্ষে বহিছে ধারা।
হয়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত,
হরি ত্যজে রত্নাসন,
কালবরণ ভূতলে
দুখী তাপী কত দেখিতে পাই,
এই মধুরাজ্য ধামে এসে যায় হে।
এমন কাঙ্গালিনী, শ্যাম মনমোহিনী,
কখন ত দেখি নাই।
কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে,
নারীর বুঝিতে নারি কি লাজে,
সে কোন মনমোহিনী,
দিয়ে মোহিনী.
দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে।

মায়া করে এসে মথুরায়,
কাঙ্গালিনীর বেশে,
কৃষ্ণধন কাঙ্গালের পাছে লয়ে যায়
নারী মায়াবী, জানে ছল,
নয়নে বহে অশ্রুজল
আগে আপনি কেঁদে শ্যামকে কাঁদলো ॥*

সাতু রায়

কও কথা বদন তুলে,
হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই ॥
রাধার অধৈর্যে, এলেম অপাযে,
তোমার কংস রাজ্যের
অংশ ল'তে আসি নাই॥
সঙ্গিনী প্রধানা, রঙ্গিণী সে জনা,
ভঙ্গিক্রমে কৃষ্ণে কয় ;
ছিলে নব্য রাখাল, হলে ভব্য ভূপাল,
এবে সভ্য এই কংসালয় ॥
আমার এই দশা (দেখ হে !)
আমি ব্রজের সেই বৃন্দে ;—
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
পার কি চিনতে, কেন সচিন্তে,
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি, চিন্তা নাই
আধা বদনে রবে যদি, বাঁকা মদনমোহন
তোমার কুব্জার দোহাই।
তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য
কিসে এত ঔদাস্য।
তোমার চন্দ্রাস্য নহে আজি প্রকাশ্য।

যেন সর্বস্ব নিতে এলাম ভাবছ তাই
অন্য মনে কেন রইলে ; কথা কইলে,
ক্ষতি কি তোমার।
(শ্যাম হে) যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন ;
ল'তে হবে না রাধার ভার।
তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে,
তত্ত্ব কর্তে হয় একবার ;
আমরা অর্থলোভে, আসি নাই হে
কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার ॥
সে তো রাজার নন্দিনী, আর রাজ্যেশ্বর ;—
তুমি তো নূতন রাজা বংশীধর ॥
তোমার কি ধর্ম, তোমার কি কর্ম
মর্ম জানতে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই ॥

২

ফেরো উদ্ধব ! শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো না।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না ॥
কৃষ্ণের কথায়,
আজ হেথায় আগমন তোমার ;
গোপিকার বিরহ-বিকার,
করতে প্রতিকার।

* মাথুর-বিষয়ক সঙ্গীতরচনায় কবিওয়ালার যুগে যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণমোহন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সমসাময়িক। ইনি বিভিন্ন কবির দলে গান রচনা করিয়া দিতেন। ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর প্রভৃতির দলেও ইঁহার রচিত সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। ইঁহার রচিত মাত্র সাতটি সঙ্গীত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থের ২০৩-৫ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কৃষ্ণ প্রেমানল, মানানলময় ;—
সে কি নির্বাণ হয় ! দেখ গোকুলময়,
হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টিময় !
দিলে প্রবোধ বারি, কি হইবে তায় !
দাবানলে যে বন জ্বলে,
জল দিলে তা নিবে না।
করি কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না।
দেখলে ত উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব ;—
আমরা গোপী সব, জীবন থাকতে শব ;
সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব।
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা ;
নৈলে বেঁচে কি সুখ আছে মলেই
ঘোচে যন্ত্রণা।

নবীন বিহরিণী বিদেশিনি !
কোথায় যাস্ গো বল,
কুঞ্জবনে ফিরে ফিরে,
কি জন্যে চাস্ ফিরে ফিরে,
নয়নের নীরে নীরে, ভাসে নয়ন শতদল ॥
চঞ্চলা চপলার মত, নিতান্ত চঞ্চল।
হরি ভয়ে করী যেমন, পলাইয়ে যায় ;—
সখি ! তোর দেখি তেমনি ধারা,
ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা, কভু ভাল নয়।
এলি এমনি ছলে বৃন্দাবনে,
ভ্রমণ করিস বনে বনে,
কি আছে তোর মনে মনে,
মনের কথা আমায় বল ॥

দুর্জয় মানেতে হয়ে অপমান,
কালাচাঁদ, সেই মানের করতে শেষ।
ব্রজরাজা, ত্যজে রাখাল সাজ,
যুবরাজ, ধরলেন আজ যুবতীর বেশ।
কপালে সিন্দুর বিন্দু, সহাস্য বদন ;—
তাতে সজল নয়নোপরে,
কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা ধরে বিজুলি যেমন।
হেরে মনমোহিনী মনের সন্ধে
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি বৃন্দাবন কি করতে এলি রসাতল ?
কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো !
গলায় গজমতি দুলছে ;
কবরী আ-মরি কি শোভা পায় !
কনক চাঁপা তায় ঝুলছে।
অঙ্গে সোনা, কানে সোনা,
সেই সোনা গোকুলের ধন ;
প্যারী তায়, দুর্জয় মানের দায়,
মানকুণ্ডে দেছে বিসর্জন
সেই হ'তে নিকুঞ্জেতে,
কেহ সুখী নাই ;—
ভাসে শুকশারী নয়ন জলে,
কোকিল কাঁদে তমাল-ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে
কুঞ্জে কাঁদেন রাই
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,
কেউ কারো কথা শুনে না,
বিরহেতে প্রাণ বাঁচে না,
দুঃখে বহে নয়ন-জল ॥

দেখে তোর ভঙ্গী রঙ্গিণি গো!
চেনো চেনো চেনো জ্ঞান করি;
সদাই সন্ধমনে, তাইতে ধ্যানে,
কিছু বলি বলি বলিতে নারি ॥
তরুণ অরুণ, যেন দু নয়ন,
কিরণেতে জগত আলোময়;
শশধর যিনি কলেবর,
অধর তুলনা নাহি হয়।
ক্ষীরোদ মন্থনে যেমন, নীরদ বরণ
সুরাসুরে করে ছলা,
মনমোহিনী চিকণ কালা,
ষোল কলা দেখে ভোলার ভুলে গেল মন
অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই,
এলো থেলো দেখতে পাই,
চ'লে যেতে রাজপথে,
ধূলাতে লুটায় অঞ্চল ॥

৪

চিতেন

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হয়ে,
শ্রী অঙ্গ লুকাইয়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।

পরচিতেন

ভঙ্গী হেরে চমৎকার,
বৃন্দে বুঝে সার
চন্দ্রমুখী প্রতি কায়।

ফুকা

ওগো রঙ্গদেবী একি রঙ্গ,
পদপ্রান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ?

মেলতা

ওযে সাধিছে সাধের কাজ,
কি সাধে অলিরাজ,
পদপঙ্কজরজ কেন মাখে গায়ে?

মহড়া

তাই সুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায়;
হয়ে বিরাগী কি বিরাগে,
কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তোমার রাঙা পায়।

ও যে ধন্য ষটপদ,
অন্য দিকে নাহি চায়

ফুকা

কত প্রফুল্ল ফুল, রাধার কুঞ্জে,
তাতে সুখ কভু নাহি ভুঞ্জে।

মেলতা

পেয়ে পাদপদ্মের সুধা,
ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
মুখে জয় রাধা শ্রীরাধার গুণ গায়।

অন্তরা

ও রাই কি কাল মাধুরী আশ্চর্য,
এই অলি কোথাকার হয়েছে শরণাপন্ন
দেখি চরণে তোমার?

চিতেন

অরণ্যের অলি বল,
কি জন্যে ব্যাকুল,
অন্যে সুধালে না কয়।

পরচিতেন

অতি কুণ্ঠিতের প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
করলে তবাঙ্গে আশ্রয়।

ফুকা

ওঁকে সুধাও দেখি গো রাজকন্তে ?
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্তে ;

মেলতা

করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন
সে ধন পেলে, আবার কি ধন চায়।

চিতেন

হাগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের
পায় করে প্রাণ সমর্পণ ;

পরচিতেন

হোল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল,
অনুকূল কেবল শ্যামধন।

ফুকা

সে ধন সাধনে, হই বুদ্ধি নিধন,
পাপ লোকে তা বোঝে না, কৃষ্ণধন কি ধন

মেলতা

আমার মিথ্যাবাদ, অপবাদ,
দেয় কলার পরিবাদ সই,
আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই।

মহড়া

এখন শ্যাম রাখি কি, কুল রাখি বল সই।
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।*

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী

একবার বলিস ত, আসতে বলি মাধবকে,
প্যারি, তোর সম্মুখে।
ঐ দেখ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে,
কেঁদে বল্‌তেছে—'দয়া কর রাধিকে !' ॥
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে বৃন্দে, শ্রীমতীরে কয় ;
রাধে, কেঁদেছ যার আশাতে নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ, তাহে লজ্জা-ভয় ;—
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের চাঁদ, পাছে রাই হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই দিলেন আমাকে।
যদি স্বেচ্ছা হয় বল গো প্রধানা গোপীকে।
কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত ;—
যেন গ্রহণান্তে শশী উদয় হ'ল আসি,
সবাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।

* ১, ২, ৩ সংখ্যক গীত বাঙ্গালীর গান (পৃঃ ১৯১-৯৩) এবং ৪, ৫ সংখ্যক গীত প্রাচীন কবিসংগ্রহ (পৃঃ ৭৪-৭৬) হইতে গৃহীত।

নাহি সর্বাঙ্গে স্বরাগ হৃদে কলঙ্কের দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে ॥

২

চিতেন

যার মানে মানে রাই,
সাজে না তায় অভিমান।

পরচিতেন

কমলিনী, এমন মানিনী হ'তে
কে দিল বিধান।

ফুকা

যারে তিলেক না হেরে, হও অধৈর্য অন্তরে,
ছি ছি! শ্রীমতী তার প্রতি,
করলে এ মান কি করে।

মেলতা

করলে যার উপর অভিমান,
শেষে তার লাগি ব্যাকুলিত হ'ল প্রাণ,
এমন মান্ করে কি লাভ হ'ল কিশোরী ;—

মহড়া

ধিক তোর মানে মানময়ী রাই,
একি লাজ আমরি মরি।
করে মান হ'ল অপমান,
এখন কোন্ লাজে আসতে বল হে হরি।

৩

চিতেন

আসিয়া কংসধামে বৃন্দে,
গোবিন্দের পদে ধরি কয়।

পরচিতেন

বহুদিনের পর দরশন পেলাম দয়াময়।

ফুকা

ভাল ভাল ভাল ওহে কাল শশী,
একবার দাসীর পানে ফিরে চাও হে,
কিছু সরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।

মেলতা

তুমি ব্রজের ধন, গোপীর সর্বস্বধন,
বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায় ;

মহড়া

ওহে কৃষ্ণধন দিয়ে কি অমূল্যধন,
কুবুজা কিনেছে তোমায় ?
আমার ভক্তিধন, আর প্রেমধন
দিয়ে তোমার শ্রীপদে লয়েছিলাম স্মরণ ;
তবু রাধানাথ, রাখিলে না রাঙ্গা পায় ;

খাদ

বল শ্রীপদে কিসে দোষী হল গোপীকায় ?

ফুকা

ধন মন দেহ যৌবন তোমায় দিয়ে
তোমার রাঙ্গা পায় রাধানাথ হে
আমরা জনমের মত আছি বিকায়ে।

মেলতা

তুমি হ'লে না অনুকূল,
মজালে গোপীর কুল,
অকূল সাগরে গোকুল ভেসে যায়।

৪

চিতেন

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো বৃন্দে,
রাজারে জানাই সবিশেষ ;

পরচিতেন

নাহি পারবে যেতে রাজসভাতে,
আজ্ঞা না দিলে হৃষীকেশ।

ফুকা

আছে ভূপতির এই অনুমতি জেন,
কেহ পারিবে না যেতে, রাজসভাতে,
না হলে রাজ-আবাহন।

মেলতা

যদি যাইতে অনুমতি, করেন যদুপতি,
তবে করিবে শ্রীপতি দরশন।

মহড়া

রাজ আজ্ঞা বিনা সবে রাজসভায়,
বাসনা এ তোমার এ কেমন ;
আগে জানাই গে রাজাকে,
যদি আজ্ঞা করেন যেতে তোমাকে,
তবে যেও গো দেখ মথুরার রাজন্।

খাদ

সামান্য ভূপতি নহে মদনমোহন।

ফুকা

যোগী ঋষিগণ রাজ দরশনে আসে,
রাজ অনুমতি লয়ে হৃষ্টমতি
দেখে গে রাজায় শ্রীনিবাসে।

মেলতা

তুমি সহজে রমণী, তাতে কাঙ্গালিনী,
ছেড়ে দিতে গো নারি তোমায় কদাচন

৫

চিতেন

বৃন্দে শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তে হেরে,
কাতরা হয়ে খেদে কয়,—

পরচিতেন

একে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ দহিছে—
তাতে আর কি এত জ্বালা সয়।

ফুকা

এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্র তনয়,
হোত তাতে হে বসন্তে নিত্য সুখোদয়।

মেলতা

এখন সে সুখ হরি—হরি, ব্রজধাম পরিহরি,
ব্রজনাথ গেছেন যমুনার পার।

মহড়া

দেখ কৃষ্ণ বিহনে, হে ঋতুরাজ,
এই দশা গোপীকার ;
কেন এ সময় বসন্ত, কোরে গোপীর প্রাণান্ত,
এলে গোকুলে ;
তোমার কোকিলের স্বরে প্রাণে বাঁচা ভার।

খাদ

মাধবে মাধব-অভাবে সবে শবাকার।

ফুকা

দেখ এই সেই ব্রজেশ্বরী, স্বর্ণলতা রাই,
ধূলায় লুণ্ঠিতা শ্রীমতীর সে সুবর্ণ নাই !

মেলতা

কৃষ্ণ বিরহে অনিবার, নয়নে শতধার,
বহিছে সদা ঐ শ্রীরাধার।

৬

চিতেন

আমি মাধবের মধুধাম, কৃষ্ণপদে প্রণাম,
করিয়ে বৃন্দে দূতি কয়—

পরচিতেন

বংশীধর, অনেক দিনের পর,
ও চাঁদবদনে দেখলাম দয়াময়।

ফুকা

কথা কও—কও—কওহে চিন্তামণি,
কেন কৃষ্ণধন থাকিতে রাই কাঙ্গালিনী।

মেলতা

করি রাই পক্ষে পক্ষপাত,
হলে হে কুবুজার নাথ,
মরিল রাই, চক্ষে একবার দেখলে না :

মহড়া

হোক হোক পূর্ণ হোক
কুবুজার মনোবাসনা ;
কুবুজা দিয়েছেন চন্দন দান,
বাড়ালে দাসীর মান,
আবার তার বামে দিলে স্থান ;
তবু রাধার বই কুবুজার শ্যাম
কেহ বলবে না।

৭

চিতেন

বল সই কি কথা
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।

পরচিতেন

তবে কর্মান্তরে হলে স্বতন্তর,
তুষতে নারি প্রাণ তোমার।

ফুকা

তা বলে ভেব না প্রিয়ে আমায় পর।
আমি নহি ত পরের প্রাণ,
তুমি না পরের প্রাণ
তোমারি বাঁধা নিরন্তর।

মেলতা

পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর,
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না

মহড়া

কও কে শেখালে হে তোমারে এমন
ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা।
বিনা দোষেতে দুষো না,
সুখের প্রেমে দুখ দিও না ;
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না।[১]

পরাণচন্দ্র

॥ ভবানী-বিষয়ক ॥

চিতেন। ভক্তিভাবে ভবানী শিবানী পূজলে পদদ্বয়।
শুনি পুরাণে, প্রমাণে, শ্মশানে কি মশানে,
হয় রণে রাজস্থানে সর্বত্র বিজয়।

১ ১ সংখ্যক গীত 'বাঙ্গালীর গান' হইতে এবং ২-৭ সংখ্যক গীত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' হইতে গৃহীত।

অন্তরা। সত্যকালে সুরথ রাজা, করে তোমার চরণপূজা,
সেইকালে, ওগো শিবে, সেই অন্তিমকালে,
ঘুচে গেল উপসর্গ, পেয়েছিল চতুর্বর্গ,
শেষে হোল অক্ষয় স্বর্গ ভক্তের কপালে।

মিল। তাই জেনে শুনে আমার মনে ভরসা হোল মা,
বাঁচবো আমি যত দিন, পূজবো কালী তত দিন,
কালী বলে হয় যদি কাল, নির্ভয়ে কাল কাটাবো।

মহড়া। তারা-নাম সাধন জোরে যুদ্ধ করে যমকে হারাব।
শ্রীরাম যেমন যুদ্ধকালে, পূজেছেন নীলপদ্ম ফুলে,
শ্রদ্ধা করে মা,
দিতে সেই নীলপদ্ম, আমার সাধ্য নাই শ্যামা,
দেহে আছে পদ্মবন, তাতে করি পদ্মাসন,
হৃৎপদ্মে মা পূজে চরণ, মনের মানস পূরাব।

মিল। কালীপুত্র হয়ে কি মা কালকে ডরাবো।
কালী কালী বলবো মুখে, কাল পালাবে আমায় দেখে,
কাছে আসিবে না, শালিবাহনের সেনা,
উগ্রচণ্ডা মতি ছেড়ে, সিংহলে শ্রীমন্ত ঘেরে, কাটতে পারলে না।
তারা তারা তারা বলে, ডাকি সারাদিন,
ফলবে না কি নামের ফল?
কারে শঙ্কা আছে বল?
কালী বলে হয় যদি কাল, নির্ভয়ে কাল কাটাবো।

॥ মান-বিষয়ক ॥

চিতেন। পরমা প্রকৃতি রাধে, পরম ভ্রান্তির দায়।
পরম পূজ্যধন শ্যাম, মানে রাই ত্যজ্য করলেন তায়।

অন্তরা। বিষম দায়, প্রেমের দায় গো, সেই দায়ে শ্যাম দায়গ্রস্ত,
শশব্যস্ত গলবস্ত্র, ত্রস্তে ব্যস্তে যুগল হস্তে ধরলেন রাধার পায়।

মিল। দেখে শ্যামকে নীল পদ্মাকৃতি, রাধার পাদপদ্মে স্থিতি,
বৃন্দে কয় ওকি ভাবে এ ভাব উদয় আজ তোমার কাছে,—

মহড়া। একি দেখতে পাই, আজ তোমার রাই,
নবীন নীলপদ্মে পূজা কে কোরেছে ?
যখন তরুণ অরুণ উদয় হয়,
তার কোলেতে মেঘোদয়, হলে হয় যেমন, এখন,
এমন শোভা এলোকেশে কেউ দেখে নাই কোন কালে,
যজ্ঞোৎপলে নীলোৎপলের মিল হয়েছে।[১]

সীতানাথ মুখোপাধ্যায়

॥ ডাক-মালসী ॥

১

গিরিবর নন্দিনী, ও শিবে ; তুমি অযোনীসম্ভবা জনক-দুহিতে,
সীতানাথের হিতে অসীতে সীতে, রাধিকে রসরঙ্গিণী,।

[অসম্পূর্ণ]

॥ সখী-সংবাদ ॥

২

হারায়েছি নীলকান্তমণি, অনাথিনীর বেশ সাজিয়ে, দে গো বৃন্দে সখি।
গেছেন যে পথে আমার বনমালী, দূতী এনে দে গো সেই পথের ধূলি ॥
অঙ্গে মাখিয়ে দে, প্রাণ জুড়াই তার বিচ্ছেদে,
নয়ন মুদে হৃৎপদ্মে কালরূপ নিরখি।
আমি সদাই থাকি গো বৃন্দে মুদে আঁখি ;—
আর লোকের কাছে, এ মুখ দেখাব না সই, দূতি গো (ওগো)
যদি এলো শ্যাম কালো রতন, কাজ কি আর সামান্য রতন,
প্রিয় বিনে কি প্রিয়জন অঙ্গের আভরণ।
যেমন হারায়ে মাথার মণি, ব্যাকুলা হয় ফণিনী,
তেমনি প্রাণের নীলমণি বিনে গোকুল শূন্য দেখি।

[১] প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত

॥ মাথুর ॥

কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়।
গোপাল হারা ব্রজের গো-পাল তৃণ নাহি খায়।
ব্রজাঙ্গনা কেঁদে অন্ধ ব্রজেতে নাই সে আনন্দ
তোমার প্রেমাধিনী কমলিনী উন্মাদিনী প্রায়॥

৭

চিতেন। বসন্তকালে ব্রজে আসিয়া, হেরিয়া দুঃখ সমুদয়।
পুনরায় মথুরায় রাজসভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়॥
শুন ওহে বনমালী, বৃন্দাবনের বার্তা বলি, পত্রাবলী করে এনেছি।
ভাণ্ডর বন, তমাল বন, মধুবন, আর নিধুবন, ভ্রমণ করেছি॥
করতে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে,
তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে।

মহড়া। দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন-ধাম, কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই, জলে কমল নাই,
শুধু রাইকমল ধূলায় পড়ে রয়েছে।
বনের কথা মনের কথা কই তোমার কাছে॥
ফুলে মূলে, জলে স্থলে, সকলেতে সমান জ্বলে.
নয়নজলে ভাসে অনিবার।
হাহাকার সবাকার, গোপীকার প্রেমবিকার, না হয় প্রতিকার॥
তোমা বিহনে গোপীকার, হয়েছে অতি শীর্ণাকার,
দুখের অলঙ্কার, অঙ্গে সবাই পরেছে।

অন্তরা। সুখ-শূন্য সবে শোকাকুল তোমা বিহনে বনমালী. হে।
যেমন শ্রীরাম বিহনে, অযোধ্যাভবনে, ব্রজের গোপীগণ তদ্‌প্রায় সকলি হে॥

চিতেন। সানন্দ উপনন্দ, শ্রীনন্দ, কহিছে মনের বিষাদে।
গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথা রে আছিস দেখা দে॥
যশোদা রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি,

বলে বিধি কি করিলি হায়;

মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, আয় গোপাল, কোলে আয়,

আয় রে গোপাল আয়।

সেথা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেথা হয়েছ ভূপাল,

ব্রজের রাখাল সব গোপাল বলে কাঁদিছে।[১]

রমাপতি ঠাকুর

বেহাগ

সখি, শ্যাম না এলো।

অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমনি পোহালো॥

ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক-কিরণ উষার প্রভায় হল সঙ্কীরণ

পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃসমীরণ কুমুদিনী হাস্য-বদন লুকালো।

শর্বরীভূষণ খাদ্যোতিক তারা দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা

নীলকান্ত মণি হোল জ্যোতিহারা, তাম্বূলের রাগ অধরে মিশালো॥

সখি, শ্যাম না এলো।

তাপিত হৃদয় রমাপতি কয় এ বিরহ ধনি তোমা বলে নয়

বুকচয় হল অশ্রুধারাময় রজনীর সুখ-বিলাস ফুরালো।'

সখি, শ্যাম না এলো।[২]

রামরূপ ঠাকুর

শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখিগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।

যেমন চাতকিনী পিপাসায় তৃষিত জল আশায়

কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী॥

১ ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় কবির নিবাসস্থল নির্দেশ করিয়াছেন হুগলী জেলা। তবে ইনি যে পূর্ববঙ্গে কবিগানের পশার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাও বলিয়াছেন। ঢাকা জেলার কবিওয়ালা মহেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত পূর্ববঙ্গে কোন আসরে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় ইঁহাকে 'পূর্ববঙ্গের ওস্তাদী কবি' বলিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে ইঁহার খ্যাতি অধিক ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, মনে হয়। সীতানাথের সঙ্গীত, চিন্তামণি ময়রার দলে গীত হইত। বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত ইঁহার গীতসমূহ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান এবং প্রাচীন কবিসংগ্রহ হইতে গৃহীত।

২ বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব, পৃঃ ৩১৩।

তুলে জাতি যূথী কুটরাজ বেলি গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্ধ-বিকশিত যাতে বনমালী হরষিত—
সাজাল রাই ফুলের বাসর আসবে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হ'ল বিপরীত,—
ফুলের শয্যা সব বিফল হ'ল, অসময়ে চিকণকালা বাঁশী বাজায় !—
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে,
ফিরে যাও হে নাগর, প্যারা বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে,—
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে—
ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে ;—
বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রসময়,—
বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম নয় ;
তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে তুই-এর মন কি রক্ষা হয় ?
প্যারী ভাগের প্রেম করবে না রাগেতে প্রাণ রাখবে না
এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে ॥[১]

মহেশ ঠাকুর

॥ সখী-সংবাদ ॥

মহড়া । মধুর বসন্তের আগমনে বৃন্দাবনে
কি দেখতে তুই এলি মদন ।
অন্তরা । যেদিন অক্রুর মুনি রথে চড়ে, কংসের যজ্ঞে সে মধুপুরে,
গিয়েছেন কানাই, মদন বলি তাই, হায় হায় রে,
সেদিন হইতে কমলিনী, মণিহারা যেন ফণী, ধরায় পড়ে আছে ধনী,
আর তো উত্থান শক্তি নাই ।
মিল । আমরা ব্রজাঙ্গনা, করি সেই ভাবনা,
হয়েছে কাল সোনা, গোপীর জীবন ।
গোকুলের আর কি সুখ আছে,

১ অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের মতে কবির নিবাস পূর্ববঙ্গ । গীতটি বঙ্গের কবিতা (পৃঃ ৩১৩-১৪) হইতে গৃহীত ।

সকল সুখ হরে নেছে দিয়ে বিধি ;
কি দোষে হারা হলেম কৃষ্ণ গুণনিধি !
সহে না এত কষ্ট, বল কবে পাব কৃষ্ট,
সদা হায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে করছি রোদন।

দোলন। রাধার দশা দশম দশা দেখে যা।
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে সকলি রাধার বিপক্ষে।
ব্রজেতে নাই শ্যাম জলধর, ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বাঁচা ভার।
মদন রে তোর বিষাক্ত শর হানিস নে আর বক্ষে ॥[১]

চিন্তামণি ময়রা

॥ ভবানী-বিষয়ক ॥

চিতেন। জয়ন্তী মঙ্গলা জয়া তুমি গো যোগেশ্বরী যোগাদ্যে।
ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণধারিণী, ত্রিদিবারাধ্যে।

অন্তরা। তুমি তারা পরাৎপরা, কঙ্কালী কালরূপধরা,
অতীতে রূপধারিণী, তন্ত্রে মন্ত্রে অধিষ্ঠাত্রী শিবানী।
বিশ্বজয়ী বিশ্বরূপ, দৈত্যদল দুর্গারূপ,
(আবার) কমলে-কামিনীরূপ হও গো জননী ॥[২]

গুরুদয়াল চৌধুরী

চিতেন। রাধামন্ত্রে দীক্ষা, আমি সই,
শুন কই, আমার শ্রীরাধা মূলাধার।

পরচিতেন। রাধার প্রেমেতে বাঁধা, রাধা প্রাণ-আধা
জপি নাম সদা শ্রীরাধার।

ফুকা। রাধা ব্রহ্মময়ী, আদ্যা সনাতনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারিণী, কমলিনী সই রে—
প্রধানা গোপিকা গোলকবাসিনী,

---

১ ইঁহার যথার্থ নাম মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী। পূর্ববঙ্গে কবিওয়ালা বলিতে রামরূপ ঠাকুর এবং মহেশচন্দ্রের নামই সর্বাধিক বিখ্যাত ছিল।

২ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

মেলতা। সেই শ্রীরাধার সঙ্গিনী, ওই বৃন্দে রমণী,
এসেছেন এই মধুভুবনে।
মহড়া। আছেন প্রাণেশ্বরী, রাধে রাসেশ্বরী, শ্রীবৃন্দাবনে।
আমি সেই রাধার মানের দায়,
ধরে সেই রাধার পায়
বিক্রীত হয়েছি রাই-চরণে ॥[১]

রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতেন। রসিকে প্রেমিকে! তুমি নব যুবতী
পরচিতেন। তিলের তরে নাহি ভাবান্তর,
প্রেয়সী! তোমার প্রতি—
ফুকা। তুমি প্রাণপণে সদা তোমারে,
কেমন কপালের দোষ, তবু দোষ লো আমারে।
মেলতা। আমি অনুগত তোমার অনুক্ষণ,
তবে মিছে দোষ কেন বল না আমায়।
মহড়া। প্রাণ দিয়ে রাখি মান, তুমি প্রাণ—
তবু প্রাণ জালাও একি দায়!
স্বভাব তোমার প্রাণ জালান,
এই দুখে কাঁদে প্রাণ প্রাণ রে,
প্রকাশ করতে নারি, দুখ কব কায়।[২]

রামসুন্দর রায়

চিতেন। একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।
পরচিতেন। তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
ফুকা। সে বিনা এ যৌবন রতন, বল রক্ষক কে করিবে রক্ষণ?
মেলতা। কাহার শরণ লই, বিনা প্রাণকান্তে?

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ১৪০।
২ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ১৫০।

মহড়া। ধিক্‌ সে প্রাণকান্তে এল না বসন্তে ;
খাদ। রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে।
ফুকা। সে যে গেছে সখী দূর দেশ,
আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ;
মেলতা। পতি হয়ে সঁপে গেল মদন দুরন্তে।
অন্তরা। প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে—
হোল না কি তার দয়া রমণী রতনে ?
চিতেন। কন্যা কালের কথা মনে হলে বাড়ে শোক ;
পরচিতেন। আমার জনক তারে দিলেন দান দেখিয়া সুলোক।
ফুকা। করে করে ক'রে সমর্পণ,
তারে বললেন সুখে করো হে পালন।
মেলতা। কথা না হোল পালন, সঁপিলেন মদন কৃতান্তে।[১]

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতেন। নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা ;
পরচিতেন। বিপক্ষে আসিবে সখী হলে চঞ্চলা।
ফুকা। ষড়ঋতু সৃষ্টি বিধাতার,
নিয়মে উদয় হয়, বাধ্য কার নয়,
দোষ দাও মিছে সখী তার।
মেলতা। কি আর শুধাব বসন্তে, এ দুখ অন্তে
কান্ত পাবে ধৈর্য ধরে রও।
মহড়া। পর হবে না নাথ প্রবাসে, অল্পদিন দুখ সও ;
তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধিনী, সই রে,
কেন ঢেউ দেখে তরী ডুবাইতে কও।
খাদ। নব বালিকা নিতান্ত তুমি নও।
ফুকা। ঋতুপতি দিবে পতির সংবাদ,
বল সই কেমনে, ভেবেছ কি মনে,
ঘটল কি বিরহ প্রমাদ।

---

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ৮০।

মেলতা। পতি বিচ্ছেদে এমনি হয়, সখী মিছে নয়,
তা বলে আশা ত্যাগী কেন হও।[১]

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতেন। কর্মদোষে, জন্মভূমে এসে, বিষয় বিষে, অঙ্গ জর-জর।
পরচিতেন। মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর॥
ফুকা। ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী, এ মা,
গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী
সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা গণেশ জননী।
মেলতা। অপর্ণা পার্বতী দুর্গা, আপদ উদ্ধারিণী, এ মা আপদ উদ্ধারিণী,
শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গা বই কে রাখতে পারে।
মহড়া। দুর্গে তোর দুর্গা নামে দুখ নিবারে;
তাইতে বিপৎকালে, ডাকি মা তোরে।
খাদ। এ মা কৃপা কত কাতরে।
ফুকা। ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ, তব তত্ত্ব ভুলে,
এ মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এ মা
জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে,
কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা নাম নিলে!
মেলতা। শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, অঞ্জলি দেয় চরণ পরে।
জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ,
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে;
দারুণ বিষের জ্বালায়, বাঁচল ভোলা দুর্গামন্ত্র সাধন করে।[২]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতেন। অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে বাখিতে, কার বা অসাধ।
পরচিতেন। কিন্তু ললিতে, কপাল গুণেতে, ঘটিল হরিয়ে বিষাদ॥

---

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ৯৮।
২ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ১১।

ফুকা। কৃষ্ণ বিলাসের সই আমার এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ।

মেলতা। সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিয়ে,
জুড়াই সই, তেমন কপাল আমার নয়॥

মহড়া। এমন দুঃখের সময়, কালাচাঁদ কেন, দুখিনীর হৃদয়ে উদয়?
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,
পাছে তাঁর শ্যামাঙ্গ সই দগ্ধ হয়।[১]

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিতেন। আনন্দে মগনা, শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।

পরচিতেন। করুণায় সম্ভাষেণ রাণী, গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে।

ফুকা। শঙ্করি, শুভকরি, আয় মা কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডলে, একবার মা বলে, ডাক মা উমা গো আমায়।

মেলতা। তোমা বিহনে তারিণী, যেন মণিহারা ফণী হয়েছিলাম মা, মা, মাগো।
সে দুখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা।

মহড়া। কও মা কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা!
শুনি লোকমুখে শিব, বিহীন-বৈভব, ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছি ছি সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে,
কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।

খাদ। আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা, তত্ত্ব করতে পারি না।

ফুকা বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, দেখে এলাম অন্নদায়।

মেলতা। কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়ণী ভবভাবিনী।
মা মা গো, এ সব দুখ মায়ের প্রাণে সহে না॥[২]

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ২২

২ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ৭।

দর্পনারায়ণ কবিরাজ

চিতেন।	ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী।
পরচিতেন।	কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী।
ফুকা।	কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি, গিরিজা গণেশজননী (মা গো)।
মেলতা।	ত্বং হি শক্তি, ত্বং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী।
মহড়া।	শিব-সীমন্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে, মহাকাল সমভিব্যাহারে, আনন্দে বিহারিণী।
খাদ।	অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী॥
ফুকা।	অকূল ভবসংসারে, তার তারা কৃপা করে, গতি নাহি তোমা বিনা আর (মা গো)
মেলতা।	পদতরি দেহ, তরি মহেশমোহিনী॥[১]

উদয়চাঁদ

মহড়া

উমা গো যদি দয়া করে হিমপুরে এলি
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে,
শোকের পাষাণ বক্ষে ধরে আছি শূন্য ঘরে
কেবল মরি নাই মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম কোরে॥
একবার আয় মা বক্ষে ধরি
পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী ডাক মা বলে॥

খাদ

শোকের অনল ছিল প্রবল এসে নিভালে।

ফুকা

আমি অচলা নারী
অচলের নারী যেতে নারি,
কৈলাসপুরে আনতে তোমারে।
আমার বন্ধু বান্ধব নাই,
কারে আর পাঠাই,
এলে দেখলেম না তোমারে।

মেলতা

তুমি আসবে বলে সজীব বিল্বমূলে,
কল্লেম বোধন তার সুফল
আজ ফললো কপালে।[২]

---

১ প্রাচীন কবিসংগ্রহ, পৃঃ ১০।

২ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

কৃষ্ণলাল

মহড়া

আমার প্রাণ উমা,
আজ কি তুই যাবি গো মা, কৈলাসপুরে।
আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিন দিন সুখে ছিলেম তোর চাঁদমুখ দেখে
আজ কি মা যাবি ছেড়ে,
হিমালয় শূন্য করে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে॥

খাদ

তোমার যাই কথা সহে না আমার অন্তরে
আমি ইচ্ছা করি মা তোমায়,
রাখি এই হিমালয় করিয়ে স্থাপন॥

ফুকা

সদা সর্বক্ষণ হায় হায় গো,
শিবকে পূজবো বিল্বদলে,
তোমায় পূজবো গঙ্গাজলে,
এই কালে পরকালে হবে কাল বরণ।

মেলতা

আমার এমন সুখের দিন
বল আর কবে হবে,
জীবন জুড়াবে, যেও না
হরিষে বিষাদ করে॥

চিতেন

বিজয়াদশমী কাল হোল উদয়
নিতে উমাধনে বৃষ আরোহণে,
গঙ্গাধর এলেন হিমালয়॥

পাড়ন

উমা গঙ্গাধরকে হেরিয়ে মনোদুঃখেতে
মায়ের কাছে যায়।

ফুকা

কেঁদে কেঁদে কয় হায় গো,
দে মা আমায় সজ্জা কোরে,
কবরী বেঁধে দাও শিরে,
যাই মা আমি কৈলাসপুরে,
প্রণাম হই তোর পায়॥

মেলতা

এই কথা শুনে রাণী,
উমার দুখে মরি দুঃখে,
বক্ষ ভাসে দুটি চক্ষের নীরে॥ [১]

সৃষ্টিধর

মহড়া

তোমায় ধরেছি চোর,
ব্রজের কৃষ্ণধন চোর,
চোর ধরে ছেড়ে দিব না।
আনলে রাধার ধন চুরি করে,
ধন সহিতে ধল্লেম তোমারে,
আছে রাজার হুকুম বাঁধবো করে করে
করবো বিহিত দণ্ড তোমায় আর লাঞ্ছনা

খাদ

শিষ্ট বাক্যেতে আমরা ভুলবো না॥

১ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

ফুকা

অক্রূর হে তুমি চোরের শিরোমণি
ব্যাভারে জান্‌লেম তোমায়,
পেলেম পরিচয় হে,
চোর কল্লে সংব্যবহার,
পূর্বের ভাব যায় না তার,
অপরের ধন দেখলে আবার
সাধু-তত্ত্ব ভুলে যায় ॥

মেলতা

তুমি চোরের গণ্য চোরের মান্য হে।
তোমার মত চোর আছে আর ক-জনা।

ভীমদাস মালাকার

তবে কি হবে সজনা,
নাথ মান করে গেল।
প্রাণসই, আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলতে হলো ॥
নিমিত্তে প্রাণনাথেরে করিলাম বারণ
কোরো না কোরো না বঁধু প্রবাসে গমন ॥
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ।
অকালে সকালে প্রেমে হানলে বজ্রাঘাত
নারী হয়ে, করে ধরে, সাধলেম তারে,
তবু না রহিলো ॥ [২]

মনোমোহন বসু

মহড়া

রাই চল্ গো চল্,
চরণ কমল, শরণ লই গিয়ে সকলে!
কিবা পবিত্র পৌর্ণমাসী,
জ্যোৎস্নাময় এই নিশি,
ওগো রাই রাই গো,
সুখের রাস আজ,
লয়ে শ্যাম-শশী!
চল রাধে মনোসাধে,
সাধের ধন কালাচাঁদে
প্রমোদে লয়ে যাই সেই রাসস্থলে!
আয় তোরে আজ সাজাই বনফুলে!
শ্যামের বামে, আজ তোমায় বসায়ে,
জয় জয় রবে, মধুর মহোৎসবে,
নাচ্‌বো গাবো সবে, প্রেমে মাতিয়ে!
যুগল মাধুরী মনোলোভা,
হবে আজ কিবা শোভা,
খেলিবে সৌদামিনী মেঘের কোলে!

চিতেন

পেয়ে বিচ্ছেদের দারুণ তাপ,
প্রেমাশার অপলাপ,
যে বিলাপ করেছ রাধে!
পশু পাখী সখি,
সে ভাব নিরখি,
কুঞ্জে কাঁদছে সব বিষাদে!

১, ২ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

পাষাণ হ'লে, তাও গ'লে যায় দেখে !
যিনি দয়ার আধার, হৃদয়রঞ্জন রাধার,
থাক্‌তে পারেন কি আর, তোমার এ দু'খে ?
বঁধুর, সেই বঁধুর বংশীধ্বনি,
শুন ঐ সজনি,
বাজিছে কুঞ্জদ্বারে রাধা ব'লে

রামকমল

আ-মরে যাই সিন্ধু সোনার চাঁদ
তুমি কওনা কথা কিসের জন্যেতে।
আমি জল পিপাসায় কাতর হলেম,
তোরে জল আনতে পাঠায়ে দিলেম,
তাই তে কি করলি অভিমান।
পথে একলা পেয়ে
কে তোমারে করলে অপমান।
আমার জল পিপাসায় যায় যাবে প্রাণ,
বাপ বলে আয় কোলেতে ॥
মনের কথা ভেঙ্গে বল আমার সাক্ষাতে

তুমি জলের ভাণ্ড ভূমে রেখে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রয়েছ,
গলে বসন লয়েছ,
ভেবে তাই হলেম সারা,
দেখে প্রাণ যায় না ধরা,
আবার ক্ষণে ক্ষণে ধরে ধরা,
রোদন কত্তেছ ॥
দেখছি তোমায় কৃতাঞ্জলি প্রায়
মনে সন্দ হয়।
আবার চোরের মতন কিসের কারণ
রয়েছ সম্মুখেতে ॥
আমি অন্ধমুনি রামকমল হই
শ্যামবাজার তপোবনে বাস।
হরি ভজন হরি সাধন,
হরিপদে মন,
আমরা স্ত্রীপুরুষে
হরিনাম করি বারোমাস ॥[১]

মাধব ময়রা

ও দশরথ মূর্খ মহারাজ
আর তোর মত কাজ করে কে কোথায়।
তুমি অযোধ্যার অজ রাজার ছেলে,
ভাল ধনুর্বিদ্যা শিখেছিলে,
বধ করলে ব্রাহ্মণের সন্তান।
এক সিন্ধু শোকে অন্ধ
অন্ধির যায় দু জনার প্রাণ।
তুই এম্নি ধারা বাসি মড়া
হবি পুত্র শোকের দায় ॥
রাজার সুখে অরণ্যে কাল প্রজা কাটায়

১ মনোমোহন গীতাবলী, পৃঃ ৮২-৮৩। সৌভাগ্যের বিষয় মনোমোহন বসুর গানের সহিত পরিচিত হওবার জন্য 'মনোমোহন গীতাবলী'র অস্তিত্ব এখনও আছে যদিও ইহা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার পর্যায়ভুক্ত।

২ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

বল কোন্ রাজাতে রাত্রি যোগে
মৃগ বধে কাননে।
মারলে বাণ শব্দভেদী,
করলি কেন অবধি,
আমার সোনার পুত্র সিন্ধুনিধি,
বধলি একবাণে ॥[১]

গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ ॥
কেতকী সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়,
হয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
রূপের না দেখি শেষ ॥
ধুতুরা পীযূষ বঁধু করেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমার মুখ, করি অনুমান ॥
তাহাতে হয়েছ প্রাণধন,
আঁখি দুটি উর্দ্ধে উন্মীলন।
মধুভিক্ষা করে বঁধু ভ্রমিতেছ নানাদেশ ॥[২]

গোবিন্দ চন্দ্র

ওরে, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, হের না ও বয়ান।
দেখ সখি, দুটি আঁখি, করে সাবধান ॥
ও পুরুষ, করে নাশ,
নারীর কুল মান ॥
নবঘনশ্যাম-রূপ, মরি কি বঙ্কিম বয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান ॥
মজো না রূপসী,
কালোশশী দেখে রূপবান ॥[৩]

হারাধন পাল

কাল মূর্তি কালী নয়,
উলঙ্গ বেশেতে রয়,
শিবের বরেতে আসি হয়েছে সদয়,—
নাক কাটা কান কাটা বটে
চোখে ঠুলি দিয়েচে।
গর্দান কাটিলে মুণ্ড
বল কার জল খেয়ে বাঁচে ॥
যোগী ঋষি কি তপস্বী,
তার রুধির পান ক'রে
তারা সবাই হয় খুসী ॥
তার অস্থি মাংসে মুনিগণ সব
ব'সে যজ্ঞ ক'রেচে।
গর্দান কাটিলে মুণ্ড
বল কার জল খেয়ে বাঁচে ॥[৪]

১—৩ পর্যন্ত গীত সমূহ প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান হইতে গৃহীত।

৪ হারাধন পাল ওরফে কাল পাল, লালু ও নন্দলালের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় (বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯)।

রামাই ঠাকুর

যত রাখালে ডাকে কাতর হয়ে,
কোথা গেলি কৃষ্ণ তুই ব্রজ তেজিয়ে,
ব্রজের সে ভাব তোমার কিছু
মনে নাই,
গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল ভাই।
কোথা রে ও ভাই কৃষ্ণ বলাই

এ সময়ে কোথা রইলে প্রাণের কানাই,
আয় ভাই তোরা ল'য়ে মোরা
গোচারণে যাই,
তোমা বিনে কৃষ্ণ মোরা গোষ্ঠে যাব না,
তেজব বৃন্দাবন ব্রজে রব না,
ব্রজের যে ধেনু সব তৃণ তেজিয়ে,
হাম্বা রবে ডাকিছে কৃষ্ণ বলিয়ে,
কোথা গেলি কৃষ্ণ তোর দরশন না পাই।

এতদিন গোষ্ঠে মোরা যত রাখাল দল,
যেখানেতে পেতাম মোরা যত বনফল,
আগে মোরা মুখে দিয়ে চেখে দেখিতাম,
মিষ্ট ফল হ'লে তোর বদনে দিতাম,
সে ফল এখন পেলে কারে বা খাওয়াই।

তোমা বিনে কৃষ্ণ মোরা গোষ্ঠে যাব না,
তেজব ভাই বৃন্দাবন ব্রজে রব না,
কে আমাদের মুখ চেয়ে দয়া করিবে,
মুনিপত্নী স্থানে অন্ন কেবা খাওয়াইবে,
রামানন্দ আশাধারী আছে হে সদাই।[১]

রাজারাম গণক

ওমা দুর্গমে দুর্গতি ভয়হারিণি
তারিণী শোন নিবেদন,
তুমি ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম সনাতনী
ব্রহ্ম আরাধিতা ধন,
হরস্বরূপিণী তুমি ত্রিতাপহারিণি
ওমা দিবে নিশি থাকি আমি তব চরণ ধরে।

বল গো জননী আমি জিজ্ঞাসি তোরে,
তুমি মা হরসুন্দরী,
কল্যাণী কিরীটেশ্বরী গণেশ-জননী,
তুমি দশ মুণ্ড চল্লিশ বাহু
হ'য়েছিলে কার ঘরে।
রণবেশ তোমার জানে সংসারে,
রাজরাজেশ্বরী ওমা জিজ্ঞাসা করি
তুমি ঐ রূপ ধরি ব্রহ্মময়ী
দরশন দিলে কারে।
শরৎকালেতে ওমা ভবানী
আপনি হ'লে দশভুজা,
সেই সাগরপারে, পূর্ণ ব্রহ্ম রাম
তোমারে করেছেন পূজা,

১ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৪

মা অষ্টবাহু চতুর্বাহু ছয় বাহু
দুই বাহু আছে নিরূপণ,
হ'ল অষ্টাদশ ষোড়শ ভুজ
অসুর বধের কারণ,
বল কোন্ দেবের কারণ
চল্লিশ হাত করেছ সৃজন
ওমা দশটি বদন হ'লে
কেনে কণ্ড দেখি কিসের তরে।[১]

বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ

এই কর হে বাঁকা শ্যামরায়।
ব'সে আধ গঙ্গাজলে হরি ব'লে প্রাণ যায়,
ব'সে নারায়ণ ক্ষেত্রে হরিনাম লিখি গাত্রে,
যখন ঘেরবে ঐ কৃতান্তে
পাপে ভারি তনু-তরী
জীর্ণ হ'ল ওহে হরি,
তোমার চরণ ধরে তরি
যেন ভুল না আমায়।[২]
রেখ হরি রাঙ্গা পায়।

গৌরমোহন সেন

চিতেন
নিতি নিতি লই এই,
যমুনার জল সখি!
পরচিতেন
জলমধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি।
মেলতা
জলে কি এমন, দেখেছ কখন?
বল দেখি ওগো ললিতে!
মহড়া
জলে কি জলে, কি দোলে,
দেখ গো সখি!
কি হেলে হিল্লোলেতে?
খাদ
পারি না স্থির নির্ণয় করিতে।
মেলতা
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,
নির্মল যমুনা-জলেতে।
অন্তরা
সই! দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জল মাঝেতে!
প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কাল,
ঐ ছায়া কি ইথে?
চিতেন
আরো সখি! কালচাঁদ কি আছে?
পরচিতেন
গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে?
মেলতা
বল দেখি সখি কালচাঁদ কি,
উদয় হয় দিবসেতে?[৩]

১ বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫।
২ বীরভূম বিবরণ' ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০।
৩ গীতরত্নমালা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৬৯।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

তাল রূপক

সওয়ারি

গিয়ে সকল গোপীবৃন্দে,
ল'য়ে প্রাণগোবিন্দে,
রাই! রাই! রাই গো।
বল কোন্ প্রাণে স্কন্ধে উঠেছিলি তার

খাদ

ত্যক্ত হলেম তোর ব্যবহারে,
লক্ষ লক্ষ নমস্কার।

ফুকা

হরি পরম পদার্থ, পরম ধন;—
যখন মত্ত হোস মানে,
ভাবিস রাই সে ধনে,
সামান্য পুরুষের মতন।

মেলতা

একবার যোগী হন শ্যামরায়,
ভস্ম মাখালি তায়,
চোর ব'লে বেঁধেছিলি কতবার॥[১]

চিতেন

দর্পহারী শ্রীমধুসূদন, নামের ধর্ম রেখেছ;

পরচিতেন

কথার সন্দর্ভে, বুঝিলাম তোমার কল্পনা,
সে দর্প চূর্ণ হয়েছে।

ফুকা

রাসে সকলকে ক'রে বঞ্চিতে;—
বঞ্চনা করিলি রাই!
বঞ্চিতা হইলি তাই,
লাঞ্ছনা আর কি তা হ'তে?

মেলতা

ভেবে আপ্ত সুখ শ্রীমতী!
তোর এই প্রকৃতি,
শ্রীপতি কি সে দয়া করবেন আর?

মহড়া

ছি ছি! হোক মা! হোক ব্যানে,
তাই ভাবি মনে,
রমণীর এত অহঙ্কার?

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাল রূপক

চিতেন

তারা! তোর চরণ ভাবিলে পরে,
চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়;

পরচিতেন

সে কথা, বুঝি হয় গো অন্যথা,
মা! মাগো! বলতে করি ভয়।

১ গীতরত্নমালা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৬৮।

ফুকা

আমি-যন্ত্রে যদি মন্ত্রে করি আবাহন ;
গিয়ে জলে কি স্থলে
করি পূজার আয়োজন ;—
যদি মুদিয়ে নয়নপদ্ম,
ও পদে চাই দিতে পদ্ম,
ধ্যানে তোমার শ্রীপাদপদ্ম,
পাইনে দরশন।

মেলতা

যদি একান্ত মনে যোগাসনে থাকি ;—
হ্যাদে গো! আমাদের সাধনের ধন,
শিব করেছে বক্ষে ধারণ,
রক্ষে ক'রে আছে যেন
বাপকেলে ধন পেয়েছে।

মহড়া

ওমা শিবে! এই জীবের পক্ষে
যত মোক্ষ পথ,
ভোলা ক্ষেপা সব দফা
ভুলিয়ে নিয়েছে ॥

সওয়ারি

তারা নাম নিলে হয় অক্ষয় স্বর্গ,
চরণে হয় চতুর্বর্গ,
উপসর্গ শিব তায় ঘটালে দেখি ;
তারার নাম নিলে তোর চরণ নিলে,
জীবকে দিলে ফাঁকি ;
—ছিল আর এক ভরসা অন্তকালে,
মোক্ষ হবে গঙ্গায় মোলে ;
জ'টে বেটা তাও ঘুচালে,
জটায় গঙ্গা রেখেছে ॥

খাদ

ভক্ত বিটেল এমন আর,
বল গো কে আছে ?

ফুকা

সদা চক্ষু মুদে রয়, ঐ পদদ্বয় ছাড়ে না ;
হ'য়ে দিগম্বর, যোগেশ্বর,
যোগ ছাড়া শিব থাকে না ;
লোকে বলে শিব ক্ষেপা পাগল,
কিন্তু বেটা কাজের পাগল
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল
কর্ম ভুলে না।

মেলতা

থাকে থাকে শিব, ডাকে সদাই,
তারা তারা ব'লে ;
বুঝে তারা নামের নিগূঢ় মর্ম,
ব্রহ্মজ্ঞানে ভেবে ব্রহ্ম,
জ'টে বেটা সংসার ধর্ম,
ত্যজ্য ক'রে বসেছে ॥

অন্তরা

আমি কোন্ গুণে তোর চরণ পাব ?
ছেলের হাতে মোয়া নয় যে
ভোগা দিয়ে কেড়ে খাব ;
করি আশয়, পৈতৃক বিষয়,
না দিলে জোর ক'রে লব ;
আমি নাবালক সন্তান, পিতা বর্তমান,
কেমন ক'রে বিষয় প্রাপ্ত হব ?

চিতেন

যদি যোগতত্ত্বে যেতে মন
করে গো উদ্‌যোগ ;

পরচিতেন

যোগাযোগ, কিছু পাই না সুযোগ,
মা! মাগো! দেখি তায় যে গোলযোগ।

ফুকা

এক গ্রন্থ প্রকাশ করলে, দেখ তন্ত্রসার;
অনেক কুতন্ত্র সে তন্ত্র,
অর্থ বুঝে সাধ্য কার?
তাতে একবার বলে কালী ব্রহ্ম,
আবার বলে কৃষ্ণ ব্রহ্ম,
পঞ্চ মতে পঞ্চ ব্রহ্ম,
মোক্ষ মূলাধার।

মেলতা

যত অবোধ জীব পঞ্চমতে,
পঞ্চ পথে ঘোরে,
দেখ ভক্তের পক্ষে ভাঙ্গড় বেটা,
বাধিয়ে দিলে বিষম ল্যাঠা,
শিবের মত নষ্টের জেঠা,
সংসারে কে দেখেছে ॥[১]

১ গীতরত্নমালা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৩৮-৩৯।

অন্যান্য গীত-সঙ্কলন

রামনিধি গুপ্ত

১

কালাংড়া—জলদ তেতালা

যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে,
সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
নিজ গুণে বল শুনি॥
শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
মননে দেখি তোমারে,
ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি॥

২

কালাংড়া—আড়া

সরস বদন তব কমল নয়ন।
মন ষটপদ মম অচল চরণ॥
রতন যতন কর, মম ধন অতঃপর,
অপদ অবল বল হয় অযতন॥

৩

কালাংড়া—জলদ তেতালা

ও কেরে, লুকায়ে মোরে,
যাইছে দ্রুত গমনে।
মন নয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি,
করিবে বল কেমনে॥
আশা সহ মোর মন, রক্ষক তব কারণ,
অন্য ভাব কেনে।
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন,
বুঝে দেখ মনে মনে॥

৪

কালাংড়া—জলদ তেতালা

চল যাইলো সখি সেখানে মনহরণ।
চিত না ধৈরয ধরে, নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরাণ॥
লোকের গঞ্জনা-ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়,
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত,
বিলম্বের নাহি গুণ॥

৫

কালাংড়া—আড়া

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ-অনলে আমি সদা জ্বলেছি॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে, এবে বেঁচে আছি॥

৬

কালাংড়া—জলদ তেতালা

সেই সে পীরিত প্রাণ, পারেলো রাখিতে।
দুখে সুখ অনুভব, যাহার মনেতে॥
প্রেম করা নাহি দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান-অপমান-ভয়, নাহি যার চিতে॥

৭

কালাংড়া—জলদ তেতালা

গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি।
তোমার যতেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ,
জানে কি বিধি॥

কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত মন,
মোর নিরবধি ।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে দিক,
করেছে বিধি ॥

৮

সরফরদা—জলদ তেতালা

কেমনে বল তারে ভুলিতে ।
প্রাণ সঁপিয়াছে যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে ।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে

৯

সরফরদা-কানাড়া—জলদ তেতালা

আর কি দিব তোমারে, সঁপিয়াছি মন ।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥
ইহার অধিক আর, থাকে যদি জান ।
তাহা দিতে নাহি আমি, কাতর কখন ॥

১০

ভৈরবী—জলদ তেতালা

এত কিরে জানি, হরিয়ে লইবে মন,
হাসিতে হাসিতে ও প্রাণ ।।
কিছুই নাহিক দোষ, কি বল সে বিধুমুখ
দেখ দেখিতে দেখিতে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী,
পাসরিতে নাহি পারি,
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে ॥

১১

আশা-ভৈরবী—জলদ তেতালা

উভয় মিলনে সুখ পীরিতি রতন ।
একের যতনে দুখ, না যায় কখন ॥
মন মনেতে মিলন, হলে সুখী হয় প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা হ'লে ভাবহ কেমন ॥

১২

আশা-ভৈরবী—জলদ তেতালা

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনী ।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
যে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনী ॥

১৩

খট্—জলদ তেতালা

বিষম হইল সখি, কি করি ইহাতে ।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, না হেরে মানেতে ॥
প্রবল মন অনল, নয়ন সদা সজল,
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণে, দোঁহার রীতিতে ॥

১৪

বিভাস—তেতালা

তুমি মোর প্রাণ-ধন-মন সকল ওগো,
এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র ।
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা, প্রেম পূর্ণচন্দ্র ॥
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে,
হয়েছি সুস্থির ।
রিপুগণ নিজ জন ; তুই এবে প্রিয় জন,
এমন সময়ে মম, দেখনা কি সুন্দর ॥

১৫

বিভাস-কল্যাণ—জলদ তেতালা

মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ,আইল মনোরঞ্জন,
গাও ইমন্ কল্যাণ ।
নয়ন-কমল মোর, আনন্দ-সলিল পুর,
ভুরু আম্র-শাখা তাহে বাধান ॥

কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুরশ্বাস,
হয়ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভধ্বনি কর,
যৌতুক-স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥

১৬

ললিত-বিভাষ—জলদ তেতালা

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল!
কহিতে না পারি আমি,
কত খেদ উপজিল ॥
নিশির তিমির গুণ, তাতে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর,
হেরি মন কালি হলো ॥

১৭

শ্যাম—জলদ তেতালা

মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনো-ভার, বল না তোমার,
হইল কেন।
জ্বলিলে মান-আগুন, কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি হও সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোঝ বচন ॥

১৮

শ্যাম—জলদ তেতালা

একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ, অধীনি জনে।
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনবাসী,
নাহি তব মনে ॥
চাক্ষুষ বিহনে দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
এবে নিবেদন মোর, মন হইতে অন্তর,
হয়ো না বেনে ॥

১৯

কালাংড়া—জলদ তেতালা

হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
মন তার মনে মিলে,
প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥

২০

কালাংড়া—তেতালা

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয়া সমান ভাষি, মৃদু হাসি তায়।
লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি,
আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥

২১

কালাংড়া—জলদ তেতালা

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই, নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না ॥

২২

সরফর্দা—জলদ তেতালা

বল না আমারে সই, বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম, নাহি করিতাম,
পীরিতে এই ত সুখ, সংশয় জীবনে ॥

২৩

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে
এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে হয় জ্বালাতনে ॥
নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখি, এ রস যে জানে ॥

২৪

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ, না পারি রাখিতে
কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে ॥
চাক্ষুষ বিহনে নাহি উপায় ইহাতে ॥

২৫

কালাংড়া—জলদ তেতালা

মুকুরে আপন মুখ সতত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ দেখি, অপরূপ,
অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে সে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়,
সকলের মুখে শুনি ॥

২৬

কালাংড়া—জলদ তেতালা

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
অদর্শনে দর্শন সুখ, সৌন্দর্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানে হে তোমার আঁখি ॥

২৭

কালাংড়া—জলদ তেতালা

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ,
প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে ॥

২৮

কালাংড়া—জলদ তেতালা

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়াণ
হানিয়া নয়নে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন্ খানে ;
আশার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি.
সচেতন হবে তবে পুনঃ দরশনে ॥

২৯

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে,
দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে
তুমি মোর প্রাণ ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয়।
বারে বারে কত বার,
জানাব আমি তোমার,
তুমি মোর প্রাণ ॥

৩০

সর্‌ফর্‌দা—জলদ তেতালা

অলিরাজ, যেখানে বিরাজ, ভুল না কমলে
দিবা বিভাবরী, তব ধ্যান করি,
ভাসি হে সলিলে ॥

এ রীতি তোমার আমি ঘুচাইতে পারি,
তুমি ভাসিবে নয়ন-জলে।
ইহাতে অধিক আমার যে দুঃখ
কি হবে কহিলে ॥

৩১

মালকোষ—জলদ তেতালা

পলকে পলকে মান, সহিব কেমনে।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে ॥
মলিন মুখকমল, হেরিলে হৃদিকমল,
বুঝে দেখ বিকশিত হইবে কেমনে ॥

৩২

মালকোষ—জলদ তেতালা

হাসিতে হাসিতে মান, সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, কিন্তু কোথা যায় ॥
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভালবাসি,
ইহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায় ॥

৩৩

মালকোষ—তাল হরি

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার,
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন,
বহে তিনধার ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥

৩৪

টোড়ী—তাল হরি

এমন চুরি চন্দ্রাননি, শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ
কথায় কথায় ॥
মনেরে বান্ধিল কেশ,
তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচারে হে তায় ॥

৩৫

মালকোষ—তাল হরি

একি তোমার, মানের সময়,
সমুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম-কাননে, শিহরযে অলিগণে,
হরিষ নিতান্ত।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘন ঘন
মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহেতে উদয় দেখ,
যামিনীর কান্ত ॥

৩৬

দরবারী টোড়ী—তাল হরি

মনের বাসনা সই, সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখ না মোরে,
স'পিয়াছে দুঃখ-নীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা ॥
মিলনে অসাধ কার,
তার ত আছে অপার,
তথাপি সে ত বুঝে না।
হ'লে নয়ন অন্তর,
অন্তরে সে নিরন্তর,
কি জানি কেমন মন্ত্রণা ॥

৩৭

দরবারী টোড়ী—তাল হরি

যবে তারে দেখি, অনিমেষ আঁখি,
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন,
শুন লো সজনি॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিয়ে নবঘন,
বিনা বারি পানে, কত সুখী মনে,
কি জানে না জানি॥

মালকোষ—তাল হরি

নয়ন-জালে ঘেরিলে সকল, ও মৃগনয়
মনকরী মোর পালাবার পথ তার,
নাহি হেরি বিনোদিনী॥
হেতু নিজ প্রয়োজন,
যদি করিলে এমন,
সহাস্য বদনে তোষ, অমিয় বচনে,
উচিত হয় লো ধনি॥

দরবারী টোড়ী—তাল হরি

কেমন রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল, লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না।
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির,
ঘুচিবে অন্তর-যাতনা।
বিনা তার দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না॥

৪০

দরবারী টোড়ী—তাল হরি

নয়নে না দেখে কারে, বিনে-তারে যারে,
প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে,
এতেক বুঝিলাম॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়,
উপায় দেখিলাম॥

৪১

হিন্দোল রাগ—তাল ধামার

বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল
সব প্রফুল্ল ফুল-কানন।
মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তায়,
পিক করে কুহু কুহু, মধুকর আনন্দিত
সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন॥
কি কব সমরঙ্গ, অনঙ্গবিশেষ সাঙ্গ,
শরাসনে করেছে সন্ধান।
বিরহিণী কাতর এমন হেরি,
যেমন শশী দেখি রাহু, অতিশয় উল্লসিত,
যত সহযোগী সহাস্য বদন।

৪২

বাগেশ্বরী টোড়ী—জলদ তেতালা

বিনাদরে, অনাদরে, কে কার বশ।
করিলে আদর হয় হৃদয়-কমল প্রকাশ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন,
হইয়া উল্লাস।
দুই মন তুষ্ট মন এক কি হয় কোন ভাষ॥

৪৩

গৌরী—জলদ তেতালা

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন-জলেতে।
তেমতি নয়ন, বারি বরিষণ, হইবে প্রাণ,
তোমারে ভাসিতে।
কত সুখ আশা করি,
তোমারে হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে ॥
মোর বশ মন, নহে ত এখন, কাতর নয়ন,
কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

৪৪

হিন্দোল—তাল হরি

মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কি কারণে।
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে ॥
আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে,
তারে পারিবে কেমনে ॥
বলেছে সুখে থাকুক, না শুনে সেথা মরুক,
দুখবোধ হ'লে কেহ, কোথা থাকয়ে কখনে ॥

৪৫

ললিত—জলদ তেতালা

পীরিতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে ॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে ॥

৪৬

ললিত—জলদ তেতালা

যতন করি হে যাহারে,
থাকে না সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি,
ত্যজে না আমারে ॥
বিচ্ছেদেরে সতত করি হে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি, চাতুরী সে করে ॥

৪৭

গৌরী—জলদ তেতালা

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ।
এই সে কারণ, রক্ষক-নয়ন,
করিয়াছি দান, মন সহিত ॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবে না কদাচন,
তুমি মোর মনোমত।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন,
ত্যজয়ে কখন, নহে ত এমত ॥

৪৮

সোহিনী—জলদ তেতালা

সখি দেখ লো আমারে কি হ'ল।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল ॥
দিবানিশি সেই রূপ, সদা পড়ে মনে,
পরাণ সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল ॥

৪৯

সোহিনী—জলদ তেতালা

বিধুমুখে মৃদুহাসি, ভালবাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয়, কাতর নয়ন ॥
অধীনি জনেরে কেন, কর এত অভিমান,
তুষিতে উচিত তারে, এই ত বিধান ॥

৫০

সোহিনী—জলদ তেতালা

তোমার পীরিতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে, দুখেতে ডুবিল।
নহি সুখ-অভিলাষী পীরিতে তোমার,
কর যাহাতে এ দুখ যায় হে আমার।
ইহাতে সদয় হয়ে, হও অনুকূল॥

৫১

সোহিনী—জলদ তেতালা

শশিমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে।
শুন প্রাণনাথ, ধন প্রাণ চিত,
আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে॥
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেব না অন্তরে
দেখনে বিস্ময় কিবা বুঝ না বিচারে॥
যাচকের মান, রাখিতে রাজন,
ক্ষতি কি কখন, মনেতে করে॥

৫২

সোহিনী—জলদ তেতালা

কি হ'ল আমার সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাসরি॥
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি॥

৫৩

সোহিনী কানাড়া—তেতালা

পীরিতের রীত যে, থাকিলে অন্তরে,
দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি,
বুঝাব কি তোমারে॥
বিচ্ছেদ দুখেতে দুখী হয় দুই জন,
কেহ সুখী কেহ দুখী না হয় কখন।

৫৪

ছায়ানট—জলদ তেতালা

সতত বাসনা যারে, হরিষ হেরিতে।
তাহার বদন, বিরস কখন,
না পারি দেখিতে॥
জীবন-বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারী জন, কভু বিষ পান,
পারে কি করিতে॥

৫৫

শ্যাম পুরবী—তাল হরি

ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ,
এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন,
না বুঝে করে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন॥

৫৬

শ্যাম পুরা—তাল হরি

কমলবদনী লো চঞ্চল মৃগবৎ
এত অধৈর্য কেন।
এই বোধ হয় মোর, হতেছ যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগ নয়ন॥
রাত্রি দিন যারে ভাব, সেজন নিতান্ত তব,
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরী,
তোমার এরূপ হেরি, দুঃখিত মম মন॥

৫৭

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা

তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ,
বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা দরে আপন জোরে।
হৃদয়-মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি।
সেখানে প্রবেশ কারো,
তোমা বিনা আর রাখিব কারে॥

৫৮

বাগেশ্রী কানাড়া—জলদ তেতালা

রতন পাইয়ে কেবা, যতন না করে।
হেরিতে যাহারে, হরিষ অন্তরে,
মনের তিমির হরে।
তিলেক অদর্শন, হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ,
আজিও তাহার তরে॥

৫৯

বাগেশ্রী মুলতানী—তাল হরি

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখ না।
পূরাইতে মনোভব মনের বাসনা॥
বিকচ কুসুম বন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরী সহিতে সুখে, করিছে যাপনা।
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এ রবে বড়, পেতেছে যাতনা॥

৬০

ইমন—জলদ তেতালা

জগতে জানিল আমারে, তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকুল জীবনে॥
তুমি কূল নাহি দিলে, কূল কোথা পাব,
অকূল পাথার হতে, কেমনে তরিব;
উচিত সদয় হতে, অবলা সরলা জনে॥

৬১

আড়ানা বাহার—জলদ তেতালা

বিরহ-যাতনা, সখিরে,
অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত।
কুসুম-সৌরভ, কোকিলের রব,
সহেনা ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকরসম মম মনে,
জ্বালায় জীবন মন্দ, মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত॥

৬২

ইমন—জলদ তেতলা

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে
তিলেকে তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে।
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে॥

৬৩

ইমন—জলদ তেতালা

ছাড় মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাছে
আমার কি আছে লাজ,
তোমার কাছে॥
সময়ে ধরিলে পায়,
তাহা প্রাণ শোভা পায়॥
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে॥

৬৪

ইমন কল্যাণ—তেতালা

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন,
প্রাণ)
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,
আপন পরাণ, সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হইলাম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ॥
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি, দেখিতে রোদন ॥

৬৫

ইমন কল্যাণ—তেতালা

তুমি কি জানিবে আমার মন,
মন আপনারে আপনি জানে না।
জানহ যেমন, করহ যতন,
ইহাতে হে প্রাণ, আন করো না ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পীরিতের পথ, সুগম যেমত,
বুঝেছ তুমি তো, কারেও বলো না ॥

৬৬

ইমন কল্যাণ—জলদ তেতালা

জানি হে নাথ, তোমার যেমত,
পীরিতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হ'রে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন-সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার ॥

৬৭

ইমন ভূপালি—তাল হরি

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ,
বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মন, করেছিলাম প্রাণপণ,
তুমি তো বুঝিলে এবে, পুরিল সাধন ॥

৬৮

কানাড়া—জলদ তেতালা

দেখ দেখি কি সুখ সখী, এমন পীরিতে।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবানিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয়-'পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জ্বলিতে ॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচ জন সুখ-লোভে ডুবালে দুঃখেতে ॥

৬৯

কালাংড়া—জলদ তেতালা

এস রসরাজ বিরাজ নলিনী-ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ,
কেতকী কণ্টকে কেনে ?
যেমন যতন আমি করি হে তোমারে,
তেমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ,
বুঝিতে না পার মনে ॥

৭০

কাফী—জলদ তেতালা।

একি চাতুরী সহে প্রাণ
তোমার পীরিতে দিবানিশি ঝুরে আঁখি।

এত যদি ছিল মনে, পীরিতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি ?
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হ'লে দেখ না হে দেখি ॥

৭১

কাফী পলাশী—তাল হরি

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন, মনে মনে মিলন।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর,
অন্তরে অন্তর পশিল ॥
উভয়ের প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব, মজিল ॥

৭২

কামোদ—তাল হরি

পীরিতে কি সুখ সই,
সে না পারে লাজ ত্যজিতে।
মনে উপজয় সুখ, লয় হে দুখেতে,
কখন বাসনা নহে তিলেক তাজিতে,
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে ॥

৭৩

কামোদ—জলদ তেতালা

প্রাণ জানতো তুমি পীরিতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত ॥
সুখের আশয়ে মন উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুঃখেতে সঁপিছ চিত।
তেত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না,
জ্বালালে জ্বলিতে হয়, অধিক কহিব কত ?

৭৪

কামোদ—তাল হরি।

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে।
যাও নাথ শীঘ্রগতি, কামিনী কাতর অতি,
তোমারে ভাবিয়ে।
তার সুখ দুঃখ দিয়ে,
আইলে কি লাগিয়ে ॥
শুন ওহে অলিরাজ,
আসিতে না হলো লাজ,
এখানে ফিরিয়ে।
সখার উদয় দেখা নহিলে কভু কি হয়ে ॥

৭৫

কামোদ—জলদ তেতালা

জানিরে প্রাণ যেমন,
তোমার আমারে যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার,
কঠিন পরাণ ॥
দুখ বিনে সুখ, নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে,
যে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর,
করেছ বিধান ॥

৭৬

কামোদ খাম্বাজ—জলদ তেতালা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

কামোদ—জলদ তেতালা

বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে।
তৃষায় অনল, করে জল জল,
জলধর জল হর কেনে।
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর,
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কি সে বাঁচিবে প্রাণে॥

৭৮

কেদারা—জলদ তেতালা

প্রেমবাণ প্রাণ, আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার,
বল কি করিলে॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ,
নিক্ষেপ করিলে।
এ কথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে,
কামিনী মণ্ডলে॥
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, সুখ দরশনে, দুখ না দেখিলে॥

৭৯

কামোদ গৌড়া—ঢিমে তেতালা

দুখেতে কহিতে আঁখি,
আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল।
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
সময় পাইয়ে দিব, সমুচিত ফল॥

৮০

কামোদ খাম্বাজ—তেতালা

ছাড়িলে তো ছাড়া না যায়।
ছাড়া হেন রব হ'লে প্রাণ বাহিরায়॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায়॥

৮১

কেদারা—জলদ তেতালা

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সময়, হইবে নিদয়, ছিল না মনে॥
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ, শূন্য দেহে এল প্রাণ,
বারিধারা, বহে নয়নে।
বিরহ-অনল, হইল শীতল, তব দরশনে॥

৮২

কেদারা—জলদ তেতালা

হিম শিশিরে নীরে কেন,
আসিবে হে মধুকর।
জীবন থাকিতে, সতত দেখিতে,
না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর॥
যত দিন আছে প্রাণ, দিও হে দরশন,
এই তো বাসনা মোর।
দিবা অবসান হইলে মিলন হবে তো হইলে,
কি গুণ জ্ঞান অন্তর॥

৮৩

কেদারা—জলদ তেতালা

জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত॥

হেরি নয়ন জুড়ায়, শ্রবণ সুখী কথায়,
মন আশা কে পূরায়, ভাবি হে সতত ॥

৮৪

কেদারা—জলদ তেতালা

কহিও তারে যারে সখী দেখি,
সে কি আসিবে।
বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রিদিন জ্বালায়, একি শীতল হইবে ॥
মনের মানস এই, কহিবে তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুল শীল,
লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে ॥

৮৫

কেদারা কামোদ—জলদ তেতালা

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জ্ঞান, তাহার পরাণ,
হরয়ে তখনি ॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখশশী,
সুধাভাষী, মৃদু মৃদু হাসি,
মদন মোহিনী ॥

৮৬

কেদারা খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

মন তোরে মনে করে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হ'লো কি বোধেরে ॥
কিবা প্রাণসম নিধি ভাবয়ে অন্তরে।
শুনি অমিয় বচন, সুধাসিন্ধু করে জ্ঞান,
বাঁচাতে প্রাণেরে ॥
কি মদন শাস্তকারী, বুঝিল বিচারে;
কি মনোজে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে ॥

৮৭

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তো বুঝ না।
হৃদয়-সরোজে থাক,
মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥

৮৮

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

কেশ-ফাঁসি গলে দিলে, প্রাণ,
হাসিতে হাসিতে।
তোমার বদন-শশী, হেরিতে হেরিতে ॥
ভুরু শক্র শরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন; বাণেতে বাণেতে ॥

৮৯

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

হেরিতে হেরিতে পথ, কাতর আঁখি, (সই)
একবার এই হয় চারিদিকে দেখি ॥
কবে হবে সে সুদিন,
মন পূরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী ॥

৯০

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

এই আসে আসে ব'লে যামিনী গেল।
দেখ নলিনীর সখা সদয় হইল ॥
মনের বাসনা এক,
হ'লো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল ॥

৯১

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

বল না কেমনে রহিব সই নাথ-বিহনে।
রাত্রি দিন মোর, অন্তর নিরন্তর,
কাতর তব কারণে ॥
অতি সুখলাভে পীরিত করি,
দেখ না এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব,
দহিব দুঃখ-দাহনে ॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে,
বিরহে দ্বিগুণ দহন করে,
কামিনী সরলে, প্রেমরস-ছলে,
ভুলালে সুধা-বচনে ॥

৯২

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

তুমি যারে জান লো আপন,
সে জন নিতান্ত তব, কভু নহে আন।
ইহাতে সন্দেহ তুমি, ক'রো না হে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন ॥
সুজনে সুজনে সুখ, হয় তো বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ, না হয় কখন ॥

৯৩

খাম্বাজ—জলদ তেতালা

পীরিতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম, নাহি করিতাম,
পরাণ কেন হারাব ॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,
সদাই চাতুরী করে সেই জন,
দেখিতে তাহারে, হইলে সাধেরে,
কাহারে দুঃখ কহিব ॥
যদি মনে ধৈরজ ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সঘনে আঁখি
অঙ্গ আপনার, বশ হ'লো তার,
কাহার আমি হইব ॥

৯৪

খাম্বাজ—তেতালা

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি শুনহ হে প্রাণ ॥
যেরূপ যতন মোর, তোমার কারণ।
কহিতে যে সব দুখ, বিদরে পাষাণ ॥
তোমার অধিক আর,
আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে, মজাইব মন ॥

৯৫

ঝিঁঝিট—তাল হরি

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে।
দিবানিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে ॥
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়নে।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে ॥
পীরিতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ
বিষময় হইল মোর, করমের গুণে ॥

৯৬

ঝিঁঝিট—তাল হরি

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তত দেখি আশা নাহি পুরে ॥

যদি বিনয়েতে মন, স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে ॥

৯৭

জয়জয়ন্তী—জলদ তেতালা

পীরিতি সুখের লোভে,
মজে হে যে জন, (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ, দুখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদ-মিলন-আশে, থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ, বিচ্ছেদ কারণ ॥

৯৮

জয়জয়ন্তী—জলদ তেতালা

শয়নে শীতল থাকি, শুন ওলো সখি !
চেতনে সলিলে ভাসি, ঝোরে ওলো আঁখি
পীরিতি করিলে লাভ, হয় লো এই কি !
সদা দুঃখে দহে মন, কদাচিত সুখী ॥

৯৯

ঝিঁঝিট—তেতালা

কত ভালবাসি তারে, সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই. কোথায় রাখিব ॥

১০০

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়ন অন্তরে তোরে, প্রাণ বল নারে,
করিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি, আছ মোর মনে ॥
বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে ॥
তোমারে পেয়েছি আমি, অনেক যতনে।
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখানে ॥

১০১

জয়জয়ন্তী—জলদ তেতালা

সতত যতন আমি, করি যে যেমন, (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব, আমার কারণ ॥
জীবন যৌবন সুখ, সব অকারণ !
বিনে দরশন তব ও বিধুবদন ॥

১০২

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

পীরিতের গুণাগুণ, যদি জান সই,
কারেও ব'লো না।
ত্যজিতে না পারি যাহা,
তাহার কি শোচনা ॥
ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল সর,
যত দুখ তত সুখ, মনে কেন বুঝ না ॥
দেখি পীরিতি রতন, পাইয়াছে যেই জন
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখ না ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে,
তথাপিহ ত্যজে না ॥

১০৩

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥
হরি হরি মরি মরি, মান ভরে ভয় করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী ॥

আলুয়ে পড়েছে কেশ,
বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরস শেষ, দংশে মোরে ধনি ॥
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি !

১০৪

ঝিঁঝিট পিলু—জলদ তেতালা

পীরিতি সাধ এই যে হইল ॥
লাজ-ভয়-কুল-শীল সকলি মজিল ॥
না করিলে গুণাগুণ বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল ॥
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন বিধি দুঃখ নাহি গেল ॥

১০৫

ঝিঁঝিট—তাল হরি

রতন অধিক তোরে প্রাণ,
করি রে যতন।
বুঝা নাহি যায় ভাব তোমার কেমন ॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
অবলা সরল, জালা দিও না কখন ॥

১০৬

ঝিঁঝিট—তেতালা

শুন শুন শুন রে প্রাণ,
অধীনি জনেরে, নিদয় হইও না।
বিরহ-যন্ত্রণা বুঝি তুমি জান না।
জানিলে জ্বালাতনে জ্বালাইতে না।
কবিতা বনিতা লতা, বুঝে দেখ না।
নিরাশ্রয়ে কদাচিৎ, শোভা থাকে না ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়নে নয়নে রাখি, (প্রাণ)
অনিমিখ হয় আঁখি, বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী ॥
কি জানি অন্তর হও, হই ভয় দেখি ॥

১০৮

ঝিঁঝিট—তেতালা

রাহুর আহার শশী, সে বিধি করয়।
পীরিতি বিচ্ছেদ বুঝি, তাহা হ'তে হয় ॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়,
বিচ্ছেদ মিলায়,
চমকেতে প্রাণ যায়, সদা এই ভয় ॥

১০৯

ঝিঁঝিট—তেতালা

কেমনে তোমার আশা পুরাইব মন।
একে তুমি তাহে আর কান্দিছে নয়ন ॥
অতএব এই কর, নিজ আশা পরিহর।
নয়নেরে শান্ত কর, এই যে বিধান ॥

১১০

ঝিঁঝিট—তাল হরি

প্রাণ তুমি জান না যেমন আমার মন ;
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন ॥
চকোর চাতকা যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণী, যেরূপ কাতর গণি,
ততোধিক তোমার কারণ ॥

১১১

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

পীরিতি না জানে সখি,
সে জন সুখী কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপবিহীনে ॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিলে যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশুসম গণনে ॥

১১২

ঝিঁঝিট—তাল হরি

অবলা সরলা অতি প্রাণ, শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে ॥
সুজনের এই রীতি, তোষে তারে যে যেমত,
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥

১১৩

ঝিঁঝিট—তেতালা

ভাল তো ভুলালে প্রাণ, বিনয় বলেতে।
তোমার প্রেমের ছুরি, হাসিতে হাসিতে ॥
অতি সাধ ক'রে আমি, দিলাম গলেতে।
উচিত তোমার হয়, চাতুরী ত্যজিতে ॥
অবলা সরলা অতি, বুঝ হে মনেতে ॥

১১৪

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

হ'লো হ'লো হ'লো রে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার ॥
এই তো হইল লাভ রোদন সার ॥
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, নহে তো বিচার ॥

১১৫

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

আমি কি কখন তোমারে,
ওরে, না দেখে থাকিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিৎ নহি সুখী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি ॥

১১৬

ঝিঁঝিট—তাল হরি

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন ॥
স্বপনেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন ॥

১১৭

ঝিঁঝিট—তাল হরি

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ।
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইতে চিত।
মনেরে ভুলাইয়ে লইবে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয়তো বিধান,
তা না ক'রে বধিবারে হ'লো হে মত ॥

১১৮

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা

যাও তারে কহিও সখি,
আমারে কি ভুলিলে, (হে)।

বিরহে তব প্রাণ সংশয়,
ভাসি আমি নয়ন-সলিলে ॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে,
আছি প্রাণ ; তোমার মনে প্রাণ
জানি কি আছে প্রাণ,
গেলে কি হবে আইলে ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেন এত নিদয় হইলে অধীনি জনে ।
দিবানিশি হৃদি'পরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে ॥
তোমার প্রতি মোর মন, প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখনে ।
তোমার কেমন ভাব, নাহি হয় অনুভব,
এবে লাভ সলিল-নয়নে ॥

গারা ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে ।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে ।
আখি মোর অনিমিষ হেরিতে হেরিতে

গারা ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কে আপন অধিক তোমার ।
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার
তোমার হইয়ে আমি, হইব কাহার ।
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার ॥

১২২

গারা ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন ।
এমন দরশন হ'তে ভাল অদর্শন ॥
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন ।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন ॥

গারা ঝিঁঝিট—তাল হরি

মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে ।
যদি ইহা হ'তো, নহে কদাচিত,
বহিত সলিল নয়নে ॥
চাক্ষুষে হরিষ আখি, বচনে শ্রবণ সুখী
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ,
কীদৃশ না যায় কহনে ॥

১২৭

গারা ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে ।
তুমি কি যতনাধিক কর হে আমারে ॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ॥

১২৫

গারা ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

হউক আমারে যত, করহ যতন ।
তার সাক্ষী দিবানিশি,
দহে মোর মন ॥
তোমার গুণের কথা, অকথ্য কথন ।
অনল অন্তরে মোর, সজল নয়ন ॥

১২৬

দরবারী কানাড়া—জলদ তেতালা

যে যারে ভালবাসে,
সে তারে ভালবাসে না—কে বলে।
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষায় ব্যাকুল,
নীরদ তেমনি তারে, তোষে ধারাজলে॥

১২৭

দরবারী কানাড়া—তাল ছরি

প্রাণ কেন এত রোষ কর,
অধীনি অবলা 'পর।
তুমি ধন মন প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন,
অন্তরে হয় মোর॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন,
ভয় নাহি আর॥

১২৮

দরবারী কানাড়া—জলদ তেতালা

কেন এমন মান ক'রে
তারে মন না করি বিচার।
যাহার বদন, বিরস কখন,
দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদার॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন ক'রে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ,
তুমিও তো জান, বুঝবে কি আর॥

১২৯

দরবারী কানাড়া—জলদ তেতালা

মন হরণ মন করহ যতন, বলি হে তোমায়
নিলে এক গুণ হইবে তো জান,
দিতে দুই গুণ না রবে কথায়॥
সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমার নয়ন ছাড়িতে না চায়॥

১৩০

বেহাগ—জলদ তেতালা

ভ্রমরা রে কেন মিছে,
লাজ করিলে কি হবে।
কখন না হয় মনে, স্বভাব ত্যজিবে॥
অনেকের প্রাণ তুমি, দুখ কি বুঝিবে
হইলে আমার মত,
জানিতে হে তবে॥

১৩১

বাৰোঁয়া—ঠুংরী

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায়
মন মত হ'লে চিত, সুখ হয় কত মত,
বলা নাহি যায়॥
যে যার আপন হয়, যে হয় তাহার;
ভিন্ন ভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব,
সন্দেহ কি তায়॥

১৩২

বেহাগ—জলদ তেতালা

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে।
পরেরে আপন ভাবি,
পরাণ সঁপিলে॥
নিত্য নিত্য করি মনে,
মিলিব তাহার সনে,
নিকটেরে দূর বোধ, কাহারে করিলে॥

১৩৩

বারোঁয়া—ঠুংরী

পীরিতের দুখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন,
হয় হে উদয় ॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,
কখন সমূহ সুখী, কখন দু-দিন,
এক জ্ঞান হ'লে চিত, দুখ হয় কদাচিত,
সুখ অতিশয় ॥

১৩৪

বেহাগ—জলদ তেতালা

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ বিষ অনল, ছিল অধিক প্রবল,
তাহা যে শীতল হবে মনেতে না ছিল ॥
মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেগ্রি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল।
কত সুখ হ'লো লাভ, কথায় কত কহিব;
আনন্দ সাগরে মন, নয়ন সজল ॥

১৩৫

বেহাগ—জলদ তেতালা

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে
এমন সময়।
যদি কোন জন, কহে কুবচন,
জ্বলিবে জ্বলিব তায় ॥
উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়
আমার এমত, হউক সম্মত,
ভয়েরো কি থাকে ভয় ॥

১৩৬

বেহাগ—জলদ তেতালা

সখি কোথা পাব তারে,
যারে প্রাণ সঁপিলেম।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কী হইলেম ॥
পরাণ কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ আসে দুখনীরে, এবে যে ডুবিলেম ॥
আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত,
না জেনে মজিলেম ॥

১৩৭

বেহাগ—জলদ তেতালা

অধীনি জনে প্রাণনাথ, নিদয় হয়ে,
ছিলে হে কেমনে।
ও বিধুবদন না হেরিয়ে প্রাণ,
জ্বলিত জীবন সঘনে।
শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে;
অধীনি বলিয়ে মনে, নাহি কি করিতে ॥
একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি,
নিবারি দুরন্ত মদনে ॥
এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে;
তেঁই প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে,
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন,
হইল নাথ তব সনে ॥

১৩৮

বেহাগ—জলদ তেতালা

সে জানে না আমার মন, যেমন তার তরে;
জানিয়ে বুঝ না কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন,
দহন করিবে মোরে ॥

তারে জেনে এই হ'লো, নয়ন সদা সজল,
কহিব কারে।
যারে কর সেই জন, সুখ-দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে ॥

১৩৯

বেহাগ—জলদ তেতালা

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে,
বল না আমারে ॥
অধীনে সদয়, হ'লে ক্ষতি হয়,
বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে প্রবোধিবে মনে,
থাকি কি প্রকারে ॥
অনুকূল বিধি, যদি প্রাণনিধি,
দিলে হে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন,
বলিব কাহারে ॥

১৪০

বেহাগ—তেতালা

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণ,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমনে করয়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না ॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন
কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর,
থাকিলে দেখ আমার,
না হ'তো এত যাতনা ॥

১৪১

পরজ—তাল হরি

শুন সই মোর মন মজিল এখন কি করি।
পশ্চিমে অরুণোদয় হ'লে পাসরিতে নারি।
কুল শীল অভিমান, ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে,
ত্যজিলে তখনি মরি ॥

১৪২

পরজ—তাল হরি

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন-জলেতে।
কেশ শেষ ফাঁসি তাহে দিয়েছে গলেতে ॥
যদি প্রাণপণ করি, চাহি পলাইতে।
যাইতে না দেয় তার, ঈষৎ হাসিতে ॥

১৪৩

পরজ—জলদ তেতালা

দেখিবে আপনমত আপন জনে। প্রাণ।
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে।
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে ॥

১৪৪

পরজ—জলদ তেতালা

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদিকমলে জ্বালায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন,
এখন তা নয়।
আজু ফণীময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হ'তে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥

১৪৫

পরজ—জলদ তেতালা

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার মন,
জেনে যদি না জানিবে, কে জানিতে পারে,
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন ॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর,
না জান কেমন।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে, আমি হই যেমন ॥

১৪৬

পরজ—জলদ তেতালা

কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি তোমার।
হৃদয়-সরোজাসনে, করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর,
দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিষ হয় আঁখি,
সুখ হে অপার।
পিরীতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহাতে
সে মান উদয় হ'লে, উভয়ে কাতর ॥

১৪৭

পরজ—জলদ তেতালা

আমারে কিছু ব'লো না সই,
মন মোর তার বশ হ'লো।
লোকলাজ কুলভয়, কোথায়ে রহিল ॥
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূল দিলে বিধি
এ যতনে যায় প্রাণ সেই বরং ভাল ॥

১৪৮

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

এত দিনে মন বশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে, করেছে ধ্যান ॥
বাঞ্ছে অদর্শনে দুখী, নহে কদাচন।
সদা মনোযোগে তায়, করি দরশন ॥

১৪৯

পরজ—জলদ তেতালা

এমন ক'রো না প্রাণ, অধীনি জনের সহ।
নিতান্ত সে হ'লো তব,
তারে মিছে কর দাহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুখ,
এ দুখ মোচন করে,
কোনো জন আছে কেহ ॥

১৫০

পরজ—জলদ তেতালা

দেখিতে দেখিতে তোরে,
অনিমিখ হয় আঁখি।
বুঝাতে না পারি দেখ,
হই আমি কত সুখী ॥
ভাবনা-রহিত মন, আমার হয় তখন,
মন পূরে মহানন্দ, আর কিছু নাহি দেখি।

১৫১

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তেতালা

রীতে রীতে চিতে চিতে,
মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ॥
স্বভাবে অভাব ভাব,
ভাব দেখি সে কি ভাব,
ছাগে বাঘে সভাসতে কিসের প্রণয় ॥

১৫২

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেতকী এত কি প্রেয়সী তব মধুকর।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥

নাম তব রসরাজ,
রাজার উচিত কাজ,
এই তোমার, অন্যেরে আপন জ্ঞান,
আপন অন্তর ॥

১৫৩

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে,
নিধিলাভ হবে কেনে। (সই)
সতত রাখিয়াছিলাম নয়নে নয়নে।
তথাপি সে লুকাইল করমের গুণে।
হৃদয়ে তাহার রূপ,
হেরি লো মননে।
সুস্থির কি হয় প্রাণ, চাক্ষুষ বিহনে।

১৫৪

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

মনের বাসনা সই, সেই সে জানে।
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে ॥
আপন নয়ন হয়ে, প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি, বাড়য়ে রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে।
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥

১৫৫

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

বারে বারে এবারে,
আর আমি তোরে সাধিব না। (সই)
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না ॥
এতদিনে না বুঝিলেম তাহার মন্ত্রণা।
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা ॥

১৫৬

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

মনেতে বুঝিয়ে দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন। (প্রাণ)
দেখ না কান্দিতে হয়, হলে অদর্শন ॥
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন,
সকল রতন হ'তে, মন অতি ধন।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান ॥

১৫৭

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

নয়নের বাণ, কে বলিবে প্রাণ,
দেখ নলিনীদল।
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অনল ॥
তেজেতে উৎপত্তি যার,
দাহিকা-শক্তি তাহার,
তপনের সখী ব'লে অধিক প্রবল ॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ জান কি না জান,
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল ॥

১৫৮

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তাল হরি

ঐ যায় সই, ডাক না উহারে,
মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কত, ফিরে নাহি চায় ॥
কেন বা করিলাম মান. এখন যে যায় প্রাণ,
রতন যতন বিনে, থাকে কি কোথায় ॥

১৫৯

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

জানি তুমি প্রাণনিধি। (হে)
বিরস দেখিলে মুখ কতমত সাধি ॥

সতত বাসনা মোর, কখন হয় না অন্তর,
অন্তরে হ'লে অন্তর, কেমনে প্রোবধি ॥

১৬০

পূরবী—জলদ তেতালা

দিবা অবসানে আসি, রসরাজ বিরস কেনে।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন,
দেখিতে বাসনা মনে ॥
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ,
সহিল আমার প্রাণে ॥

১৬১

পূরবী—ঢিমে তেতালা

চল সখি যাই যমুনাতীরে.
ঘনবরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন, লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিলে, সেই রূপেতে ॥

১৬২

পূরবী ঢিমে তেতালা

ঘনঘন ঘনবরণ ধ্যানে, মম মনের তম
রহিল দূরেতে।
আর অন্য রূপে, মজিব কিরূপে,
মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে ॥
দেখিতে বরণ কালো, অন্তর করয়ে আলো,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে,
মজে তার প্রেমে, পারে বুঝিতে ॥

১৬৩

পূরবী—জলদ তেতালা

কি সুখ-পিরীতে শুন, প্রাণ সই,
না হ'লে মিলন।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে,
সতত করি যতন ॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশয়ে প্রাণ ধারণ,
তেমতি তাহারে, ভাবি যে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান ॥

১৬৪

পূরবী—জলদ তেতালা

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে।
কখন না পাসরিব, তোমায় জীবন মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্দিয়াছ মম মন,
থাকিবে যে চিরদিন, সদা রাখিব যতনে ॥

১৬৫

পূরবী— জলদ তেতালা

সেই সোহাগিনা লো,
যারে প্রিয় সতত চাহে।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন,
না বিরহে দহে ॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিহরে,
না যাতনা সহে ॥

১৬৬

পূরবী—জলদ তেতালা

যতনে সে ধন সদা, করে উপার্জন।
কে কোথা দুঃখেতে ত্যজে, না দেখি কখন॥

অনেকে যতনে ফণী, মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন ॥

১৬৭

পূরবী—জলদ তেতালা

কমলিনী অধীনি তোমার শুন অলিরাজ।
সদায় তোমারে, ভাবি হে অন্তরে,
এই মোর কাজ ॥
সদয় থাক হে নাথ, এই হয় মম মত,
নিদয় কখন, হয়ো না হে প্রাণ,
সুখেতে বিরাজ ॥

১৬৮

বারেঁায়া—ঠুংরী

আগে তারে দিও না রে মন।
পরে জানিবে—পর যে কেমন ॥
সখি সে নহে আপন।
সে শঠের শিরোমণি,
আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পারিতি যেমন জলের লিখন ॥

১৬৯

বাহার—জলদ তেতালা

বিরস ত্যজিয়ে ওলো, হরিবে হাস না।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বল না ॥
ত্যজ না বিষম বেশ,
করহ স্বভাব বেশ।
ঈষৎ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজ না ॥

১৭০

বেহাগ—জলদ তেতালা

আমারে কি তার আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি,
তবে কি মরি হে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথপানে ॥
তাহারে না দেখে, প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে ॥

১৭১

বেহাগ—জলদ তেতালা

কহিও সই এই বিবরণ মোর, প্রাণনাথে
নয়নের বশ আমি, করি কি ইহাতে ॥
নয়নের বশ তুমি, নহ কদাচিতে ॥
বশ হ'লে তবে কেন, হইবে কান্দিতে ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মতিতে ॥

১৭২

বেহাগ—জলদ তেতালা

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ,
না দেখে তোমারে।
একে তো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ,
অমিয় বচন, চাহে শুনিবারে ॥
রসনা রসের আশ, পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ, বুঝ না বিচারে ॥

১৭৩

বেহাগ—জলদ তেতালা

আমি কি তোমার কেনা কেনা।
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না॥
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জান কেনা, আমার নাহি ভাবনা,
বলেছি কি না॥

১৭৪

বেহাগ—জলদ তেতালা

বিরহ যাতনা, শুন রে সজনি,
সহে না। (আর)
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল,
তথাপি অনল নিবে না॥
হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন,
ঘুচিবে যন্ত্রণা।
উদয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ,
এ কি হবে পূরিবে বাসনা॥

১৭৫

বেহাগ—জলদ তেতালা

পিরীতি করি প্রাণ, এই লাভ হ'লো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ, দিলে দুঃখভার॥
অবলা সরলা আগে, না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়-ছলেতে তোমার॥

১৭৬

বেহাগ—জলদ তেতালা

আইলে হে অধীনি জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ,
আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে॥
মনের মানস বিধি, পুরাইবে পাব নিধি,
হ'লো এত দিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুন, হইল সুখ-মিলন,
বিচ্ছেদ না হয় যেন, সাধ এক্ষণে॥

১৭৭

বেহাগ—জলদ তেতালা

চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল-নয়ন।
ভুরু-ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি, করে মধুপান॥
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন-শিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ ঝলকে তায়, দামিনী সমান॥

১৭৮

বেহাগ—তাল হরি

গঞ্জনে নিরঞ্জন, হয়েছে নয়নে।
সেই নীর হার হ'তো,
যদি হিংসা না করিত কোন জনে॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন, আছে কত শত জন,
ত্যজিতে অসৎ জন,
বলে বিনে প্রয়োজন প্রিয়জনে॥

১৭৯

বেহাগ—জল হরি

কোথারে চলিলে হে প্রাণ, মন মানভরে।
দুঃখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলাম প্রাণকান্তে;
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বল না যে কারে॥
আপন ভাবিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে॥

১৮০

বেহাগ—তাল হরি

তোমারে কে জানে প্রাণ,
যে জানে সেই সে সুখী ॥
তোমারে জানিতে, সাধ যায় চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুঃখী ॥
তোমারে যে নাহি জানে,
তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি ॥

১৮১

বেহাগ—তাল হরি

অহঙ্কার কার 'পর, করিব কে সহে।
যে করিল সোহাগিনী,
সেই বিনে আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন :
সেই জন প্রিয়জন, সুখে সুখী দুঃখে দহে ॥

১৮২

বেহাগ—তাল হরি

কি সন্দেহ কর প্রাণ, নিঃসন্দেহ রহ।
আর কাহার'পর আমার নাহি মোহ ॥
মোহেরে করিয়ে দূর, নির্মোহী নাম মোর,
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুঝে লহ।

১৮৩

বেহাগ—তাল হরি

কখন যামিনী কামিনী মুখ চাহি কি রহে।
আমার যে মন, তোমার কারণ,
পথ চাহি পরাণ দহে ॥
যামিনী থাকিতে কেন আসিতে
সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল, আমারে সকল
দুখ সহে তারে না সহে ॥

১৮৪

মূলতানী—জলদ তেতালা

নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল ॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার, সকলি বিফল ॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল ॥

১৮৫

মূলতানী—ঢিমে তেতালা

বোধ না হইলে ভ্রম, ঘুচিবে কেমনে।
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা-বচনে ॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ, না হয় কখনে।
অঙ্কুশে উচিত হয়, সুচিত দুজনে ॥

১৮৬

মূলতানী—ঢিমে তেতালা

অনেকের প্রাণ যে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি, কেবল আমার ॥
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার।
রাখিতে তোমার আছে, না রাখ তোমার ॥

১৮৭

মূলতানী—তাল হরি

তুমি কি রাজা হলে প্রাণ, আমার দেশেতে।
তব মতে মত কেন, হয় হে করিতে ॥

ভুলে যদি কর ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর, হয় হে সাধিতে ॥
খেদ উপজিলে মনে, হেরি না হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন মন, ভাসয়ে সুখেতে ॥

১৮৮

মূলতানী—আড়া চৌ-তাল

নিদয় ঋতুরাজন বিরহী জনে।
দেশ ত্যজিলে সুখ নাহি কাননে ॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এই মত,
পলাতকে নাহি দেয়, দুখ কখনে।।
এ রাজার দূতগণ, একে একে শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল, বান্ধে তিন গুণে।

১৮৯

মূলতান—একতাল

তুমি কি আমার মনের বাসনা জান না।
দিবানিশি তোমা বিনে,
করি কি আর সাধনা ॥
কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনি জনে,
দিতে কি হয় যন্ত্রণা ॥

১৯০

মূলতানী—এক তালা

আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ
তবে যে বিরস দেখ, দুখে উপজয়ে মান ॥
তোমার অলির রীতি, একই সমান।
আমার ঐ রীতি হলে,
করিতে সুরীতি জ্ঞান ॥

১৯১

বেহাগ—তাল হরি

কি করিব রে মন মোর সবশ নহে।
যাবৎ তাহারে হেরিলাম,
হারাইলাম লাজভয়, বিরহে শেষে দহে ॥
জানি তোরে যা যারে,
যাহারে প্রাণ সঁপিলে,
সকল রজনী কামিনী বাসে,
রঙ্গরসে ভোর করিলে ॥

১৯২

রাম কেলী ললিত—জলদ তেতালা

আর কার নহি প্রাণ, তোরি রে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিরে ॥
কিরূপ আমারে তুমি, ভেবো না কখন;
স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন;
আর কিসে হবে সুখী, বলনা তা করি রে ॥

১৯৩

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি

তুমি তার তরে হলে, সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণ জ্ঞান,
দিবস রজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হলে, নানারঙ্গ কুরঙ্গনয়নী ॥

১৯৪

শঙ্করভারণ—তাল হরি

যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই,
দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥

যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে,
থাকি সেই মনে, কি হলো আমারে ॥

১৯৫

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি

হউক বেনে সই কহিও নিদয়ে
সদয় হওনে কি ক্ষতি।
দেখ চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল নবঘন প্রতি
চকোরী সুধার তরে, দেখ অভিলাষ করে,
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে,
হয় কি এমতি ॥

১৯৬

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি

মানিনী মানেতে রহিলে তুমি,
প্রাণ চলিল তব মান মোচন।
মানের যতন, অধিক রতন,
হতেছে বুঝি এখন ॥
কি হইবে মান গেলে,
এখন নাহি বুঝিলে,
তব দুখে দুখী, শুন ওলো সখি,
তেঁই সে বলি এমন ॥

১৯৭

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি

সকল রতন, অধিক যে মন, (সই)
যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয় জন,
বলিব বল কাহারে ॥
ইহার অধিক হিত,
হইবার যার মত,
অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন,
অন্তর দহে অন্তরে ॥

১৯৮

বেহাগ সরফরদা—জলদ তেতালা

অনেকের প্রিয় সে,
আমারে প্রিয় বলিবে কেন।
এমন বাসনা, কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন ॥
নয়ন-নীরেতে ভাসি,
ভাবি তারে দিবানিশি
আমার এ কাজ, সে তো অলিরাজ,
তার কি এখন ॥

১৯৯

মূলতানী—জলদ তেতালা

পীরিতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয়, শরীর শিহরে ॥
প্রেম ডোরে বদ্ধ জন, ভ্রময়ে অন্তরে।
এ গুণ যে বান্ধা নহে,
নহে সে অন্তরে ॥

২০০

মূলতানী—জলদ তেতালা

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন।
যেরূপ তাহারে আমি, করি হে যতন ॥
সতত চাতুরী সখি, করে সেই জন।
সে বরং ছিল ভাল, নাহিক মিলন,
মিলয়ে এই যে ভাল, সদা জ্বালাতন ॥

২০১

মূলতানী—জলদ তেতালা

মৃগনয়নি তুমি ভাবিতেছ কেন এত।
প্রফুল্লবদনি তুমি, আজি কেন বিষাদিত॥
হেরিলে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
বাঁচাও জীবনও তো, হয়ে প্রাণ হরষিত॥

২০২

মূলতানী—জলদ তেতালা

আমি ত তাহার সই, সে জানে আমার মন
অযতনে কে কোথায়, কারে সঁপে প্রাণ॥
মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে, হয়লো মিলন॥

২০৩

মূলতান—জলদ তেতালা

অরুণ বরণ আঁখি, বিধুমুখি কেন।
এরূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর,
করিছে রোদন।
এলায়েছে কেশ-ঘন, বহে নিঃশ্বাস পবন
বাক্য-সুধা দান, করিয়ে এখন,
বাঁচাও জীবন॥

সুরট—জলদ তেতালা

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে। (ওগো)
বধিলে কি লাভ তব, অনুগত জনে॥
অনায়াসে চকোরে তুষিতে সুধাদানে
আজু শশী মান-মেঘ, কিসের কারণে॥

২০৫

সুরট—জলদ তেতালা

মিলন কি সুখময়, হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল॥
পীরিতের যত সুখ, মনে মনে বুঝে দেখ,
অপার অতুল হয়, প্রেমরস ফল॥

২০৬

মূলতান—জলদ তেতালা

আমার মন তোমার কারণ যেমন,
প্রাণ সেই জন জানে।
দিবানিশি থাকি আমি, তোমার ধেয়ানে॥
তুমি তাহা নাহি জান, এই খেদ মনে,
মনের আকার যদি, না বুঝ বচনে,
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে॥

২০৭

সুরট—জলদ তেতালা

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে,
তুমি আমারে ত্যজো না।
যদি রাত্রিদিন, কর জ্বালাতন,
ভাল যে যাতনা॥
সমূহ যাহার গুণ, কিঞ্চিৎ অগুণ,
কি দোষ বলিব তরে, কিংবা অপগুণ,
তব গুণ-কথা, কহিতে সর্বথা,
হতেছে বাসনা॥
অন্য অন্য চিন্তা যত, আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা, সব দাহ হল।
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ,
মনেতে বুঝ না॥

২০৮

সুরট—জলদ তেতালা

সে কি না জানে সই মনের বাসনা।
জানিয়ে দেখ না মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছ যাতনা॥
আমার মত এমন, আছে তার কত জন,
কে করে গণনা।
আমি মরি তার তরে, সে তো নাহি হেরে;
তবু মন তো মানে না॥

২০৯

সুরট—জলদ তেতালা

প্রিয় দরশন হলে সই,
অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধালাভ, চাতকীর জলধর॥
মণিরে পাইয়ে কত, সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতিশোভা, উদয়েতে শশধর॥

২১০

সুরট—জলদ তেতালা

তুমি যে নিদয় হবে প্রাণ,
কি লাভ তাহাতে (হে)।
সদয় হওনে ক্ষতি, বাসনা শুনিতে॥
তৃষায়ে চাতক দেখ নিরখয়ে মন-মুখ,
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে॥

২১১

সুরট—জলদ তেতালা

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুখ হল সুখ মিলন।
প্রেমরস পানে চিত, হইল চেতনা॥
বিচ্ছেদ-তিমিরে মন, করেছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয়, হইল এখন॥

২১২

সুরট—জলদ তেতালা

তব আগমন শুনি,
হে প্রাণ নিরখিছিলাম পথ।
এই এসে এসে বলি, চিত অতি চঞ্চলিত॥
তোমারে হেরিয়ে আমি,
হইলেম সুখী এত।
শূন্যদেহে এলো প্রাণ, অধিক কহিব কত॥

২১৩

সুরট—জলদ তেতালা

তারে এই কথা কহিও সই,
মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে, ভাসে নয়ন সলিলে॥
যদি মোর দুখ যায়, একবার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে, অধীনে সদয় হলে॥

২১৪

সুরট—জলদ তেতালা

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ, শুনেছ শ্রবণে॥
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে।

২১৫

সুরট—তাল হরি

জানি নাথ যাও হে জানিলাম।
তোমার পিরীতে নাথ, প্রাণ হারালাম॥
অবলা সরলা অতি, নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ, পান করিলাম॥

২১৬

সুরট—তাল হরি

এ কেমন রীতি প্রাণ, নয়ন অন্তরে হয়,
অন্তরে অন্তর।
এই আসি বলে গেলে,
আসিলে এতদিন পর।
আশয়ে আছিল প্রাণ, তাএ্যা হলো দরশন,
তোমার যে আগমন, মম মন অগোচর॥

২১৭

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা

তাহার কি দুখ সখি, যে দুখ আমার।
যখন যেখানে থাকে, বোধহয় সেই তার॥
আমি লো তাহার তরে, যেরূপ কাতর।
সে যদি এমন হত, কত সুখ মনে কর॥

২১৮

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা

তব পথ চাহিয়ে,
চিত্ত অতি চঞ্চলিত। (প্রাণ)
মণির কানে ফণী, কাতর কত॥
তুমি জান কি না জান, যেমন আমার মন,
চাতকী কিঞ্চিৎ জানে, আপন মত॥

২১৯

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

প্রাণ এমন মান কেহ, করে কি কখন।
সাধিতে সাধিতে ওলো, গেল মোর মান॥
রাখিতে যাহার মান, তারে এবে অপমান,
তোমার কি ঐ মান, রবে চিরদিন॥

২২০

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

নয়ন ঘরে তোমারে, রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে, উর যে সঘনে॥
হৃদয় কমলে থাক, দুখ-মুখ নাহি দেখ,
অনল-বেষ্টিত তাহে হয়েছে এখানে॥

২২১

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

দেখ না সই কত সুখী হই,
দেখিলে তাহারে!
অদর্শনে হুতাশন, জলয়ে অন্তরে,
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝিলাম বিচারে॥

২২২

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

তুমি জান আমার যতন, যেমন তোমারে;
আপন জানিয়ে মন, সঁপিলে আমারে॥
প্রাণপণে তব মন, করি লো আমি যতন,
ইহাতে অন্যথা প্রাণ, ভেবো না অন্তরে॥

২২৩

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

দেখনা সই, প্রাণনাথ বই, করি কি এখন॥
প্রবল মদন মোর, করিছে দাহন॥
আমার দুখেতে দুখী, নহে সে কখন।
তাহার সুখেতে সুখী, হই সর্বক্ষণ॥
রতিপতি করে মোরে, করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত সুখে, মজিল সে জন॥

২২৪

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

হের ভ্রমরে ও কমলিনি।
মধুকর কাতর প্রাণ, হেরি বিষাদিনী ॥
দেখ না স্বভাব গুণে, ফিরে নানা ফুলবনে,
দিবানিশি তব ধ্যানে, থাকি বিনোদিনী ॥

২২৫

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

আমি জানি তোমার যতন,
এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি, এই সে কারণে ॥
তুমি মোর মনোমত, আমি তব মত-মত
হয় কি আর মত, লোকের বচনে ॥

২২৬

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

আসিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন ॥
পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাক প্রাণ, বলো না এমন ॥

২২৭

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

কারে এত করিবে যতন, যেমন তাহারে।
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার তরে,
সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে ॥

২২৮

সিন্ধু কাফী—তেতালা।

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি, সজল নয়ন ॥
আভরণ করিয়াছি, লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি, সে নহে আপন ॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য-কথন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানয়ে কি গুণ ॥

২২৯

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

কি আর অদেয় আছে প্রাণ,
তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মন,
থাকে যদি দিব আর ॥
তোমার মনের মত, মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার ॥

২৩০

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

জানি যাও হে, ও মধুকর।
যথা মধু মিলয়ে প্রাণ, বশ হও তার ॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিত বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি, অধীনি তোমার ॥

২৩১

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

তোমার দেখা দিতে বল,
এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন, প্রথম মিলন :

কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে
ধরি, কহিতে তখন
তিলেক না হেরি যদি, না বাঁচে জীবন।

২৩২

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমার ॥
তার প্রতি যত আশা, আছয়ে আমার
জানিয়ে অন্তচিত, করয়ে ব্যভার ॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে অনিবার।
তার বোধ হবে কেন, অনেক যাহার ॥

২৩৩

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা

এই কি তোমার প্রাণ, করিতে উচিত।
তারে কি জ্বালাতে হয়,
যে নহে তব অমত ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন, যে তব আশ্রিত।
তার আশা পুরাইতে, নিদয় কেন হে এত

২৩৪

সিন্ধুকাফী—জলদ তেতালা

দেখ দেখি কতরূপ, করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে, ছিলে না তখন ॥
লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন,
এবে সেই মন চুরি করি কারে দিলে,
কোথা মম মন ॥

২৩৫

সিন্ধুকাফী—জলদ তেতালা

সে সাধ পূরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে, আশা নাহি পূরে ॥
তৃষায়ে ব্যাকুল জন, জল জল করে।
তৃষাহীন জন নাহি, যায় সরোবরে ॥

২৩৬

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা।

পীরিতি কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায় ॥
পীরিতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে জন,
অন্য জন বৃথা কেন, তাহারে বুঝাতে চায় ॥

২৩৭

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল।
সতত কাতর প্রাণ, নয়ন সজল ॥
পীরিতি রতন লাভ, হবে আশা ছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল ॥

২৩৮

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা।

হেরিয়ে কমল কেন, প্রকাশে কমল। (প্রাণ)
জানিতেম তপন হেরি, বিকসে কমল ॥
তার সাক্ষী দেখ তব, বদন কমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন, হৃদয় কমল ॥

২৩৯

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা।

প্রবোধ কি মানে আঁখি, না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন,
তার মত দেখে কারে ॥
মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে, থাকে প্রবৃত্তির ঘরে ॥

২৪০

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা।

আমি কিলো তাহারে, সাধিতে যতন করি।
সব ধনাধিক মন, করেছে চুরি॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার,
আপনার বশ নহে, ইথে কি করি॥

২৪১

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

মনে মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি।
মম বিরসে বিরস, পাছে তারে হেরি॥
যেরূপ যতন তারে, বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন, হরি হরি হরি॥

২৪২

সিন্ধুকাফী—একতালা

সুধামুখি তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ-বিষে॥
কেমন কুরঙ্গ-আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি,
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে॥

২৪৩

সিন্ধুকাফী—ঢিমে তেতালা

তারে সাধিলে যত, তত জ্বালায় আমারে।
যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে॥
এত দুখে মন তবু, ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা, মজালে আমারে॥

২৪৪

সিন্ধুকাফী—একতালা

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন।
(প্রাণ)
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি।
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুখী প্রাণ॥

২৪৫

সিন্ধুকাফী—একতালা

তুমি আর বলো না আমারে,
তুমি লো আমার।
তোমার হইলে তুমি, হইতে আমার॥
তবে নাহি জ্বালাইতে, উচিত ইহার।
অধীনি জনের সহ, এরূপ ব্যবহার।
কে কোথায় করে বল, দেখহ কাহার॥

২৪৬

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

পীরিত সমান নিধি, কোথা আছে আর।
এ ধন যে পাইয়াছে, দুঃখ কি তাহার॥
লাজ ভয় কুলশীল, তাহার সকলি গেল।
মান অপমান সমভাবে হে যাহার॥

২৪৭

সোখরাই খাম্বাজ—জলদ তেতালা

হাস হাস হাস ওলো ও বিধুবদনি॥
পরাণ কাতর হয়, হেরিলে মাবিনী॥
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হেরিয়ে ধরণী।
ইহার কারণ আমি, কিছুই না জানি॥

২৪৮

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল হরি

আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে।
ননদী দারুণ অতি, আছে সে সন্ধানে
রাখিতে পরাণ মোর,
আমি নাহি পারি আর;
পীরিতে এই সে হলো, সংশয় জীবনে

মদন রোদন করে, বিরস দেখিয়ে মোরে,
লাজ ভয় কাল সম, দয়া নাহি জানে ॥
নিদয় বিধাতা যারে, সদয় কে হয় তারে,
আমার উপায় ইথে, হইবে কেমনে ॥
ধিক্ ধিক্ নারিগণে, মিলয়ে পুরুষ মনে,
কুল তেয়াগিতে নারে, মরে মন মানে ॥

২৪৯

সোখরাই বাহার—একতালা

আজু কি সুদিন সুদীন জনে।
যেমন নিদয়, জানিতাম যায়,
সদয় সেই ভবনে ॥
কত কি হইল লাভ, কি করিব অনুভব,
আসা আশা আগে প্রাণ, শূন্য দেহে প্রাণ,
আইল তারে দেখনে ॥

২৫০

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

পীরিতি রতন নিধি, পাইল যে জন ;
তাহার মনের মত, না হবে কখন ॥
দুখেরে করিয়ে কোলে,
ভাসয়ে সুখ-সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন ॥

২৫১

ফী—একতালা

আমি আর পারিনে সাধিতে, এমন করিয়ে
কত মত কহিলাম, মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে।
যত দুঃখ মোর সখি, তাহার লাগিয়ে।
বৃথায় কি ফল বল, সে কথা কহিয়ে ॥

২৫২

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

মান ভয়ে ভর করিছ কেমনে।
অমিয় সমান, এমন বচন, না যায় সহনে ॥
মানেতে মনেরে দহে,
তাহাও তোমারে সহে ;
মিনতি আমার, বোধ হয় শর,
বল কি কারণে ॥

২৫৩

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

ঐ দেখনা লো সই, আসিছে হাসিতে হাসিতে
মোর মনোরঞ্জন।
দেখ যাহার কারণ,
ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ॥
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে,
দুখ হলো ভঞ্জন।
আলিঙ্গন করিবারে,
কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে, করি অঞ্জন ॥

২৫৪

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

আমার নয়ন মানে না,
বল বুঝালে কি হবে সই !
তুমি বল সে আসিবে—আমি বলি কই ॥
বিলম্বের নাহি গুণ, করিতে হয়, গমন,
গিয়ে দেখি তুমি বলো, তব প্রাণ ওই ॥

২৫৫

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

সুধামুখি! মুখ বিরস করো না।
বিরস-বিষেতে, না পারি জ্বলিতে,
তুমি তা বুঝ না॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন,
অধীনে বধো না॥

২৫৬

হাম্বির—তাল হরি

তাহারে কি ভুলিতে পারি।
যাহারে আমি সঁপিলাম মন॥
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন।
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত,
সে জন এমন॥
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্বাণ কখন॥

২৫৭

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল।
(প্রাণ)
সাধিলে করিব মান,—মোর মনে ছিল॥
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল।
তবু কি তোমার সাধ,—ইথে না পূরিল॥

২৫৮

হাম্বির—জলদ তেতালা

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল।
সে রঙ্গ-প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল॥
কখন চঞ্চল, কর দরশন, বদন কমল।
হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ,
কখন চকোর, সত শশধর, কমলে কমল॥

২৫৯

সোখরাই বাহার—জলদ তেতালা

তোমার গুণের কথা কি কব,
কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হ'তে আশ্চর্য কেমন॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন।
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হয়ো না নিদয় এই নিবেদন॥

২৬০

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

পীরিতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে,
ভাসয়ে সুখ-সলিলে।
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥

২৬১

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা

এতদিন পরে নিবিল আমার
মনের অনল সখি।
দেখ যতদিন, ছিল দুই জ্ঞান,
সতত ঝুরিত আঁখি।
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেইরূপ,
কুমীরকে আরশুল ভেবে এই হলো,
সে ভয়ে—এ সুখে দেখি॥

২৬২

ইমন ঝিঁঝিঁট—জলদ তেতালা

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন!
বিচ্ছেদে কাতর আমি, তুমিও তেমন ॥
বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুঃখের উপর দুখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ॥

২৬৩

গুর্জরী টোড়ী—জলদ তেতালা

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পালাইব কত,
পথ না পাই ধনি ॥
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি.
শ্রবণেরে তব আঁখি কহে কি না জানি।
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত,
বাঁচিবার হেতু জানি ॥

২৬৪

কালাংড়া—তাল হরি

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ,
তুমি কি ভূপতি হৈলে
আমার আশারে তুমি অনা'সে বান্ধিলে ॥
আশা উদ্ধারিতে মন, গেল হে তব সদন,
সেইপথ হৈল সেও, তারে কি করিলে।
লাজভয় শাস্তমতি, বিরহ প্রবল অতি,
ইহারে দমন কর, রাজা যে বলালে ॥

২৬৫

মোহিনী—জলদ তেতালা

মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়াবাজি কেন দেখিতে পাইবে ॥
মন আপনার, তারে বশ কর,
মনোবশ না হইলে, বশ কে হইবে ॥

২৬৬

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী।
সুধা ক্ষরিতেছে মুখে মৃদুমন্দ হাসি ॥
শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি।
ইহার কিরণ দেখ, সম-দিবানিশি ॥

২৬৭

আড়ানা—তাল হরি

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগনয়নি।
রাহুভয়ে মুখে শশী, ভালে দিনমণি ॥
আবার ভয়ে ভীত হয়ে ফণী,
কেশে এসে হল বেণী।

২৬৮

বাগেশ্রী কানাড়া—জলদ তেতালা

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্রিদিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন তরুণ ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিয়ে হৃদি কমল, প্রকাশে তখন ॥
কামিনীর মনোসুখ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেরে তাই অধিক, করয়ে যতন ॥

২৬৯

মালকোষ রাগ—তাল হরি

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ, নয়নে তোমার।
ত্রিবেণী-নয়ন বেগ অতি ঘন,
বহে তিন ধারা ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥

২৭০

টোড়ী—জলদ তেতালা

ধীরে ধীরে যায় দেখা, চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর, বাহ্যে দেখি তারে।
নয়ন অন্তর হলে, পুন চায় অন্তরে।

২৭১

টোড়ী—জলদ তেতালা।

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন-বান, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়॥
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে চায়॥

২৭২

ইমন্ ভূপালী—তাল হরি।

প্রাণ যেমন করে কহিব কারে
কে কবে তারে।
দিবানিশি ভাসি আমি নয়ন-নীরে॥
পীরিতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি দোষ করিল বল না মোরে॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরং ভাল মম বিচারে॥

২৭৩

শোহিনী—জলদ তেতালা

কি দোষ তার, আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলাম প্রাণ, কেন করি রোষ॥
সদা পরিপূর্ণ মোর, নয়ন কলস।
অন্তরে বিরহানল, হয় সুখ শেষ॥

২৭৪

ভৈরবী—জলদ তেতালা

যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে। (প্রাণ)
ভূপতি না হয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারালে।
লাভ হইল ভাল, গেল বিনি মূলে॥

২৭৫

সরফ্ৰ্দা কালাংড়া—জলদ তেতালা

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক।
দেখ শশধর নাশয়ে তিমির,
তাহে করিল কলঙ্ক॥
বিষধর মণিধর, মুকুতা শুক্তি উদরে,
এখন বিচার, সংসারে যাহার,
ইথে খেদের কি অন্তক॥

২৭৬

এলাইয়া—ঢিমে তেতালা

জলে কমলিনী জ্বলে, কোথা মধুকর।
বিরস অনল জলে, জ্বলে নিরন্তর॥
বিচ্ছেদের শর জলে, ডুবিল আকার।
ভাসিছে নয়ন জলে, জলে অনিবার॥
কার মন্ত্রণা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে।
আমি তব ধ্যানে থাকি, না হেরে নয়নে॥

২৭৭

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়,
খেদ কি তাতে।
অকলঙ্ক শশী হেরি, কলঙ্ক কুলেতে॥

চতুর্থী ভাদ্র মাসেতে, নিষেধ শশী হেরিতে,
কখন বারণ নহে, এ শশী দেখিতে ॥

২৭৮

বেহাগ—জলদ তেতালা

চঞ্চল চিত্ত কেন লো, তোমার চিত্রাণি।
মৃগ অন্বেষণ, করিবারে মন,
বুঝিলো মৃগ নয়নি ॥
ইহা বিনে প্রাণ সখি, আর কিছু নাহি দেখি,
না দেখে সে রূপ, থাক লো যেরূপ,
দেখে ভয় হয় ধনি ॥

২৭৯

কামোদ গৌড—ঢিমে তেতালা

নয়নে না দেখে যারে,
মানেতে সে মনেতে উদয় কেন।
নয়নের বশ হলে, তবে বাঁচে কি জীবন ॥
অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর,
করি হে ইহাতে কেমন,
কেহ মান করে,
কেহ কাতর তাহার কারণ ॥

২৮০

কালাংড়া—তাল হরি

লোকলাজ কুলভয়,
কি করে মনো মজিলে
যারে সদাক্ষণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ করে,
বাঁচিলে কি তারে ত্যজিলে ॥
দেখিবারে যার মুখ, নয়ন পাগল দেখ,
বচন শ্রবণে ভুলালে।
পরশ পরশে, নাসিকা সুবাসে,
রসে রসনা শেষ শুনিলে ॥

২৮১

বেহাগ—জলদ তেতালা

অধরে মধুর হাসি, বচনে সুধা বরিষে।
নিন্দি ইন্দিবর নয়ন কি শোভা,
মুখ সরোজ সদৃশ, দ্বিজরাজ আভা নাসা
তিলফুল জিনি বুঝহ বিশেষে ॥
অতিশয় নিবিড় নীরদ-নিন্দিত কেশ,
হেরিয়ে চাতক, উল্লসিত মন,
শিখী নৃত্য করে, করি সখা অনুমান,
শ্রবণেতে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে ॥

২৮২

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা

অপরূপ শশধর, প্রকাশে দামিনী।
দামিনী সদৃশ বটে, হাসি অনুমানি ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, যেন দিনমণি।
নিবিড় নীরদাধিক, কেশেরে বাখানি ॥

২৮৩

ভীমপলাসি বাহার—জলদ তেতালা

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত,
দুখী বিরহিনী।
বন আর উপবন, দেখ কুসুম-কানন,
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত, বিনা কমলিনী ॥
মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চম স্বর,
শরে শরে শরজাল, বুঝ অনুমানি।
সংযোগী কাতর নহে,
পতিত রমণী দহে,
কান্ত কান্ত এই স্বর, তার মুখে শুনি ॥

২৮৪

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা

আইলে হে বিরহিনীর প্রাণ প্রিয়,
এতদিন পরে।
কি সুদিন, সুদীনের সুদিন,
শূন্য দেহে প্রাণ,
আসিবে ছিল কি মনেরে॥
প্রথম মিলন, অমিয় পান,
করিয়ে জীবন, করেছি ধারণ।
বিচ্ছেদের ছেদ মোর,
অন্তর ছিল জর জর,
ঘুচিল পাইয়ে তোমারে॥

২৮৫

ধানেশ্রী পুরিয়া—জলদ তেতালা

আমারে বলে সই মোহিনী,
আপনারে বলে না মোহন।
যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত,
কহে কত মত, সাবধান মোর মন॥
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন,
কেবল আপন।
তার সুখে সুখী, আমি দুঃখে দুঃখী,
তাহা কখন কি, শুনিতে পায় শ্রবণ॥

২৮৬

এলাইয়ী—জলদ তেতালা

আমি যারে চাহি সে না রাখে মান।
এমন পিরীত বল, কিবা প্রয়োজন॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তারে, বাঁচায় যে প্রাণ॥[১]

২৮৭

রাগিনী কেদারা—তাল হরি

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব কার দোষ দিব,
নিলে কোন জন॥
না বলে কেমনে রব বলো, বল কি করিব।
তোমা বিনে আর সেখানে
কাহার গমনাগমন॥
অন্যের অগমনীয় জান সে স্থান নিশ্চয়।
ইথে অনুমান এই হয় প্রাণ তুমি সে কারণ॥
যদি তাহে থাকে ফল লয়েছ করেছ ভাল।
নাহি চাহি আমি যদি, প্রাণ
তুমি করহ যতন॥[২]

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ী—একতালা

বিষয় পিপাসা, সুখ লালসা,
নাহি হে মনোমোহন!
বিজন বিপিনে, গিরি গহনে,
কি দুঃখ প্রাণরতন?
কোমল কুসুম, সুখ শয়ন,
বেশভূষা চাহি চাহি,
না চাহি প্রসাদ, রাজত্ব নাহি চাহি,
(শুধু) চাহি ও চারু চরণ॥

১ রামনিধির উদ্ধৃত সঙ্গীতসমূহ 'গীতরত্ন প্রথম সংস্করণ (১২৪৪ সাল)' হইতে গৃহীত।
২ এই সঙ্গীতটি 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে গৃহীত।

শিবচন্দ্র সরকার

সুরট—মধ্যমান

জলদেরে জল দে রে বলে ডাকে চাতকিনী
কভু নীর পায়, কভু নিরুপায়, রয় অমনি ॥
সতত না পূরে আশা,
এমনি সে ভালবাসা,
সময়ে বঞ্চিত নয় এই গুণ মনে মানি ॥
যারে যার প্রয়োজন, সেই তার প্রিয়জন,
তারি ধ্যান ধারণায় অতি ধনে সেই ধনী।
থাকে দুঃখে সুখ বোধে,
আপনি মনে প্রবোধে,
নবঘন অনুরোধে, সতত নিরভিমানী ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

মরি প্রাণ, প্রেম-বাণ, করিলে সন্ধান।
হইলে হে রণজিৎ, ইন্দ্রজিতের সমান ॥
নহি গুণ তূণ ধনু, দেখা নাহি যার তনু,
অতনু সদৃশ হয়ে, এ তনু দহিলে প্রাণ ॥
নাহি কোন অপরাধী,
হানিলে বাণ শব্দভেদী,
বিদীর্ণ করিলে হৃদি, তব হৃদি কি পাষাণ ॥
আশ্চর্য তোমার শিক্ষে,
দেখা নাহি চারি চক্ষে,
রহিলে প্রাণ অন্তরীক্ষে,
এ দুঃখের নাই সমাধান ॥

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

তুমি ভালবাস না, এ কি ভাল বাসনা।
সাধ না পূরিল তবু করি সাধনা ॥
যত তুমি কর রাগ, তত বাড়ে অনুরাগ,
তাই বলি ত্যজ রাগ, ইথে বিরাগ হবে না ॥

কালীকুমার চক্রবর্তী

পীরিতি এমন পোড়া
আগে কি লো জানি সই ?
যে দিগে ফিরাই আঁখি
হেরিনে সে রূপ বই ॥
প্রথম দর্শনে সখি ! ভয়ে মেলি নাই আঁখি,
প্রিয়তমে হেরি যম সম।
দুই তিন মাস পরে, সে ভয় গেল অন্তরে,
হেরি তাঁরে সুজন পরম ॥
মমতা জন্মিল ক্রমে জানিলাম প্রিয়তমে,
তিনিই আমার—আমি তাঁর।
শেষে কি লো ! এই হয়, সকলেই রূপময়,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সার ॥

দীননাথ ধর

গারা ভৈরবী—মধ্যমান

রোগশোকভরা ধরাতে কি দুঃখ কভু দরিত
রমণী মহৌষধি যদি না থাকিত ॥
কি করে রোগ যাতনা,
আপদ বিপদ নানা ?
প্রেমময়ী নারী যদি বামে হয় বিরাজিত ॥
সে কি শোকানলে ডরে ?
যেবা সদা হৃদে ধরে,
মমতা গঠিত নারী স্নেহ-পূরিত ॥
দীনতা কি করে তার ? আঁধার কুটিরে যার,
লক্ষ্মীরূপা নারীরত্ন অযত্নেতে শোভিত ॥

এ জীবন ঘোর মরু, বিনে এই সুখতরু,
জানি না এই দগ্ধচিত কোথা আর জুড়াইত ॥
ভবের উদ্বেগ এত, না জানি কোথায় রহিত,
নারী বিমুখ যদি নাহি তাহে উদিত।

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সার নিধি ভুবনে রমণী রতন।
ছার জীবন বিনে সে ধন।
পরম মাথান, হেরিলে সরল নয়ন,
নাহি আর সম্পদে থাকে আকিঞ্চন,
জগজন শিরোভূষণ।
হইলে মলিন, সে সন্তাপে করে যতন ?
কেবা তোষে আদরে সে তাপিত প্রাণ ?
নারী সব সুখ নিদান ॥

শিবচন্দ্র রায়

রাইমুখ অরবিন্দে, হের আসি হের বিন্দে।
খঞ্জন নয়নেতে অঞ্জন বহে জল বিন্দে ॥
কি ক্ষণে কি দেবতায়,
জলে গিয়ে হেরে তায়,
ধ্যান জ্ঞান শিবার্চন সকলি তো
সে গোবিন্দে ॥

দ্বারকানাথ রায়

ঝিঁঝিঁট—আড়া ঠেকা

কে চিনিবে রে প্রেমধনে
প্রকৃতি-পুরুষ-ভাবে বিহরে ভুবনে ॥
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝিবা আপনি রূপ
ধরিল যুগলরূপ লীলার কারণে।
কি কব তাহার শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে ॥

নিশীথিনী সুধাকর সৌদামিনী জলধর ;
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
যে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার হৃদয় ভবনে ॥

নবকুমার মিত্র

মিশ্র—জলদ তেতালা

প্রেম অসাধ্য সাধন।
যে সিদ্ধ হয়েছে দুঃখ জানে সেই জন।
এ সাধনে কত শত, বিভীষিকা নানা মত,
সাধক হইলে সেত না মানে বারণ ॥
ব্যক্ত আছে প্রেম তন্ত্রে,
দীক্ষা হইলে পীরিত মন্ত্রে,
পঙ্গুেরি চরণ হয় অন্ধেরি নয়ন।
বোবা যদি প্রেম করে তার মুখে বাক্য সরে,
বোধিরে শ্রবণ করে সুমৃদু বচন ॥

কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

কানাড়া—ঢিমে তেতালা

ওলো সখি কে বলে পীরিতে দুঃখ হয় ?
উভয়ে মিলন হলে তবে দুঃখ কোথা রয় ?
উভয়ে উভয়ে হেরি, স্বর্গ সুখ ভোগ করি,
আহ্লাদে উভয়ে পুরি, অভিষিক্ত হয়।

গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু

পিলু—যৎ

মিলনে যে কত সুখ, সে জানিবে কেমনে,
যে জন না জলিয়াছে, বিচ্ছেদেরি জ্বলনে ?
অমানিশি না থাকিলে শশাঙ্কেরি শোভনে,
পূর্ণিমাতে যত শোভা হয়ে থাকে গগনে,
উল্লসিত হ'ত কেবা হেরে তাহা নয়নে ?

সুশীতল জল বল কে চাহিত যতনে,
যদি না তাপিত তনু তপনেরি কিরণে ?
পরশে হরিয়ে কেবা হেমন্তেরি জীবনে ?

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান

প্রেম ব্রত আজ আমার, হবে উদ্‌যাপন।
কৃষ্ণায় নম বলে সখি,
আহুতি দিব এ প্রাণ ॥
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতী,
রাখ আমার এ মিনতি,
কর ব্রতের আয়োজন।
ব্রত ফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
আজি তারি দক্ষিণান্ত,
ক্ষান্ত হও রে পাপ মন ॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জংলা—কাওয়ালী

কে জানে প্রেম কি রতন ?
কেন দেখে শশী, উথলে সরসী,
কুমুদিনী হাসে অনুক্ষণ ?
তপনে সন্তাপে ধরণী তাপিত,
পদ্মিনী সে তাপে হয় প্রফুল্লিত,
জলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে,
কে জানে কি ভাব, সে কেমনে ? ॥

যদুনাথ ঘোষ

বারোয়া—ঠুংরি

আমি কি তাহারে ভাবি পর ?
সে যে কত গুণাকর,
তাহলে পীরিতি কোথা ঘটে পরস্পর ?
কথান্তরে মতান্তরে, কিম্বা থাকে দেশান্তরে,
সে কেবল নয়নান্তরে, নহে অন্তরে অন্তর ॥
যা'রে দিলাম কুলমান,
তার কাছে কি অপমান ?
বিনাশে চাতকীর প্রাণ, কোথা নব জলধর ?
সে তো রাজা আমি প্রজা,
সদা তারি করি পূজা,
অবিচারি হলে রাজা, তবু দিতে হবে কর ॥

টোড়ী—জলদ তেতালা

হয়েছি অক্ষম তার দোষ গুণ বিচারিতে,
ভাল মন্দ যাহা ভাবে,
ভাবি তা সম ভাবেতে।
যখন যে রূপে দেখি, ভুলে যায় দুটি আঁখি,
সতত হৃদয়ে রাখি বাসনা হয় মনেতে ॥
জানি সে ভাল বাসে না,
তথাপি মন বুঝে না।
সহি যে কত যাতনা, থাকিয়া তার বশেতে
করে কত অপমান, তবু নাহি ম্রিয়মাণ
যদি করে অভিমান, সাধি ধরে চরণেতে ॥

কালিপ্রসাদ ঘোষ

বারোয়া—ঠুংরি

যদি তারে আমি পাই
লোক লাজ মান ভয়, কিছু নাহি চাই ॥
নয়ান পরাণ মনঃ, যাহে চারে প্রতিক্ষণ,
এমন সুখের ধন, সম কিছু নাহি ॥

ঝিঁঝিঁট—আড়া

জীবন থাকিতে তারে ভুলিব কেমনে ?
সতত বাসনা যারে রাখিতে নয়নে ॥

শশাঙ্ক কলঙ্ক ত্যজে, তার বদনে বিরাজে,
অমিয় বরিষে ঘন মধুর বচনে ॥

ঝিঁঝিট—যৎ

শশী বুঝি ভূমে উদিল,
হেরি সখি মন মোহিল।
এ মোহনরূপ, কোটি সুধা কূল
নারী হয়ে নারীর মন হরিল।
এ বদন চাঁদ, মৃগধরা ফাঁদ,
মন মন-মৃগ ধরিল ॥

হরিমোহন রায়

খাম্বাজ—কাওয়ালি

প্রেম রসে মজিলে এমন।
বল কে করিতে পারে ধৈরয ধারণ ?
গুরু জন তিরস্কার, ভাবি মণিময় হার,
অনুরাগ ভরে করে, হৃদয় ভূষণ।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা চায়, যতনে স্বকরে লয়ে,
চন্দন ভাবিয়ে করে, অঙ্গেরি লেপন ॥

হরলাল রায়

ভৈরবী—মধ্যমান

প্রেমিক যে, দেখে না নয়নে রে,
শ্রবণত করে না শ্রবণে।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে ;
প্রেমিকের ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে ॥

মহারাজ মহতাব চন্দ্র

কালাংড়া—একতালা

একেরি যতনে কভু মনেতে না সুখ হয়।
মন না ঐক্য হইলে প্রণয়ে কি সুখোদয় ?
উভয়ের সমান ধ্যান, নাহি করে ভেদ জ্ঞান,
এমন হইলে মন, সেই প্রেম সুখাশ্রয়।

আলোয়া—জলদ্ তেতালা

মন ভঙ্গ হলে পরে প্রেম কখন না রহে।
যতনে সাধিলে পুন, দ্বিগুণ অন্তর দহে ॥
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হইলে মন, প্রণয় সুস্থির নহে ॥

তারকনাথ বিশ্বাস

পিলু বারোঁয়া—তেতালা

প্রেমের জেনেছি সুখ,
প্রেম আর করিব না।
যে করিবে প্রেম
তারে করিতে করিব মানা ॥
একি প্রেমের যাতনা,
ভুলেও মন তারে ভুলে না,
ভুলিবারে করি মনে,
কিন্তু মন যে মানে না ॥
জানি না সে কোন্ জন,
যে সৃজিল প্রেম হেন,
সুখ আশে করি যাহা
তাহে কেন এ যাতনা ?

তারাকুমার কবিরত্ন

কানাড়া মিশ্র—কাওয়ালি

বলয় আকারে যথা শোভে হংসমালা।
রাঙা রাঙা পদ্ম শোভে যেন কানবালা ॥
হেন রম্য সরোবর কতশত আছে।
তথাপি চাতক নাহি যায় তার কাছে ॥
কি ফলে সে ধায় নব মেঘ বারি পানে ?
শিলাঘাত বজ্রাঘাত কিছু নাহি মানে ॥

ভৈরবী—যৎ

যাহার উপরে যার মনের প্রণয়।
সে ভাব কিছুতে তার ঢাকা নাহি রয়॥
মৃগনাভি শত বস্ত্রে কর আচ্ছাদন।
গন্ধ তার কিছুতেই না রবে গোপন॥

রাজকৃষ্ণ রায়

ললিত

পতি সনে যেতে বনে সতীর কি দুখ হে?
ত্যজি কায়া কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে?
স্বামী সহ অহরহ সতীরই সুখ হে!
কমলিনী হরষিনী হেরে রবি মুখ হে!

গৌরী—দাদ্‌রা

প্রেম যদি, সই, শিখতে হয়,
মানুষের কাছে নয়।
সাঁজের রবি, প্রেমের ছবি,
প্রেমের আলো আকাশময়॥
ঐ রবি সই, প্রেমের খেলা,
খেল্‌চে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলো,
কমলবালা চেয়ে রয়।
দূরে দুজন, তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥[1]

আশুতোষ দেব

১

রাগিনী দেশ মল্লার—তাল আড়াঠেকা

হের ঘনরূপা ঘন ঘন গরজে গভীর।
তমনাশে অট্টহাসে চপলা হতে অস্থির॥
রিপু মুণ্ডমালা গলে, সঘনে এমনি দোলে,
বলা কিনি মেঘ কোলে,
নিশ্বাস ঘোষ সমীর॥
সানুব সম কিঙ্কিনী, করে মৃদু মৃদু ধ্বনি,
চাতকী হয়ে যোগিনী, পিয়ে যে রুধির নীর॥
দৈত্যগণ বাজি নাশে, ধরণী ধরিয়া ত্রাসে,
আশুতোষ হৃদিবাসে, বশীকর স্বরে স্থির॥

২

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল কাওয়ালী

পার্বতী দুর্গতিনাশিনী।
তারা হরদারা ভবানী॥
আমি দীন দুঃখী অতি,
সম্প্রতি মাম্‌প্রতি,
দেহি জ্ঞান সঙ্গতি, সম্মতি দায়িনী।
দিন গত হলো মম ভ্রমের কারণে,
কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমে কুকর্ম করণে,
অপরাধ ঘোরতর,
ক্ষেমঙ্করি ক্ষমা কর,
ত্বরিতে কুরীতি হর, দুরিত নিবারিণী॥
পতিত হয়েছি আমি বিষম বিপদে,
এই নিবেদন শিবে তোমার শ্রীপদে,
সাধন বিহীন সুতে, আশু তার গিরিসুতে,
তুমি ভুবন প্রসূতে, ত্রিভুবনতারিণী॥

৩

রাগিনী ললিত—তাল আড়া

ওগো নগেন্দ্রজায়া আনিবারে মহামায়া,
কবে পাঠাইবে বল।
পাশরে আছ কেমনে গেছে কতদিন হলো॥

১ ৩৩৯-৩৪০ পৃষ্ঠার গীতসমূহ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'প্রীতি গীতি' হইতে গৃহীত।

কি বলিব গিরিরাজে,
ব্যগ্র তিনিরাজ কাজে,
ভয় নাই লোকলাজে, সহজে জড় অচল।
দেখিয়ে দিয়েছে পতি, নির্গুণ পশুপতি,
শ্মশানে সদা বসতি, ভাঙ্গে বিভোল পাগল।
কিসের অভাব শুনি, তুমি তো জননী রাণী,
আশু ভবনেতে আনি, কর জনম সফল।[১]

রঘুনাথ রায়

১

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া

একি মা করুণার রীত।
বারে বারে মম প্রতি ঘটাও হিতাহিত॥
যদি উত্তম দেহ দিলে,
কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতর এবার তুগে করুণা কিঞ্চিত।
তব কৃপা লেশে হয়, মমাশুভচয় হয়ে,
কৃপাদানে অকিঞ্চনে না করো বঞ্চিত॥

২

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী

মন মধুকর,
হরিপদ পঙ্কজে মধুপানে মজ,
রাখ এই মিনতি আমার।
নানা কুরস আস্বাদ,
নিরন্তর করি মোরে ঘটালে প্রমাদ,
এখন চঞ্চল তুমি না হইয়া আর,
কররে নৃহরি চরণে অনুধ্যান,
সাধ দীন অকিঞ্চনের উদ্ধার॥

রাগিণী বাহার
তাল—আড়াঠেকা

কে জানিবে অন্ত তব অনন্ততয়া।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েরি কারণ, আদি কারণ,
তব তত্ত্ব গুণে শুদ্ধ বিশ্ব বুদ্ধি মন জ্ঞান,
জানি দীন অকিঞ্চনে নাহি কৃপয়া।[২]

মহেন্দ্রলাল খান্

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ
উমাধনে
উমা উমা করে গো মা
কেঁদে মরি রাত্রি দিনে॥
আর কত ক্লেশ সব,
কি করিব কোথায় যাব,
হায়! কবে কোলে পাব
আমার উমা-রতনে।
উমার মুখারবিন্দ,
জিনিয়ে শারদচন্দ্র,
না হেরিয়ে নিরানন্দ
দেখ মম নিকেতনে॥[৩]

১ প্রাচীন গীতাবলী—চন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত (১২৯২ সাল)। পৃঃ ৪২-৪৩, ৪৭
২ প্রাচীন গীতাবলী—চন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত (১২৯২ সাল)। পৃঃ ১১, ৫, ৩।
৩ সঙ্গীতকোষ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। পৃঃ ৭১৫।

মন্নুলাল মিশ্র

ভৈরবী—মধ্যমান

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর,
নীলমণি ধনে ;
কপালমন্দ তাইতে সন্দ,
বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি,
যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে তো নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা,
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইয়ে হারা।
নয়ন তারা দিয়ে বনে ॥[১]

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক

কাফী রাগিণী—মধ্যমান

হৃদি কারাগারে ঘোরে
বেঁধেছি জীবন ডোরে,
প্রহরি রেখেছি প্রাণ,
যদ্যপি হারাই চোরে ॥
তুমি তা নাহিক জান,
দেহে প্রাণ অবস্থান,
যেমন তেমনে প্রাণ,
বন্ধন করেছি তোরে ॥[২]

হরিতাল অথবা তেওট

হৃদয়ে পাইয়ে তোরে, না পুরিল মনঃ আশা।
যেমন সাগর নীরে, অন্যথা নহে পিপাসা ॥
যাতে হৃদয়ে থাক, নিজজন বলে ডাক,
অন্তরে অন্তর ভব,
সে ভাবে ভাবি হুতাশা।[৩]

১ সঙ্গীত কোষ। পৃঃ ৭৮৫

২, ৩ সঙ্গীত রসমাধুরী (১২৫১ বঙ্গাব্দ)—জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক। পৃঃ ২২, ১৫১।

পরিশিষ্ট (ক)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১ ॥

কবিগান ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট বাঙালী সমাজের ঋণ চিরকালের। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎকালীন কাব্যজগতের অবিসম্বাদিত-শ্রেষ্ঠকবি। কবিখ্যাতির সঙ্গে প্রভাবশালী সাংবাদিকের তথা সম্পাদকের ক্ষমতা যুক্ত হইবার ফলে সেকালের বাংলা দেশ গুপ্তকবিকে কোন ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সংবাদ প্রভাকর তথা গুপ্তকবিকে কেন্দ্র করিয়া সেকালের সাহিত্য জগতের বহুতর ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মঙ্গল-নাট-গীত-পাঁচালী ও কবিগানের যুগ তখনো আসর গুটাইয়া যায় নাই, অন্যদিকে চলিতেছে য়ুরোপীয় আদর্শের আবেগসঞ্জাত নব্যবঙ্গের নবজীবনের সূচনাকালীন সমারোহ। দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে আনন্দ-বেদনার আবেগ-স্ফুরিত যুগ-জীবনে বাঙালীচিত্ত কখনো বা পুরাতনের অনুকারী আবার কখনো বা নূতনত্বের আহ্বায়ক। সেই যুগে, এই দ্বৈত-সত্তার আবেগচঞ্চল প্রতিরূপটি যাঁহার মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে, তিনিই গুপ্তকবি। গুপ্তকবি পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাহার অনুকারী হইয়াছেন, অন্যদিকে নূতন যুগের পদধ্বনিকে স্বাগত জানাইয়াছেন। উনিশ শতকের চারণকবি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গুপ্তকবি ও তৎকালীন কাব্য-পরিমণ্ডলের সাহিত্য চেতনার ক্ষেত্রে এবং রচনার ক্ষেত্রে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের রূপটি যে একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না। দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির সহায়ক। 'সুধী-রঞ্জন'-খ্যাত দ্বারকানাথের কবিখ্যাতিও উনিশ শতকে বড় অল্প নয়। কিন্তু পুরাতনের অনুকারিতা ইঁহাদের সাহিত্য জীবনে যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতচন্দ্রকে পুরোভাগে রাখিয়া পাঁচালীকার কবিওয়ালা এবং আখ্যায়িকাকাব্যের যে মিছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল, তাহারই সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছেন দীনবন্ধু-দ্বারকানাথ-বঙ্কিমচন্দ্র; মাঝখানে রহিয়াছে গুপ্তকবির হৃদয়দেশ এবং তাঁহার জাগ্রত-চৈতন্য। সেইজন্য, বাংলা সাহিত্যে গুপ্তকবিকে কেন্দ্র করিয়া যে কবি-সমাজের উপস্থিতি ঘটিয়াছিল, তাঁহারা 'কামিনীকুমার', 'চন্দ্রকান্ত' কিংবা

'জীবনতারা' কাব্যের রচক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা হইয়াছিলেন নবজীবনের তথা নবযুগের সার্থক পথিকৃৎ।

গুপ্তকবির সাহিত্য সাধনার সহিত সাহিত্যিক-স্বজনের প্রয়াস, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অশেষ শুভকর হইয়াছিল। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনী চালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্বপ্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক, নানা রস পরিপূর্ণ কবিতা লেখায় চমৎকার শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইঁহার আর এক গুণ ছিল, লেখক-বর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না, এজন্য লেখকদিগের সহিত তাঁহাদের কীর্তিও লোপ পায়। ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধহয়, কখন কোন দেশে কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।'[১] বঙ্কিম, দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু-র সাহিত্যজীবনের শুভপ্রকাশ ঘটে ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্তের আনুকূল্যে।[২] পরবর্তীকালের কৃতি সাহিত্য পথিক মাত্রেই গুপ্তকবির স্নেহস্পর্শে সৌভাগ্যবান। সংবাদ প্রভাকরের একটি বিশেষ বিভাগ ছিল, যে বিভাগে 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত' রচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, গোপাল-চন্দ্র সেন, বিশ্বম্ভর দাসবসু, রাধামাধব মিত্র প্রভৃতির রচনা এই বিভাগে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। প্রকাশিত রচনার শেষে সম্পাদকের মতামতও অনেক ক্ষেত্রেই থাকিত। এই মতামতগুলি প্রত্যক্ষভাবেই এই তরুণ কবি-সমাজকে উৎসাহ যোগাইত। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন গুপ্তকবির অশেষ স্নেহধন্য প্রিয়তম শিষ্য। অথচ গুপ্তকবির মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র যে তর্পণ করিয়াছেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে একদিকে যেমন বিস্ময়বহ অন্যদিকে তেমনি শোকাবহও বটে।

He was a very remarkable man. He was ignorant and uneducated. He knew no language but his own, and was singularly narrow and un-enlightened in his views ; yet for more than twenty years he was the most popular author among the Bengalis......of the higher qualities he possessed none, and his work was extremely rude and un-cultivated. His writings were generally disfigured by the grossest obscenity. His popularity was chiefly owing to his perpetual alliteration and play upon words......strange as it may appear, this

---

১ বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য (১২৮৮ সালে প্রকাশিত)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃঃ ৯-১০।

২ কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের কথা—নিরঞ্জন চক্রবর্তী (দেশ ২৫ আশ্বিন ১৩৬৪ সাল।)

obscure and often immoral writer was one of the precursors of the Modern Brahmists ... His acquaintance with the leading tenets of the ancient Indian systems of philosophy ought not to surprise any one, even though we have said that he was uneducated; for they were pretty well-known to most Bengalis of the same amount of culture in a generation which is fast dying out.[৩]

তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অল্পজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না, এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সংকীর্ণ ও কুসংস্কারপূর্ণ ছিল; তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তিনিই বাঙ্গালীজাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন।... ... তাঁহার আর কোনও উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল না। এবং তাঁহার রচনা অত্যন্ত গ্রাম্য ও অসংস্কৃত: তাঁহার রচনাদি অধিকাংশ স্থলে জঘন্য অশ্লীলতায় কলঙ্কিত। অফুরন্ত অনুপ্রাস এবং অপূর্ব শব্দালঙ্কারের ছটাই তাঁহার লোক-রঞ্জক হইবার প্রধান কারণ: ...ইহা আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, এই অশ্লীল ও কুরুচি সম্পন্ন লেখক আধুনিক ব্রাহ্মদিগের অগ্রদূত স্বরূপ ছিলেন।......প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রাদির প্রধান মতবাদগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোনও কারণ নাই। তথাপি তাঁহার ন্যায় অল্পশিক্ষিত সেকালের অনেক বাঙ্গালীই এই সকল মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন।[৪]

সমালোচক বঙ্কিম এই পর্যায়ে যে ভাবে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের রূপ বিচার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উগ্রপন্থী হিসাবে নির্দেশ না করিয়া উপায় নাই। তৎকালীন সমালোচকগণের নির্মম কশাঘাত বঙ্কিমকেও সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁহার নব নব সৃষ্টির জন্য। বঙ্কিমের প্রতি এই বিরূপ সমালোচনার ধারা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। যুবক বঙ্কিম তাই সাহিত্য সমালোচনার সময় কাহাকেও অপদস্থ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যদিও ইহা সত্যমূল্য নির্ধারণের নামেই চলিয়াছিল। এ যুগের বঙ্কিম 'শিক্ষা' বলিতে 'ইংরেজী শিক্ষা'কেই একমাত্র সম্বল করিয়াছেন এবং ইংরেজী শিক্ষিতদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। এই

৩ Bengali Literature—B. C. Chatterji (The Calcutta Review. 1871, No 104, P. 298-299)

৪ বাঙ্গালা সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কৃত অনুবাদ পুস্তক) পৃঃ ৯-১২।

কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-কৃতি-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যেখানে তিনি সন্দিগ্ধ হইয়াছেন সেইখানেই প্যারীচাঁদ মিত্রের কথায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন।[৫] প্যারীচাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিকে আমি এখানে নিম্নমূল্যের বলিয়া নির্দেশ করিতেছি না, সাহিত্য সমালোচক বঙ্কিমের দৃষ্টির ক্রমানুসরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। উগ্রপন্থী বঙ্কিম আপনাকে সংযত করিয়া আত্ম-সমালোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া বোধহয় আপনি আপনি নিজ-ত্রুটির স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাই, গুপ্তকবির 'কবিতা-সংগ্রহে'র ভূমিকা-কথায় পরিণত বঙ্কিমের গুরু পৃজা পৃথক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। আত্ম-সচেতন বঙ্কিম আপনার পূর্বমতকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াও শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। গুপ্তকবির যে ভাষাকে তিনি নিন্দাবাদের দ্বারা পূর্বেই ধিকৃত করিয়াছিলেন তাহারই বিচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই— ইংরাজী-নবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলা কা ফুল নাই।' ইহা তো শুধু ভাষা প্রসঙ্গের আলোচনা। গুপ্তকবির সামগ্রিক রূপ-বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বলিয়াছেন,—'তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।' ইহার পর বঙ্কিম আপনার মতকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে ফাঁকি এবং মেকী কিংবা উচ্ছ্বাস অথবা অহমিকা কোনটাই নাই।

গুপ্তকবির কাব্যসাধনা এবং তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামতের প্রকাশ ঘটিয়াছে। কেহ বা কবিকে নিছক 'বাঙ্গালী কবি' বলিয়া দায় সারিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিকে মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া ভাবিতেও সঙ্কুচিত হইয়াছেন। গুপ্তকবির এই দুরদৃষ্ট যে কিছু মাত্রায় অহেতুক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র এবং কবিওয়ালাদের বংশধর হঠাৎ

৫ ঐ। পৃঃ ১৮-১৯

পৃথক পথ ধরিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, ইহা হইল তৎকালীন সাহিত্যের সামগ্রিক সত্তার অভিপ্রকাশ। মানস সরোবরের মৃদু তরঙ্গ উৎক্ষেপনে কবিচিত্ত অশান্ত হইয়া জীবন-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচিত্র-বাহিনী করিয়া দিল। আশক-খারাবির পাঠ কিংবা বিদ্যা ও সুন্দরের জীবন-বিন্যাস অথবা রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস, নয়ত জগন্মাতার প্রতি ভক্তের আকুতি কবি-কল্পনাকে কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত-বিহারী করিয়া রাখিতে পারিল না; ইহার কারণ তৎকালীন যুগ-চেতনা। এই যুগ-ই গুপ্তকবিকে ভারতচন্দ্র কিংবা হরুঠাকুর বা রাম বসু করিয়া রাখে নাই তাঁহাকে আধুনিক বাংলা কাব্যের উদ্গাতার আসনে বসাইয়া অভিনন্দিত করিয়াছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় বর্তমান গদ্য সাহিত্যের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনা করিলে যেমন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, সেইরূপ আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিলে অসঙ্গত হইবে না। সৃষ্টির উষা-লগ্নে যাঁহাদের কলকণ্ঠে পুণ্যপ্রভাতের আগমনবার্তা ধ্বনিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সুরে যদি বেহাগের মূর্চ্ছনা না জাগিয়া ভৈঁরোর দিগ্বন্দনা মূর্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে তাঁহাদের শক্তির ন্যূনতা প্রকাশ না হইয়া স্বাভাবিকতারই জয় ঘোষিত হয়। আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাবাকাশ হিসাবে কবিগানের উজ্জ্বল উপস্থিতি যেমন অনস্বীকার্য তেমনি আধুনিক বাংলা কাব্যের অগ্রপথিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কৃতিত্বও সমান মর্যাদার অধিকারী।

দৈনন্দিন জীবন-চর্যার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা-বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করিয়া কবিতা রচনার ক্ষেত্রে গুপ্তকবিই প্রথম পদচারণা করিয়া গতানুগতিকতার গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিলেন। কি নৈসর্গিক কবিতা, কি দেশপ্রেমমূলক কবিতা—সকলক্ষেত্রেই গুপ্তকবি জনচিত্তকে আকৃষ্ট করিলেন। ইহার সহিত তাঁহার রঙ্গ-ব্যঙ্গের সরস সামঞ্জস্য ত আছেই। 'রসভরা রসময় রসের ছাগল' কবিকে 'পাগল' করিয়াছে। সকল কালের পাঠকই ছাগলের 'চাঁদমুখে চাপ দাড়ি গলে নাই গোঁপ' ভাবিয়া হাসিয়া খুন হইবেন, আবার ছাগলের উপস্থিতি উপলব্ধি করিবেন যখন কবি বলিবেন, 'শত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে।' অতি তুচ্ছ 'ছাগল'কে লইয়া কবি কবিতা রচনা করিয়া পাঠককে শুধু হাসাইয়া ক্ষান্ত করেন নাই, তাঁহাকে আশ্চর্য করিয়াছেন। গতানুগতিকতার বাঁধাপথে তিনি চলেন নাই—তাই পাঠক আশ্চর্য হন। কিন্তু পাঠককে আশ্চর্য করা কোন শ্রেষ্ঠ কবির একমাত্র কাম্যবস্তু নয়,

কবির কৃতিত্ব পাঠকের অন্তর জয় করার শক্তিতে। গুপ্ত কবি পাঠক সাধারণকে তাঁহার বিভিন্ন রচনার দ্বারা আশ্চর্য করিয়াছেন, গতানুগতিকতা হইতে মুক্তি দিয়া নূতনত্বের আস্বাদ আনিয়া দিয়াছেন কিন্তু পাঠকের অন্তর্জগতের অর্গল তিনি মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে সবই ছিল, ছিল না শুধু আত্মলীনতা বা আত্ম-নিমগ্নতা। কবি বোধহয়, তাঁহার কবিত্বের এই অপূর্ণতার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তত্ত্ব-প্রকরণ বা আত্মতত্ত্বের প্রতি তাঁহার কাব্যের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কেবল অধ্যাত্মরাজ্যের কথায় সীমিত হইয়া পাঠক ও কবির অন্তর্জগতের ঐক্যবন্ধন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা-লগ্নে তিনি যদি আধুনিক বাংলা কাব্যের 'বর্ণমালা'র সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া থাকেন সেইখানেই তো তাঁহার যথার্থ সার্থকতা; তাঁহার কাব্যে যদি 'কথামালার'-র রসসঞ্চার না হইয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত বা ব্যথিত হইবার কিছুই নাই.

গুপ্তকবি শুধুমাত্র কাব্যের তরণীতে ভর করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দেন নাই। গুপ্তকবির জীবন-নৈবেদ্যে তিনটি পৃথক পুষ্পস্তবকের সমারোহ। কবিওয়ালা হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। সাংবাদিকতা তথা ঐতিহাসিক-অনুসন্ধানপ্রিয়তা এবং গবেষণা বৃত্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাঁহার বিপুল পরিচিতি সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু এই জীবন তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। তাই যুগ প্রভাবের গুণে কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগের প্রতিভূ-কবি হিসাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবি-জীবনই তাঁহার একমাত্র জীবন নয়, তাই কাব্যলক্ষ্মীর লীলা-কমল প্রসাদ হিসাবে তাঁহার নিকট আসিলেও পদ্মের দলগুলি যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন-ভাবেই আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি. তদানীন্তন কালের কাব্যজগতে যাঁহারা কবিতা রচনা করিয়া স্মরণীয় হইয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত একই সমতল ভূমিতে রাখিয়া গুপ্তকবির কবিকৃতির সমালোচনা করিলে তাঁহার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। 'গুপ্তকবির কালে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিখ্যাতির ঔজ্জ্বল্য অসাধারণ। তাঁহাকে সেকালের কবিসমাজের প্রতিনিধি ভাবিয়া সেকালের কোন বিদগ্ধ সমালোচক যে ভাবে তৎকালীন কাব্য-পরিমণ্ডলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া গুপ্তকবির কবিত্ব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। 'পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রে পয়োধি বিশেষ এবং প্রকৃত কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে; কিন্তু

অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিত্বশক্তি ধারণ করেন।'[৬]

কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যথার্থ পরিচয় চিহ্নিত হইয়া আছে আধুনিক বাংলা কাব্যের অগ্রপথিক হিসাবে। অগ্রপথিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—আধুনিক বাংলা কাব্য-প্রবাহের নূতন ভগীরথ।

॥ ২ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২৫ ফাল্গুন ১২১৮ সাল) সে যুগে কবিগানের নূপুর সিঞ্জন ছিল অতিমাত্রায় স্পষ্ট। 'ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সঙ্গীত-রচনা শক্তি ছিল।'[৭] এই শক্তির প্রভাব অতি শৈশব হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। '১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, শখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন পল্লীতে বারোয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদি দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারে ওস্তাদলোক উত্তর-গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে, ঈশ্বরবাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই প্রতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটি প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।'[৮] সাহিত্য-জগতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রথম পরিচয়, তিনি কবিওয়ালা। কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক বাঙ্গালী-সমাজের নিকট সুপরিচিত নহেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবি ঈশ্বর গুপ্ত সেখানে অপ্রকাশ। নয়নাশ্রুর সরোবরে হৃৎপদ্মের সুবিকাশ, কবিহৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সামগ্রিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে কবিওয়ালা হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের সংবাদ তাই অশেষ আনন্দের এবং বহুতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁহার রচিত যে কয়টি কবিগান সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে গুপ্তকবির নামাঙ্কিত কয়েকটি গীত বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না যদিও পূর্ববর্তী কয়েকজন সঙ্কলন-কর্তা এ গুলি তাঁহাদের গ্রন্থভুক্ত

৬ বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ৩৬

৭ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮ সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৬ সাল।

করিয়াছেন।[১] ইহার কারণ বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় এই গীতসমূহ গুপ্ত কবি রচিত 'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' এবং 'প্রবোধ প্রভাকর' গ্রন্থের মধ্যে নয়ত অপরাপর প্রখ্যাত কবিওয়ালাগণের রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত গুপ্ত কবি রচিত অন্যান্য যে কয়েকটি কবিগান সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

চিতেন। সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয়।
পরচিতেন। হেরি পদ্মের উপর পদ্ম আবার—তাতে বারি বয়।
ফুকা। মুখপদ্মে নীলপদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মে বহে জল, মুখ শতদল, ভাসিছে দেখ গো সখী।
মেলতা। আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই ;
কমলের জলে কমল ভেসে যায়।
মহড়া। তোরা দেখে যা গো সখী হ'ল একি দায়,
তোরা দেখ্, ওই প্রাণ সই, এত বারি নয়—
অনল, শ্রীমুখ কমল, শুখাল বল করি কি উপায়।
ফুকা। রাধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী।
অতি শীর্ণ হেমকায়, সখী একি দায়, দুখে মনেতে দুখী।
মেলতা। এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে, সখি গো কি জন্যে,
একা রাই কাঁদেন, কোথায় শ্যাম রায় ?

২

চিতেন। শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশা, এই দশা ঘটেছে আমার।
পরচিতেন। পূর্বভাবে তাই ভাবান্তর, মনেতে যন্ত্রণা অপার।
ফুকা। ব্রজে আন্‌ব বলে ব্রজের জীবন ধন,
গেলাম করিয়া করিয়া মন সাধ,
কৃষ্ণ সাধিল বাদ, বিষাদে মগ্না তাই এখন।
মেলতা। মাধব এল না ব্রজেতে, মজে কুবুজার প্রেমেতে,
এখন বল্ গো সই কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।

---

১ গীতরত্নমালা—অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান।

মহড়া। জানলাম নিশ্চিত গো প্রাণসই,
ব্রজে আস্‌বে না শ্যাম রায়।
প্রাণসই, শুন কই, কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব,
এখন নব ভাব, আর কি শ্যাম জুড়াবেন শ্রীরাধায়।
খাদ। এই দশা ঘটে থাকে সখী গো, সুখের দশা যখন যায়
ফুকা। মিছে ভাবলে হবে সখী কি এখন,
রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো হওয়া ভার,
গোপীকার জুড়াবে না মন।
মেল্‌তা। সুখ হবে না ব্রজের আর, মন বুঝেছি আমি সার,
এখন অকূলে বুঝি দুকূল ভেসে যায়।

চিতেন। ইদানী এ দানী সই, কে গো ঐ, আহা মরে যাই;
পরচিতেন। অপরূপ রূপ অনুপ এরূপ স্বরূপ দেখি নাই।
ফুকা। নটবররূপ ধরায় ধরা ভার,
দানী কিসের আশে আমার কাছে আসে,
ক্ষণেক হাসে ভাসে নাশে অন্ধকার।
মেল্‌তা। মরি কি রঙ্গ ত্রিভঙ্গ, বয়স তরঙ্গ,
অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
মহড়া। সখি এ দানী কে ও যমুনায়?
প্রাণ সই রে এমন দেখি নাই।
দানীর শ্রীমুখ সরোজে, মুরলী গরজে
গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়।
খাদ। নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।
ফুকা। দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ,
আমায় ছলে ছলে, প্রেম বলে বলে,
আবার বলে বলে রাধে দেহ দান।
মেলতা। হ'ল অধৈর্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান,
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায়।

৪

চিতেন। বঞ্চিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ায়ে চন্দ্রাবলীর মন ;

পরচিতেন। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে মদনমোহন।

ফুকা। দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে ;
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চক্ষে।

মেল্‌তা। মাথায় কাল কেশ ধার্‌ না, কুঞ্জে কাল সখী রাখব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনবো না।

মহড়া। কাল ভালবেসে হ'ল এই যাতনা!
আগে মানি নাই কালাকাল, জানি নাই কালাকাল,
জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না।

খাদ। শট লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না।

ফুকা। কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে ;
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখতে আর আমায়,
সখি বলিস্‌ নে মেনে।

মেল্‌তা। কালচক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখ্‌ব না।

৫

চিতেন। যতনে মন প্রাণ তোমায় দান, করেছি লো প্রাণ,

পরচিতেন। নিয়ত তব আশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণ

ফুকা। ভুলে ধর্ম পানেও চেয়ে দেখ না।
নিশিদিন তুষি মন তোষ না তবু মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।

মেল্‌তা। উচিত নয় বিধুমুখী, অনুগতে করা দুখী
হান কি দোষে নির্দোষীরে বাক্যবাণ।

মহড়া। বুঝলাম প্রেয়সী, আমায় করে দোষী,
অন্য জনে দিবে প্রাণ।
আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়াও মন-অভিমান।

৬

চিতেন। এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার।

পরচিতেন। হায়! শ্রীদামের অভিশাপে মনস্তাপ;
গোলকধাম হ'ল শূন্যাকার।

ফুকা। কেন বিরজা সই ভাব আর,
শ্রীমতী, আদ্যা-প্রকৃতি, প্রধানা সবাকার।
করি হরি সে বিবাদ, হরিষে বিষাদ,
হইল সাধে গো তোমার।
কেন সখি ভাব অকারণ,
হয়ে আমার প্রেমময়ী, হ'লে তুমি জলময়ী,
ও জলে ডুবিয়া সই জুড়াব জীবন।

মেল্‌তা। গোকুলে হব কৃষ্ণ-অবতার,

মহড়া। রাধা ইচ্ছাময়ী সকল ইচ্ছা তাঁর।*

৭

চিতেন। হাসি আর ধরে না মুখে প্রাণ আমার দেখে হায় ওরে প্রাণ

পরচিতেন। লাজে হাসি মুখে উদয় আসি তোমার,
প্রাণ রে, একি হ'ল দায়।

ফুকা। ন মাস হ'লে পরে পাব সাধ প্রাণ আমার,
ও রে প্রাণ রে, তাই কি আজ সাধিছ বাদ,
ওরে প্রাণ রমণী হয়েছি যখন সাধে নাই অসাধ।
মরুর সমান তুমি, ও রে প্রাণ রে, তনয় হ'ল না ওরে প্রাণ

মেল্‌তা। হবে সুত মম শশিসম রূপে, তাই কি তোমার হিংসা হয়।

মহড়া। চন্দ্রবংশ নাম প্রাণ, ধরায় খ্যাত হবে অতিশয়,

শওয়ারি। বুধের সুত পুরূরবা, শশি সুতে বল্‌বে বাবা,
মান বাড়বে তাতে প্রাণতো জান না,
দু দিকের ভাব বুঝলে দোষ হয় না।

* ১ হইতে ৬ সংখ্যক কবি-সঙ্গীতসমূহ 'প্রাচীন কবি-সংগ্রহ' হইতে সংগৃহীত।

মেলত। বংশ রক্ষা হবে, রাজ্য রবে যাতে, সরমে তাতে উচিত নয়।
মহড়া। কিরূপে সন্তান ও প্রাণ (তো) হয়েছি তোমারি।
মেলতা। কয়ে কটু কথা প্রাণে বাথা দিলে ভালবাসা নাহি রয়।[১০]

গুপ্তকবির সাহিত্য-জীবনে কবিগানের প্রভাব সমধিক। সময় বিশেষে তিনি যে নিজেই কবিগান গাহিতেন সেরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খৃস্টাব্দ) কবিগানের শেষযুগের একটি উজ্জ্বলতম দীপ-শিখা।[১১] তিনি গুপ্তকবির অন্যতম সার্থক শিষ্য। 'শুনিতে পাই, একবার কাশীধামে হাফ-আখড়াই-এর আসরে গুরু শিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল: মনোমোহন নিজগুরু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতিরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফ্-আখ্ড়াইয়ে 'শিষ্যবিদ্যাই গরীয়সী' হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুণপনায় এরূপ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীত ক্ষেত্রে স্বয়ং হার মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।[১২]

কবিগানের সহিত গুপ্তকবির যোগ ছিল একান্ত পক্ষে আন্তরিক। তাই তিনি কেবল কবিগান রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কবিওয়ালাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার পুণ্যব্রতও গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাহার ফলে আজিকার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগান এবং কবিওয়ালাদিগের অস্তিত্ব-রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। গুপ্তকবির গবেষণামুখী জনন-বৃত্তির অন্যতম অভিজ্ঞান হইল এগুলি। ইহার জন্য গুপ্তকবিকে যে ভাবে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণ তিনি সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় জানাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ এবং ইহাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনি 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' পুস্তিকার[১৩] ভূমিকা অংশে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"বঙ্গভাষাভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তদ্রূপ প্রচারক পুরাতন কবি কদম্বের জীবনচরিত সংগ্রহ পূর্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর

১০ সঙ্গীত-সংগ্রাম—ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন (সাহিত্য-সংহিতা আশ্বিন, ১৩২০ সাল)।

১১ বর্তমান গ্রন্থে 'মনোমোহনের কবিসঙ্গীত উদ্ধৃত হইলেও অনুরাগী পাঠকগণকে 'মনোমোহন গীতাবলী' দেখিতে অনুরোধ করি।

১২ হিতবাদী, ৪ ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল।

১৩ ১ আষাঢ় ১২৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা পথের পথিক হইয়া প্রতিনিয়তই উৎসাহরথের চালনা করিতেছি, এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, — সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিরতই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। স্থানবিশেষে গমন পূর্ব্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পারিলে তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিতেছি, যেন এই পদ দ্বারা অদ্য ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি শিবপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালে পূর্ব্বকার সকল দুঃখ এককালেই দূর হইয়া যায়, সমুদয় উদ্যোগ, সমুদয় যত্ন এবং সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকি। অপিচ সম্যক্ প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এই বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই আমোদ বোধ হয় না, অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই মন স্থির হয় না, অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবিতার ভাবনাই করিতেছি। মনের মত একটি কবিতা প্রাপ্ত হইলে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তখন বোধ হয়, যেন এই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্ত দর্শক হইয়াছি, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালী কীর্ত্তন' ও কৃষ্ণ কীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুর গান এবং অবস্থা ভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

অনন্তর রামনিধি সেন অর্থাৎ 'নিধুবাবু', '৺হরু ঠাকুর', ৺রাম বসু, 'নিতাই দাস বৈরাগী', 'লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস', '৺রাসু' ও 'নৃসিংহ' এবং আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবনচরিত ও কবিতা কলাপ এক এক মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি, সেই সমস্ত বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক্ প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে তাহার কোন কোনটিই

পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয় নাই, কেবল সংবাদ-পত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি, অবিলম্বে মূল্য নির্দিষ্ট পূর্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্বত্র প্রচার করিব এমত মানস করিয়াছি, ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈবঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা নিবারণ পূর্বক অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, নচেৎ এই পর্যন্তই শেষ করিতে হইল।

ইহাতে এতদ্রূপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে, এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনুষ্ঠান করণ মাত্র গাত্রপাত্র অমনি বিষম ব্যাধির আধার হইয়াছে। অতিশয় দুর্বল ও উত্থান শক্তি রহিত হইয়া দুই মাস কাল শয্যা সার পূর্বক অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে কেবল জলে জলে বহু স্থলে ভ্রমণ করিলাম, অথচ অদ্যাপি সুস্থ হইয়া পূর্ববৎ সবলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই। রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণেব প্রত্যাশা পরিহার করিয়াছি, তথাচ এ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি নাই। সুপ্তির যথার্থ রূপ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছিল, অথচ স্বপ্নে স্বপ্নে এমত অনুমান হইয়াছে, যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য সাধন করিতেছি।

আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেন না একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমরা এ পর্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি এবং ইহার পর যতদূর সাধ্য ততদূর করিব। কোন মতেই ত্রুটি করিব না, ইহার নিমিত্ত যখন মহারত্ন পরমায়ুঃ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য ধনে অধিক কি স্নেহ জন্মিতে পারে।

এতদ্দেশীয় পূর্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পূর্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই; এবং সেই সেই কবি মহাশয়রাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই; সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি এক প্রকার সর্বত্যাগী হইয়া

শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি, এবং যিনি সর্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব বিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নাম পর্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত। যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১০০ একশত বৎসরের পূর্বেকার কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানাপ্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গালা কবিতার ও গীতাদি রচনার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, বাক্যদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

এতৎ কার্যারম্ভের পূর্বে কোন কোন ধনী সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনীর সেই সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘধ্বনির ন্যায় সমুদয় মিথ্যা হইল। যদি ধনাঢ্য মহাশয়েরা ধনের আনুকূল্য এবং কাব্যপ্রিয় উৎসুক মহোদয়েরা সংগ্রহের নিমিত্ত মনের ও শ্রমের আনুকূল্য করেন, তবে এই গুরুভারকে এত ভার বোধ করিতে হয় না, এই গুরুভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে। যাহাতে দশের সংযোগ তাহাতেই যশের সংযোগ ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু এ পক্ষে কোন মতেই আর বিলম্ব বিধেয় নহে, কারণ প্রায় সমুদয় প্রাচীনলোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইক্ষণেও যে দুই এক ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহারাই অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার পর সেই সকল লোকের অভাব হইলে সমুদয় অভাব হইয়া পড়িবে। তখন কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া বিতরণ করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিব না। যদিও সম্পূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্যন্ত হইয়া উঠে তাহাই উত্তম, যখন সবস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে, সুতরাং তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

কেহ যেন এমত বিবেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের কামনায় এই শুভসূত্রের সঞ্চার করিতেছি, ইহাতে আমারদিগের মনে অর্থের আশা কিছু মাত্রই নাই, শুদ্ধ এই মাত্র অভিলাষ করিতেছি যে, এই অভিপ্রায়ানুসারে অপ্রকটিত

পদ্যপুঞ্জ প্রকটিত হইলে পূর্বতন মৃত কাব্যকর্তারা আপনাপন কীর্তি সহিত পৃথ্বী সমাজে পুনর্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরব পুষ্পের সৌরভ সর্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারী অনিপুণ কবিদিগের গর্ব পর্বতচূড়া সহিত অধোভাগে পতিত হইবেক, এবং যাঁহারা কবিতা প্ররচনাপথে প্রবেশ করিয়া চরণ চালনা করিতেছেন, তাঁহারা চরণ চালনার পক্ষে বিশেষ সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন, অনায়াসেই পদলাভের পদ পাইবেন।

যে সকল নব্য সভ্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা কাব্যের মর্মজ্ঞ নহেন, সংপ্রতি প্রীতি চিত্তে অনুরোধ করি, আমরা যে সকল প্রাচীন কবিতা পত্রস্থ করিয়াছি ও করিতেছি, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া যত্নযোগে স্থিরভাবে ভাবগ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন, এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষার কবি সকল কবিতা দ্বারা কতদূর পর্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন! শব্দের কি লালিত্য! মধুরত্ব! ভাবের কি মাধুর্য! সৌন্দর্য! রসের কি তাৎপর্য! আশ্চয! আশ্চয! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য দেখিতে পাই না। আমরা যৎকালে সময় বিশেষে রস বিশেষের পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয় যে, সেই সকল রসসমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরী লীলা দ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকা উক্তিভেদের দুই একটি বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে এমনই বোধ হইবে যেন স্ত্রী, পুরুষ অথবা সহচরিগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানাভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন, কিছুই অসাক্ষাৎকার বোধ হইবে না।"

গুপ্তকবির মর্মবেদনা যথার্থভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার আবেগ-উদ্বেলিত ভাষার মাধ্যমে। সে যুগে বাংলা গদ্য সাহিত্য হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া সাধারণের দুয়ারে হাজির হইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে যুগে গুপ্তকবির এই অপূর্ব গদ্য-রচনা আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়। এ ভাষা সাংবাদিকতার জন্য নির্দিষ্ট হয় নাই কিংবা এ ভাষা একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করা ভাষা নয় যাহা কেবল ব্যবহারিকতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে গদ্য-শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, গুপ্তকবির গদ্যরচনার কোন সঙ্কলন গ্রন্থ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গুপ্তকবির রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের যথার্থ গুপ্তরত্নোদ্ধার করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন—

গুপ্তকবি প্রাচীন কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া যে ভাবে 'সংবাদ প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (অজু গোঁসাই সহ)	—১ আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ১২৬০ সাল ও ১ ফাল্গুন ১২৬১ সাল
রামনিধি গুপ্ত	—১ শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৬১ সাল
রাম বসু	—১ আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাঘ ও ফাল্গুন ১২৬১ সাল
নিত্যানন্দ বৈরাগী	—১ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন ১২৬১ সাল
কেষ্টা মুচি, লালু ও নন্দলাল, ভবানে বেনে ও গোঁজলা গুঁই	—১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল
হরু ঠাকুর	—১ পৌষ ১২৬১ সাল
রাসু ও নৃসিংহ	—১ মাঘ ১২৬১ সাল
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	—১ মাঘ ১২৬১ সাল
ভারতচন্দ্র	—১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১ সাল

গুপ্তকবির সংগৃহীত কবিওয়ালাদের জীবন-বৃত্তান্তসমূহ বিস্তৃততর পরিচয় সহ বর্তমান গ্রন্থের পূর্বভাগে সমাহৃত হইয়াছে। পাঁচালীকার লক্ষ্মীকান্তের কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যেহেতু তাঁহার আলোচনা কবিওয়ালা প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেইজন্য বর্তমান গ্রন্থে তৎ-প্রসঙ্গ যুক্ত হইল না। ঠিক একই কারণে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সংযোজিত হইল না বটে, তবে প্রাচীন কবি-দ্বয়ের জীবন-বৃত্তান্ত (যাহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা) বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নয়। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা অংশে গুপ্তকবি রচিত 'ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত' যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থের প্রারম্ভে গুপ্তকবি রচিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল কবি এবং কবিওয়ালাদের বৃত্তান্ত আজিও লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী, তাঁহাদেরই পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়োজন স্থলে, গুপ্তকবি-সংগৃহীত উপাদানসমূহ সশ্রদ্ধভাবে বিচার করিয়া বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবি এবং কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্যতর পরিচয় হইল, তিনি সাংবাদিক।

সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্মান এবং প্রতিপত্তি সেকালে বড় কম ছিল না। 'বাস্তবিক আট টাকা মাসিক বেতনের সামান্য কর্মচারীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তখন সমাজে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ রামচন্দ্রকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি।'[১৪]

গুপ্তকবি সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৮ জানুয়ারী ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭ শুক্রবার)। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের প্রধান সাহায্যকারী পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে (১২৩৯ বঙ্গাব্দে), 'প্রভাকর করের অনাদর রূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।' দেড় বৎসর পরে ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ বন্ধ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার তিনমাস পূর্বে 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদনা-দায় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে 'সমাচার চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য।

…প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসে (১২৩৮) পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্মপক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্মদ্বেষী হন নাই কেন না ধর্মাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় একবৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিয়াছেন, আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার…।

চার বৎসর পরে সাপ্তাহিকরূপে না প্রকাশিত হইয়া বারত্রয়িক রূপে 'সংবাদ প্রভাকর' ১০ আগষ্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে। এ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

১২৪৩ সালের ২৭ শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসমসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে পাথুরেঘাটা নিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাসী বাবু কানাইলাল ঠাকুর তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর

১৪ রঙ্গলাল—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ৭৪

মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধু স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি করেন না।[১৫]

এই ভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদ-পত্রের রূপলাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুকালে (১০ মাঘ ১২৬৫) সংবাদ প্রভাকরের যৌবন অবস্থা। ইহার পর সংবাদ প্রভাকর দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ প্রভাকর ব্যতীত যে কয়েকটি পত্র পত্রিকা গুপ্তকবি সম্পাদনা করিয়াছিলেন সেগুলি হইল—সংবাদ রত্নাবলী, পাষণ্ডপীড়ন এবং সংবাদ সাধুরঞ্জন। এ গুলির কোনটিই দীর্ঘকাল ধরিয়া জনচিত্তের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তথাপি সাংবাদিক ও সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রের যে পরিচয়, তাহার যথার্থ চিত্র এ গুলিতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের সেবক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সামগ্রিক রূপটির সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাঁহারা রচনার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য এই যে, আজিও ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইবার কোন উপায়ই নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

১। **কালী কীর্তন।** ইং ১৮৩৩। পৃঃ ২৭

শ্রীশ্রীতারা। ত্রিভুবন সারা। কালী কীর্তন গ্রন্থ। লোকান্তর গত ৺রামপ্রসাদ সেনের কৃত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্বক সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মৃজাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্তির গুণাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জোড়াসাঁকো চাষাধোবা পাড়ায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাসী শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি। শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।[১৬]

---

১৫ সংবাদ প্রভাকর ১ বৈশাখ ১২৫৩।

১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৯ ভাগ, ২য় সংখ্যায় (পৃঃ ৫৫-৬৩) 'কালীকীর্তন' পুস্তকখানি শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কালীকীর্তনই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা। পরবর্তী কালে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি ১৭ই অক্টোবর তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

২। কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত। ইং ১৮৫৫। পৃঃ ৬১।

ঈশ্বরো জয়তি কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র। এই গ্রন্থ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।[১৭]

৩। প্রবোধ প্রভাকর। ইং ১৮৫৮। পৃঃ ১১২।

'ঈশ্বরো জয়তি। প্রবোধ প্রভাকর' প্রথম খণ্ড। জ্ঞান গুরু সর্বশাস্ত্র শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত হইয়া কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি।

হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। ১ চৈত্র ১২৬৭।' "কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিক্ষকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত গুপ্ত-কবির রচনা প্রকাশে যত্নবান হইয়াছিলেন। 'হিতপ্রভাকর,' 'মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সারসংগ্রহ (১—৭ম খণ্ড)' এবং 'বোধেন্দুবিকাশ'[১৮] নাটক (৩য় অঙ্ক পর্যন্ত) তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতা সংগ্রহ' (১২৯১ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। বসুমতী সাহিত্য

---

১৭ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন 'ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ'। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক 'কালীকীর্তন' প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

১৮ মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সর্বপ্রথম 'বোধেন্দুবিকাশ নাটক' সম্পূর্ণ আকারে তাঁহার সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন।

মন্দির হইতে সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' নামে ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ ও ২য় খণ্ড)র প্রকাশ (১৩০৮ সালে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত কবির অপর একটি রচনা—'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা'। বসুধা কার্যালয় (২২ ফকির চাঁদ চক্রবর্তীর লেন, কলিকাতা) হইতে বঙ্কুবিহারী ধর কর্তৃক ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে এই ব্রতকথা রচনার পূর্বোতিহাস জানা যায়।

"১৮১৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একবার পুরী যাত্রা করেন এবং বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয়ের বাটিতে অতিথি হন। মণ্ডল মহাশয় প্রতিমাসে স্বগৃহে সত্যনারায়ণ পূজা করিতেন। গুপ্ত কবি যেদিন বালেশ্বরে উপস্থিত হন, সেদিন পদ্মলোচনের বাটিতে "সত্যনারায়ণ ব্রতের" অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মণ্ডল মহাশয়ের অনুরোধে গুপ্তকবি দুই ঘণ্টার মধ্যে এই ব্রতকথা রচনা করেন।"

এই পুস্তিকার ভূমিকা-লেখক তৎকালীন 'বহুদর্শী'-সম্পাদক ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয় একটি মূল্যবান্ ঘোষণা করিয়াছিলেন। "পাঠকগণের কাছে উৎসাহ পাইলে আমরা গুপ্ত কবির 'ষষ্ঠীর কথা,' 'লক্ষ্মীর কথা' 'সুবচনীর কথা' ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।' এগুলির প্রকাশ আর হয় নাই। গুপ্তকবির অনেক রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। যেগুলি 'সংবাদ প্রভাকর' বা তদানীন্তন অপরাপর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের বিবরণ পর্যন্ত এখনও সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই, অথচ বাঙালীর জাতীয় জীবনে এগুলির গুরুত্ব সমধিক। গুপ্তকবি সংগৃহীত কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এছাড়াও সেকালের বাংলাদেশের জীবনচর্চার যথাযথ রূপায়ন গুপ্তকবি যে আধারে রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও বর্তমানের বাঙালী পাঠকের নিকট এ পর্যন্ত অবজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 'ভ্রমণকারী বন্ধুর লিখিত পত্র'-সমূহের প্রতি এখন পর্যন্ত কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। এগুলিতে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিচিত্র বিবরণ যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টির দ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেকালের সংবাদপত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আজিকার দিনে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যথার্থ ইতিহাসের রূপকল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছি অথচ সেকালেরই ধুরন্ধর সাংবাদিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎকালীন বাংলাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নদীপথে ভ্রমণ করিয়া

যে চাক্ষুস-বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অস্তিত্বের সহিত একালের বাঙালী-সমাজের পরিচয় এখনও পর্যন্ত হয় নাই; সেইজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের এই দিনলিপি বা পত্রাকারে ইতিহাস-কথনের কিছু অংশ বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে অনেকেই এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে এগুলি সত্য সত্যই গুপ্তকবির রচনা কি না। সেই সংশয় নিরসনের জন্য এবিষয়ে গুপ্তকবির বক্তব্য তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত হইল।

"......গত অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তম দিবসে আমি কলিকাতার যন্ত্রালয় হইতে নৌকারোহণপূর্বক ক্রমশঃ কয়েকমাস জলপথে ভ্রমণ করিলাম। ভ্রামক হইয়া ভ্রমণকালে স্থানে স্থানে সমূহ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। কি জলে, কি স্থলে, কি পর্বতে, কি কাননে পরম কারুণিক পরমেশ্বর সর্বত্রই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার অনুকম্পায় সম্যকপ্রকার সম্ভাবিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়াছি, ক্ষণকালের নিমিত্ত আপদে পতিত হই নাই, অত্যন্ত ভাবনার পরক্ষণেই আবার অপার আনন্দের সাগর সলিলে ভাসমান হইয়াছি। নূতন নূতন যত দেখিয়াছি ততই নূতন নূতন সুখের সঞ্চার হইয়াছে। নদী নদের সরল তরল লহরী লীলা, তরঙ্গ রঙ্গ, অতি সহজ ও অতি বঙ্কিম কুটিল গতি।—পর্বতপুঞ্জের প্রকৃষ্ট ভাতি।—কাননের কমণীয় কান্তি। সুন্দরবনের সুন্দর শোভা।—কত নগর, কত গ্রাম, কত হট্ট, কত গঞ্জ, কত দেবালয়, কত তীর্থ, কত ক্ষেত্র, কত উপবন, কত সরোবর, এইরূপ কত কত বিষয় বিলোকন করত কেবল পুলকে পরিপূরিত হইয়াছি, চক্ষের সার্থকতা হইয়াছে :

অধুনা রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুর, দালালবাজার, লক্ষ্মীপুর, শান্তিসীতা, ভুলুয়া, সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, সীতাকুণ্ড, বাড়বাকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড, লবণাখ্যা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল, নলছিটি, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, ভূসখালি, নেয়ামতি, সাহেবের ঘাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসায়ের, টাকী, শ্রীপুর, বাদুড়া, পুঁড়া, খোড়গাছি, বাদুড়ে, বসুরহাট, চাঁদুড়ে, গোপালনগর, বনগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, শিবনিবাস, হাঁসখালি ও রাণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন ও অভিনব নগর, গ্রাম, গঞ্জ ও তীর্থস্থান সকল ভ্রমণছলে অতিক্রমপূর্বক অদ্য এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্বার সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইলাম। আমিই এ পর্যন্ত প্রভাকরের ভ্রমণকারীবন্ধুরূপে গণ্য ছিলাম, এইক্ষণে পুনর্বার পূর্ববৎ সম্পাদকীয় কর্মের ভার গ্রহণ করিলাম। 'ভ্রমণকারী বন্ধুর লিখিত বিষয়' এই উপাধির শ্রেণী মধ্যে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, এতদিন তৎসমুদয় মৎকর্তৃক রচিত ও প্রেরিত হইয়াছিল।.....।"

গুপ্তকবির প্রায় অধিকাংশ রচনা নামহীন ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রমণকারী বন্ধুর নামধেয় পত্রগুচ্ছ, নামে পত্র হইলে স্বরূপত ভিন্নজাতের। এগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ পূর্বেই করিয়াছি। এগুলি যে গুপ্তকবির রচিত তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। এই মূল্যবান্ পত্রগুচ্ছের মধ্য হইতে কয়েকটিমাত্র নিম্নে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত পত্রসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র চট্টগ্রাম জেলার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এই একই দৃষ্টি লইয়া গুপ্তকবির রংপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলার বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন যেগুলি আজিও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দ্রুত-অবলুপ্তির আশঙ্কায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ভরসার কথা এই যে, এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অগ্রণী হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম।

২৪ মাঘ ১২৬১।

জিলা চট্টগ্রামের পুরাতন ও নূতন বিবরণ।

বাঙ্গালা প্রদেশের নবাব কাছিমালি খাঁ ইংরাজী ১৭৬০ সালে এই চট্টগ্রাম ইংরাজদিগ্যে দান করেন। পরে ১৭৬১ সালের ১লা জানুআরি দিবসে হেরি, বিরেলস্ট, রেগুল্ক, মেরিণো এবং টাম্স, রম্বলড্ সাহেব এথানে আসিয়া এতৎস্থান অধিকার করেন।

এই চট্টগ্রাম জিলার সীমা

উত্তরে ফেণী নদী।

দক্ষিণে নাফ নদ।

পশ্চিমে মহাসমুদ্র।

এবং পূর্বভাগে মেন পর্বত।

ইহার উত্তর-দক্ষিণ সীমা ৬ ছয় দিবসের পথ।

পূর্ব ও পশ্চিম সীমা ৪ চারি দিবসের পথ।

আবাদী ভূমি	৭২৫০৮/৯৮	দ্রোণ।
পতিত ভূমি	৬৪৪৭৮॥/১৬॥/	দ্রোণ।
সর্বসুদ্ধ ভূমি	১৩৬৯৮৬।৶৬।/	দ্রোণ

দ্রোণ, অর্থাৎ ১৬ কানিতে এক দ্রোণ, এবং এক কানি অর্থাৎ ১ এক বিঘা ৪ কাঠাতে / এক কানি এই মাপ মগি মাপ।

ভূমির রাজস্ব।	কোং	৭৬০৩৬২৬৮
আপকারি রাজস্ব।	কোং	৬৭১১৫
স্টাম্পের উৎপন্ন।	কোং	৭২১৯০
পারমিট উৎপন্ন।	কোং	১৮০০০
ডাক মাশুল।	কোং	৬৭৭২
ফেরি ফণ্ড।	কোং	১০৭৯০
চৌকীদারী ট্যাক্স।	কোং	২৭৫২
সর্বস্থদ্ধ কোং		৯০৭০৮১৬৮
নিমকের উৎপন্ন অনুমান	কোং	৮০০০০০
		১৭০৭০৮১৬৮

এই উৎপন্নের মধ্যে নিমক মহলের ব্যয় ব্যতীত দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং কালেকটরি প্রভৃতিতে সর্বস্থদ্ধ প্রতিবর্ষের নির্দিষ্ট ব্যয় কোম্পানি ৫০৭০০০।

এতৎবাদে সরকারের আনুমানিক বার্ষিক লাভ কোং ৫০৭০০০।

এতদ্ভিন্ন নিমকের ব্যয়াতিরিক্ত বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে।

এই জিলার রাজকীয় পদে নিম্নলিখিত চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্মচারিগণ নিয়োজিত আছেন।

মেং এইচ, স্টৈনিফোর্ট। কমিশ্যনর, এই মহাশয় অতি যোগ্য, সর্বপ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী বহুগুণজ্ঞ।

মেং এইচ ফার্বস্। সিভিল ও সেসনজজ। ইনি অতি উপযুক্ত প্রশংসাপাত্র সুবিচারক।

মেং ডবলিউ. মেলেট এডিসনেল সিভিল ও সেসনজজ। ইনি অতি উত্তম মনুষ্য।

মেং জে. ই. এস. লিলি। কালেকটর। সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ।

মেং জে. আর. মাস্প্রাট। ম্যাজিস্ট্রেট। অতি উত্তম, সদ্বিচারক, নিরপেক্ষ।

বাবু গৌরকিশোর রায়। দ্বিতীয় শ্রেণী অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর। অতি যোগ্য, কার্যতৎপর, রাজাপ্রজা উভয়ের প্রিয়।

বাবু গৌরচন্দ্র রায়, চতুর্থ শ্রেণী ঐ ঐ অতি মহামনুষ্য, কার্যদক্ষ, সচ্চরিত্র, সরল, রাজাপ্রজা উভয়ের প্রিয়।

মেং এস. বারবর। অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মোং

কাক্সবাজার। এই ব্যক্তি ধার্মিক ও সংস্বভাব, পরিশ্রম পরবশ হইলে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন।

মেং ডবলিউ. সারমং। অচিক্কিত আপকারি ডেপুটি কালেক্টর। যোগ্য, প্রতিষ্ঠাপাত্র।

মেং সি. চ্যাপম্যান্। সাল্ট এজেন্ট। অতি নিপুণ, সুধীর, কর্মানুরাগী, সুখ্যাতিপাত্র।

মেং জে. আর. মেথর, সাল্ট সুপ্রেণ্টেডেণ্ট, একটিং ঘাট কাপ্তেন এবং কষ্টম কালেক্টর।

অতি যোগ্য, উদ্যোগী, পরিশ্রমী, কার্য্যনিপুণ।

মৌলবী আসরপআলি খাঁ। প্রধান সদর আমীন।

উপযুক্ত, নম্র, প্রিয়ভাষী, বিচার তৎপর, পরিশ্রম করিলে প্রভুর বিশেষ প্রিয় হইতে পারেন।

শ্রীযুত গোবিন্দ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য, এডিসেনেল প্রধান সদর আমীন। অতি সুপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী, সুবিচারক, অত্যল্প দিবস এখানে আসিয়া রাজাপ্রজা উভয়ের স্থানেই যশস্বী হইয়াছেন।

মৌলবী আমীরুদ্দীন খাঁ। সদর আমীন ও সদর মুন্সেফ। উত্তম মনুষ্য, অনেক মোকদ্দমায় সুখ্যাতি পাইয়াছেন।

মৌলবী আবদুল ফত্তা। সদর মুন্সেফ ও কাজি। যোগ্যপাত্র, বিচারতৎপর, যশস্বী।

বাবু বৈষ্ণবচরণ রায়। এডিসেনেল সদর মুন্সেফ। সবতোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যক্ষম।

উল্লেখিত একাদশ জন মুন্সেফ ব্যতীত এই জিলার স্থানে স্থানে অপর একাদশ জন মুন্সেফ নিযুক্ত আছেন।

যথা।

চৌকী জোয়ার গঞ্জ।	মুন্সেফ বাবু মহেশচন্দ্র রায়।	অতি যোগ্য।	১
„ ফটিকচারি।	„ মৌলবী আবদুল জব্বর।	মধ্যমরূপে খ্যাত্যাপন্ন।	১
„ ভাটিয়ারী।	„ মেং ফেনি সাহেব।	অতি উত্তম।	১
„ হাটহাজারি।	„ বাবু কমলাকান্ত চক্রবর্তী।	সর্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট	১
„ রাঙ্গুনিয়া।	„ উমাচরণ কায়স্থগিরি।	অতি উত্তম সদ্বিদ্বান্	১

চৌকী পঠ্যা	মুন্সেফ মৌলবী সৈয়দ আহম্মদ। ১ম শ্রেণী মধ্যমরূপে গণ্য	১
” হাওয়ালা	” জগচ্চন্দ্র রায়। অতি যোগ্য ও মান্য।	১
” দেয়াঙ্গ।	” মুন্সি আমিনুদ্দীন। যোগ্য ব্যক্তি।	১
” সাতকানিয়া	” গোলকচন্দ্র রায়। ১ম শ্রেণী অতি যোগ্য, সূক্ষ্মদর্শী	১
” রউজন।	” মৌলবী আবদুল রউফ। মধ্যমরূপে গণ্য।	১
” সন্দীপ।	” মৌলবী আনয়ারালি। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অতি যোগ্য, কার্য্যনিপুণ।	১
		১৪

এখানে ১১টা থানা ও ৬টা ফাঁড়ি আছে।

যথা।

থানা জোরয়ারগঞ্জ। একৃটিং দারোগা ভগবানচন্দ্র মজুমদার। উত্তম ও যোগ্য		১
” চট্টগ্রাম সদর কোতয়ালী। আসিমুদ্দীন। ১ম শ্রেণী উত্তম।		১
” পটিয়া। তজসল আলী। উত্তম		১
” ভাটিয়ারি। ভোলানাথ গুহ। একৃটিং যোগ্য		১
” সাতকানিয়া। রত্নকৃষ্ণ দাস। উত্তম		১
” চকরিয়া। গৌরীকান্ত ঘোষাল। উত্তম		১
” রাম্বু। আমানৎ উল্লা		১
” টেকনাফ। রামসেবক নন্দী। একৃটিং		১
” ফটিকচারি। কৃষ্ণচন্দ্র গুহ। উত্তম		১
” রাউজান। জনৈক একটিং দারোগা।		১
” হাটহাজারি। জগদ্বন্ধু ঘোষ		৪
		২১

ফাঁড়ি। সীতাকুণ্ড।	১ এখানকার মুন্সী অতি যোগ্য।
” রাঙ্গুনিয়া।	১
” জলদী	১
” আনোয়ারা।	১
” কুতবদিয়া।	১
” মহিষখালি।	১
	৬

এখানে শাল্ট এজেন্ট ও নিমক চৌকীর সুপ্রেণ্টেডেণ্ট ব্যতীত পোক্তান সংক্রান্ত অপর দুইজন সুপ্রেণ্টেডেণ্ট আছেন। তাহার একজন চরে থাকেন, একজন সদরে থাকেন, তন্মধ্যে একের বেতন ৩০০৲ টাকা ও একজনের বেতন ২০০৲ টাকা।

পোক্তান গোমস্তা ২ দুই জন

বাহির চড়ায় একজন—তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা

জলদিয়ায় একজন—তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা

এই জিলার উত্তরভাগে চৌকীয়াতের একজন সুপ্রেণ্টেডেণ্ট দারোগা আছেন তাঁহার বেতন ৯৫৲ টাকা।

পূর্ব ভাগে ঐ ঐ ঐ ৯৫৲ টাকা

দক্ষিণ ভাগে ঐ ঐ ঐ ৭৫৲ টাকা

এখানে একটিমাত্র গোলা সদরঘাটে স্থাপিত আছে, শ্রীযুত বাবু রাধাকিশোর প্রামাণিক মহাশয় তাহার দারোগা, ইঁহার বেতন ২০০৲ টাকা। এই মহাশয় অতি ধার্মিক, উপযুক্ত, সুধীর, বহুগুণজ্ঞ, কর্মতৎপর।

এখানে নানাস্থানে সর্বসুদ্ধ ১৯টা রিটেইল গোলা আছে, তাহাতে ১৯ জন দারোগা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা ১০ হইতে ২০৲ টাকা পর্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিমক চৌকী।

চৌকী।	কুমুরিয়া	১
”	কাক্সবাজার	১
”	ফেণি	১
”	বাঁশখালি	১

এই চারিস্থানে চারিজন দারোগা আছেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বেতন ৩০ টাকা।

নিমক চৌকীর মুহুরির ঘাট।

জুলদিয়া	১
চোকুরিয়া	১
রাইমির	১
কুতুপদিয়া	১

২৪

বালুরঘাট	১
জলকদর	১
মহিষখালি	১

এই সাত চৌকীতে সাতজন মুহুরি প্রত্যেকে ১০ টাকা করিয়া বেতন প্রাপ্ত হয়েন।

এ বৎসর অনুমান ৮০০০০০ মণ লবণ পোক্তান হইবার উদ্যোগ হইয়াছে।

এ জিলায় প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ ৪ চারি জন।

প্রথম শ্রেণীর দারোগা ১ এক জন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা ২ দুই জন।

*　*　*　*　*　*

পূর্বে এই জিলায় ৪ চারি জন জজ, ২ দুই জন কালেক্টর, এবং ৩২ বত্রিশ জন কালেক্টর ছিলেন, এক্ষণে ২ দুইজন জজ, ১ একজন কালেক্টর, ৪ চারি জন ডেপুটি কালেক্টর, ২ দুইজন প্রধান সদর আমীন, ৩ তিন জন সদর মুন্সেফ ও ১ এক জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, ৩ তিন জন সদর মুন্সেফের মধ্যে সদর আমীন, এক জন সদর মুন্সেফ, এবং ৪ চারি জন ডেপুটি কালেক্টরের মধ্যে এক জন ডেপুটি কালেক্টর কাক্সবাজারে থাকেন, তিনিই তথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

যদিও পূর্বাপেক্ষা অধুনা প্রধানপক্ষ কর্মচারীর সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়াছে, অথচ বঙ্গদেশের অন্যান্য জিলা হইতে এই জিলাকে অতি প্রধান ও বৃহৎ বলিতে হইবে।

কারাগার

চট্টগ্রামের কারাগারে এইক্ষণে ৩১২ জন দোষী ব্যক্তি আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, ইহারা বস্ত্র, ইষ্টক, কাগজ, মোড়া, চৌকীচিক ও চেটাই ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

পরগণা

"ইছলামাবাদ" নামক একটি পরগণাতে এই চট্টগ্রাম জিলা স্থাপিত হইয়াছে। কালেক্টরীতে উক্ত পরগণা ব্যতীত অপর কোন পরগণার নাম লিখিত হয় না, কারণ "ইছলাম খাঁ" কর্তৃক প্রথমে এই দেশ আবাদিত হয়, সুতরাং তাঁহার নামেই পরগণার নাম প্রদত্ত হইয়াছে, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পরগণা আছে, কিন্তু রাজস্ব সম্বন্ধে তাহারদের কখনই উল্লেখিত হয় নাই।

জমিদার

এই জিলার তৌজীতে পূর্বে জমিদারের সংখ্যা ৮২০০০ ছিল, এইক্ষণে ৪২০০০ হইয়াছে, যাঁহারদিগের রাজস্ব ৴০ একআনা অর্ধআনা ছিল, সেই সমুদয় জমিদারের জমিদারী সকল সরকার বাহাদুর নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন।

মালগুজারি

এখানে কোন জমিদারীর মালগুজারি ১২০০০৲ টাকার অধিক নাই। কতকগুলীন একত্র যুক্ত হওয়াতে কেবল "তরফ জয়নারায়ণ ঘোষাল" নামক জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০৲ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে, আশ্চর্য কথা কি কহিব, ৵০ দুই আনা, ৴০ এক আনা এবং ইংরাজী ১ পাই পর্যন্ত কোন কোন জমিদারীর বাৎসরিক রাজস্ব কালেক্টরিতে গৃহীত হইয়া থাকে।

পল্টন

অধুনা এখানে ৩০০ মাত্র পল্টনি সেপাই আছে।

রাস্তা

এই জিলার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের অধীন, সম্প্রতি ঢাকা হইতে আরাকাণ পর্যন্ত "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" নামে এক প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে। এই রাস্তা অনেক প্রজার বাটী ও বাগান প্রভৃতির উপর দিয়া গমন করিতেছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অন্যূন ৮০০০০০ মুদ্রা ব্যয় হইবেক, এই বিষয় সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইতেছে।

নীলকুঠি

জিলা চট্টগ্রামে নীল, রেশম, চিনি ও সরাপ প্রভৃতির কুটি একটিও নাই, নীল, রেশম না থাকাতে প্রজারা অত্যন্ত সুখে আছে, কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

কর্মচারী

এ জিলায় বিদেশস্থ লোকেরাই প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া সম্মান, সুখ ও সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছেন, বিক্রমপুরের এক এক ব্যক্তি বহুলোকের প্রতিপালক, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেছেন, তদ্বিষয়ে অবারিতদ্বার। বাবু গোবিন্দ রায় মহাশয়ের বাসায় নিয়ত ১০০ ব্যক্তি অন্ন পাইতেছে, সময়ে সময়ে তিন চারি শত লোকের সমাগম হয়।

জিলার ভদ্রলোক ও ভদ্রজাতি

এই জিলায় পড়ুইপাড়া, নওয়াপাড়া, কোলিশহর, সুচক্রদন্তী, ধলঘাট, তেঙ্গাপাড়া, এবং চক্রশালা প্রভৃতি গ্রামসকল অতি ভদ্রগ্রাম, এই সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বিস্তর আছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে বল্লালি প্রথা প্রচলিত নাই, হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্বাবধি বৈদ্যজাতিরাই এ দেশে প্রধান ধনী ও অত্যন্ত মান্য, কায়স্থ মাত্রেই বৈদ্যের অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এবং অতিশয় সম্ভ্রম করেন।

বিবাহাদি ক্রিয়া

বৈদ্যেরাই এখানকার কুলীন, পূর্বে শূদ্র ও বৈদ্যে বিবাহ চলিত, এইক্ষণেও ক্বচিৎ কখনো না হয় এমত নহে, কায়স্থেরা বৈদ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিকে ধন্য বলিয়া গণ্য করেন, কতকগুলি বৈদ্য কস্মিন্‌কালে কায়স্থের সহিত বিবাহক্রিয়া করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সম্বন্ধ দোষে দোষী কি না তাহা বলিতে পারিলাম না, ইঁহারদিগের সম্প্রদায় স্বতন্ত্র, ইঁহারা পুরুষানুক্রমে আঢ্য ও গৌরবান্বিত। অপিচ কতকগুলীন বৈদ্য যাঁহারা পূর্বে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন সেই দোষ পরিহারপূর্বক পবিত্র হইয়াছেন। পরন্তু কতকগুলীন বৈদ্য যাঁহারা অদ্যাপি শূদ্রের সহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পতিত হইয়াই আছেন, ঐ পতিত দলের সহিত পবিত্রদিগের আহার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম কিছুই চলিত নাই।

শ্রীপুর, ধলঘাট, কেলিশহর, পড়ুইপাড়া, গৌরহলা, কুইপাড়া, নয়াপাড়া, দেবগ্রাম ও বড়মা ইত্যাদি স্থানের বৈদ্যেরা প্রথমাবধি যে শুদ্ধাচারে আছেন, ক্রিয়াদোষ কিছুই হয় নাই, ধন ও মান সর্বাংশেই প্রধান, যদিও মেং হারবি সাহেবের হাঙ্গামায় অনেকের মহানিষ্ট হইয়াছে, তথাচ কেহ এককালে নিঃস্ব হয়েন নাই, তাবতেরি ভূমি সম্পত্তি আছে, কিছু কিছু অর্থ আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, মান আছে এবং নানাপ্রকার সৎক্রিয়া আছে, অনেকেরি বিলক্ষণ মনুষ্যত্ব আছে।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই সদাচারি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ক্রিয়াশালী, ইতরবৃত্তি প্রায় কেহই করেন না।

ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র প্রধান ধনী আছেন, তাঁহারা ভূম্যধিকার রাখেন ও মহাজনী করেন।

কায়স্থ

কায়স্থের মধ্যে দুই একজন নূতন ধনী হইয়া নাম সম্ভ্রম করিতেছেন।

মুসলমান

মুসলমানের ভিতরে অনেকেই সম্ভ্রান্ত, ধনী, ভূম্যধিকারী এবং বিদ্বান্ আছেন।

যবন জাতির এদেশে বিশেষ কীর্তি কিছুই নাই, যে কয়েকটা মস্‌জিদ ও দর্গা আছে তাহা যৎসামান্য, গণ্য করণের যোগ্য নহে।

সাধারণ বিষয়

এখানকার লোকেরা বিশেষ সাহসী উৎসাহী নহে, বিদ্যাবিষয়ে ও দেশহিতকর ব্যাপারে অদ্যাপি অধিকাংশ ব্যক্তির অনুরাগ জন্মে নাই।

নানা জাতীয় প্রজার সংখ্যা।

এদেশে প্রজার মধ্যে মুসলমান ॥৶০ আনা, হিন্দু ।০ চারি আনা, মগাদি মিশ্রিত জাতি ⁄১০ দেড় আনা, ফিরিঙ্গি ও নেটিব খৃস্টান ৴১০ অর্ধ আনা।

ভিক্ষা

এখানে হিন্দু জাতিতে ভিখারী প্রায় কেহই নাই, ব্রাহ্মণেরাও ভিক্ষা করেন না, যাজনাদি ক্রিয়া এবং ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাই উপজীবিকা নির্বাহ করেন।

মুসলমান জাতিরাই ভিক্ষা করিয়া থাকে, এবং তাহারা বিস্তর দুষ্কর্ম করে।

ব্যভিচার

এই এক সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম জিলার ভিতরে হিন্দু জাতিতে প্রায় বেশ্যা নাই, এ বিষয় কত আনন্দকর তাহা কথনাতীত, মুসলমানের মধ্যে বিস্তর বেশ্যা আছে, কিন্তু তাহারদিগের ভিতরে এক অত্যাশ্চর্য প্রথা প্রচলিত আছে, কুলটাগণ সতীত্ব সংহার পূর্বক বহুকাল বেশ্যাভাবে বাহিরে থাকিয়া পুনর্বার আবার সতী হইয়া গৃহে যাইতে পারে, তখন তিনি সাবিত্রীরূপে পতির কণ্ঠভূষণ হইয়া বসেন।

হাটবাজার

"রাঙ্গুনে" রওজার ও আবু, তরাপ এই তিনস্থানে উত্তমরূপ হাট-বাজার আছে, জিলা ব্যতীত অন্যত্র এরূপ আর নাই, এই তিন স্থান বাণিজ্য পক্ষে প্রধান স্থান।

হিন্দু পুরুষ

এখানকার হিন্দু পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়দোষ অত্যল্প, অনেকেই জিতেন্দ্রিয়, এ বিষয় আমরা তাঁহারদিগ্যে সাধু সাধু সাধু শব্দে পূজা করিতে ইচ্ছা করি, মনুষ্য মাত্রেই পরিমিত

ব্যয়ি, অন্যায় ব্যয় কেহই করেন না, এজন্য তাবতেই সুখে আছেন, দুঃখের লেশমাত্র জানিতে পারেন না।

ইন্দ্রিয় দোষ এবং অপরিমিত ব্যয় জীবের পক্ষে এই উভয় হইতে অশিবের ব্যাপার আর কিছুই নাই, সুতরাং এই স্থলে আমার বিবেচনায় চট্টগ্রামের লোকেরা হট্টগ্রামের লোক না হইয়া প্রকৃত ভট্টগ্রামের।

এই দেশের লোক যদিও ধনশূন্য, কিন্তু অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত কাহারো কষ্ট নাই, সকলেরই ভূমি আছে, তাহার উপস্বত্বের উপরেই নির্ভর করেন।

দস্যুতা

চুরি ডাকাইতি প্রায় নাই, প্রজারা নির্ভয়ে সম্পত্তি সমূহ রক্ষা করত পরমানন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। কেহ কাহারো একগাছি তৃণস্পর্শ করে না, এখানকার স্থলপথ জলপথ—দুইপথেই দস্যুভয় নাই, দ্রব্যাদি সহিত পথে ঘাটে যেখানে সেখানে অনায়াসেই একাকী আহার করা যাইতে পারে। শান্তি সম্বন্ধীয় কর্মকারকেরা কেবল শান্তিজল স্পর্শ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এতদ্রূপ অরণ্যময় পর্ব্বতীয় প্রদেশে চুরি দস্যুতার এত স্বল্পতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে দেশের প্রতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ স্বীকার করিতে হইবেক, ইহার কারণ দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ ভূমিসকল শস্যশালিনী। দ্বিতীয়তঃ উদরের দায়ে কেহই লালায়িত নহে, সকলেরি সম্ভব মত বিভব থাকাতে দিনপাত বিষয়ের কোন ভাবনায় নাই, আনন্দের কথা কি লিখিব, উৎকট অপরাধের কোনরূপ মোকদ্দমা প্রায় ফৌজদারিতে উপস্থিত হয় না, কেন না তদ্রূপ সংঘটনা হয় না।

মোকদ্দমা

এদেশের আপামর সাধারণ ছোট বড় তাবতেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে, পার্শি ও বাঙ্গালা না জানে এমত ব্যক্তি প্রায় নাই, সকলেই মোকদ্দমাবাজ, আইন-কানুন জ্ঞাত আছে যে ব্যক্তি লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি চষিতেছে সে ব্যক্তিও বলিতে পারে এই মোকদ্দমা এইরূপ, এইরূপ দরখাস্ত করিতে হইবেক, এইরূপ অজুহাত লিখিতে হইবেক। এইমাত্র যাহাকে গোচারণ করিতে দেখিলাম, ক্ষণ পরে দেখি সেই মনুষ্যই আবার আইন খুলিয়া মোকদ্দমার কাগজ প্রস্তুত করিতেছে, এমন মামলাপ্রিয় লোক অপর জিলাতে দেখি নাই, কথায় কথায় আদালতে নালিশ করিয়া বসে।

সপ্র

এ দেশের লোকেরা যাহা ধরে, তাহা করেই করে, তাহাতে সর্বনাশ হইলেও পরাঙ্মুখ হয় না, কিন্তু প্রাণান্তেও ফৌজদারী নালিশ করে না, এক পয়সা কড়ির নিমিত্ত অনায়াসেই ষ্ট্যাম্প কাগজে আদালতে নালিশ উপস্থিত করে, সদর দেওয়ানী পর্যন্ত তাহার আবার আপীল হইয়া থাকে, কয়েক বৎসর হইল এইরূপে এক পয়সার এক মোকদ্দমার আপীল সদরের পূর্বতন জজ শ্রীযুক্ত কালবিন সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাতে চৌকী হাটহাজারির মুন্সেফবাবু "কমলা কান্ত চক্রবর্তী" মহাশয়ের "ফয়সলা" বজায় থাকে, এই বিষয় সমুদয় সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছিল।

একজনের কুক্কুট আর একজনের ধান্য খাইলে অথবা একজনের গাভী আর একজনের বেড়া ভঙ্গ করিলে সেই হানিগ্রস্ত ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটিতে না গিয়া ৵৹ দুই আনা ।৹ চারি আনার দাবিতে মুন্সেফের নিকট আব্দাস করে, রহস্যের কথা কত লিখিব, এ দেশের কুমার জাতির মধ্যে যদি কেহ সভামধ্যে আপনার নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করে তবে ঐ নমস্য ব্যক্তি ঐ নমস্কার অপ্রাপণের জন্য স্বচ্ছন্দেই নালিশ করে। অপিচ তাঁতি জাতির মধ্যে যদি কেহ বিবাহাদি কোনরূপ ক্রিয়াসূত্রে কোন ব্যক্তিকে পান সুপারি দ্বারা মর্যাদা করিতে ত্রুটি করে তবে তৎক্ষণাৎ দেওয়ানীতে তদ্বিষয়ের নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে, এবম্ভূত নালিশের আবেদনপত্রে মুন্সফি কাছারি সর্বদাই পরিপূর্ণ হইতেছে, মুন্সেফেরা মধ্যে মধ্যেই তাহার ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিতেছেন, যথাযোগ্য স্থানে আবার তাহার আপীল হইতেছে, চট্টগ্রামের লোকেরা যদিও প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অনর্থক ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করে, কিন্তু তাহারা কখনই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পূরিত মিথ্যা নালিশ ও জালসাজি প্রায় করে না, এজন্য তাহারদিগের যথোচিত অনুরাগ করিতে হইবেক।

নদী নদ

এখানে জলনিধি মহা সমুদ্র। তদ্ভিন্ন "হেতিয়া" সন্দীপ ও "বামনী" এই কয়েকটা নদী অতি বৃহৎ, সমুদ্র বিশেষ, ইহারা লবণাম্বু পরিপূরিত বড় ফেণির জল সর্বত্রই লবণ, এই নদী এদেশের পক্ষে ক্ষুদ্র বটে, "মাতামুচ্ছরি নদী" ক্ষুদ্র, তাহার জল অতি মিষ্ট, কন্যা ও শ্রীমতী নদীর জল অতি উত্তম, শঙ্খ নদের জল কোন কোন স্থানে মিষ্ট, কোন কোন স্থানে লোণা, ডলু নদীর জল অতি উৎকৃষ্ট, আর কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নদী আছে, এই স্থলে তদুল্লেখের প্রয়োজন করে না।

সদরঘাট

জিলা সদরঘাটে পরমিট ও নিমক কাছারির নীচেই "কর্ণফুলী নদী", তাহার শোভা অতি সুন্দর, জাহাজ ও স্লুপ এবং আর আর অশেষ প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূরিত নৌকায় পরিপূর্ণ, তণ্ডুলাদি নিয়তই রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু বিদেশীয় আমদানী অতি অল্প, সদরঘাট এখানকার বাণিজ্যের প্রধান স্থান, এখানে দেশ বিদেশীয় অনেক মহাজন অনেক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করেন। কর্ণফুলী নদীর জল সর্বত্র লোণা নহে, কোন কোন স্থানে মিষ্ট আছে ; মহাসমুদ্র হইয়া চট্টগ্রামে আসিতে ও চট্টগ্রাম হইয়া মহাসমুদ্রে যাইতে এবং হাতিয়া ও সন্দীপের সমুদ্রবৎ নদী হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি যাইতে ও তত্তৎ স্থান হইতে চট্টগ্রামে আসিতে হইলে এই কর্ণফুলীকে অবলম্বন করিতে হয়। সিন্ধুপথে জাহাজ ও স্লুপ সন্দীপের নদীতে "বালাপ" নামক বেতের কাঁধনির নৌকা ভিন্ন অপর কোন নৌকায় আসিবার উপায় নাই, কারণ ঐ পথে লোহার বাঁধুনি নৌকা আইলেই মারা পড়ে, বাণে নির্বাণ করিয়া দেয়, তক্তা সকল খুলিয়া যায়, কেবল এই শীতকালে বোট ও পিনিস আসিতে পারে, গ্রীষ্ম পড়িলে আর আসিবার বিষয় কি।

সমুদ্রতীরে হালিশহর নামক স্থানের বায়ু অতি উত্তম, সাহেব লোকেরা পীড়িত হইলে আরোগ্যের নিমিত্ত তথায় আগমন করেন।

তীর্থ

চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, আদিনাথ, পাতাল, দ্বাদশশিলা, জটাশঙ্কর, জ্যোতির্ময়, ধর্মাগ্নি, বিরূপাখ্য, লবণাখ্য, সহস্রধারা, বাড়বানল, চন্দ্রকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, দধিকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড প্রভৃতি অনেক তীর্থ এই জিলার মধ্যে আছে, ইহার এক এক তীর্থ অতি রমণীয় তত্তৎস্থানে অনেক চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

ফিরিঙ্গি

চট্টগ্রামে অনেক ফিরিঙ্গি আছে ইহারা চ্যাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি নামে বিখ্যাত, ১০০০ এক হাজার ঘরের ন্যূন নহে, ইহারা ফিরিঙ্গি বাজার ও বান্দেল এই দুই স্থানে বাস করে, পর্টুগিসেরা প্রথমে এই দেশে আসিয়া এই সকল ফিরিঙ্গির আদি পুরুষদিগ্যে জন্ম প্রদান করে, ইহারা ভাবতেই রোম্যান কেথলিক ধর্মাবলম্বী, এদিগে গির্জায় গিয়া ভজনা করে, দর্গায় গিয়া শিরণী দেয় এবং কালীর মন্দিরে গিয়া বলি প্রদান করে, ফিরিঙ্গি জাতির বালক বালিকার শিক্ষার নিমিত্ত বান্দেলে ভিন্ন ভিন্ন দুই স্কুল আছে, এখানে রোম্যান কেথলিক "নান ও ফেগ্নার" অর্থাৎ কুমারী ও কুমার আছে, ইহারা বৃদ্ধ হইয়াছে তথাচ বিবাহ করে

না, বান্দেলের গির্জা ও নানারি বাটি অতি সুন্দর, দেখিলে চক্ষু প্রফুল্ল হয়, চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গির মধ্যে তাবতেই কৃষ্ণবর্ণ অতি কুৎসিত, কচিৎ দুই একজন গৌর আছে, ইহারা বাণিজ্য করে, কেরানীগিরি করে, চাপরাসি ও খালাসিগিরি ও আর আর ইতর কর্ম করিয়া সংসার নির্বাহ করে।

মেলা ও ব্রত

শিবচতুর্দশীর দিবসে চন্দ্রনাথে প্রতি বৎসর গুরুতর এক মেলা হয়, তাহাতে বহু লোকের জনতা হইয়া থাকে।

সমুদ্রতীরে বারুণীর মেলাকে মহামেলা বলিলেই হয়।

রাউজন থানার অধীন পাহাড়তলীতে মগেরদের প্রকাণ্ড এক মেলা হয় তাহার সমারোহ অষ্টাহ পর্যন্ত থাকে।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে সূর্যব্রতের মেলা এদেশের নানা স্থানেই হইয়া থাকে।

এখানকার স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সূর্যব্রত করে।

বেহারা

এদেশের কায়স্থেরা পাল্কী বহিয়া থাকে, তাহারদের নাম সর্দার, অত্যন্ত পরিশ্রমী, আরোহী সহিত পাল্কী লইয়া অনায়াসে অক্লেশে বড় বড় পর্বতে যাতায়াত করে, ইহারদিগের বেহারা বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, সর্দার বলিলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এই সর্দার কায়স্থ ভিন্ন চণ্ডাল ও মুসলমানেরা পাল্কী বহন করে, কিন্তু তাহারা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য নহে।

ব্যবসায়

এখানকার ফিরিঙ্গি ও মুসলমানেরাই বাণিজ্য কার্য্যে অধিক অনুরাগী, হিন্দুরা তদ্রূপ নহে, অত্যল্প মাত্র, ইহার কারণ হিন্দুরা সমুদ্রপথে গমনাগমনে অসক্ত। কেহ কেহ কেবল দেশীয় বাণিজ্য ও টাকার মহাজনি করিয়া থাকেন।

আহারীয় দ্রব্য

এখানে কাষ্ঠ ব্যতীত অপর দ্রব্য সুলভ নহে, ঘৃত, মৎস্য অতি দুর্লভ, চাউল মধ্যমরূপ, তাহারো অধিকাংশ বিদেশে প্রেরিত হয়, এজন্য সুলভ হয় না, গোল আলু অন্য দেশ হইতে আইসে, অতি মহার্ঘ, পটল নাই, যাহা আছে তাহা তিক্ত, দেশীয় জনেরা তাহাকে বিষফল কহে, বেগুন, কলা, শাক, মোচা, কচু, করলা, ওল, লাউ,

কুমড়া প্রভৃতি পরিমিতরূপে জন্মে। উচ্ছা, কাঁকুর, ফুটি সম্ভবমত, বাজারে সুন্ধ শুঁটকি, পচা চিংড়ি, লাক্ষা ও নটে মাছের রাশি, নটে মাছে কাঁটা মাত্র নাই, ফলে ঐ সকল মৎস্য ভদ্রলোকের ভক্ষ্য নহে।

দুগ্ধ নিতান্ত মন্দ নহে, উত্তম দুগ্ধ টাকায় ৷৷০ অর্ধ মণ, কিন্তু রাহাগির পথিকের পক্ষে বড়ই প্রমাদ, তাহারা প্রায় দুগ্ধ পায় না, ঘৃত বড় জঘন্য, ময়দা মধ্যম, বাজারের মিষ্টান্ন ভাল নহে, এখানে বাঙ্গালীর খাদ্যসুখ কিছুই নাই, গোচেগাচে আহার করিয়া দিনপাত করিতে হয়। যাঁহারা মফঃস্বলে বাস করেন তাঁহারদের পক্ষে আহারের বড় ক্লেশ, নিত্য বাজার প্রায় কুত্রাপিই বসে না, হাটে হাটে মাছ তরকারী সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, এখানে মধ্যে মধ্যে তপস্বীমাছ পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদন উত্তম নহে, খোরশুলা ও বাটা মৎস্য অতি সুস্বাদু, কিন্তু সর্বদা পাওয়া যায় না এবং কলিকাতার অপেক্ষাও তাহার মূল্য অধিক।

পাঁটা বড় সস্তা, এ স্থান মাংসাশীর পক্ষে অতিশয় সুখকর।

চট্টগ্রামে ইংরাজের খাদ্য সুখের পরিসীমা নাই, কারণ মুর্গি, পেরু, পাঁটা ও শূকরাদি অতি অল্প মূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফলমূলাদি

এদেশের আম্র ভাল নহে, একে টক, তাহে পোকায় পরিপূর্ণ। কাঁটাল যথেষ্ট উত্তম। পেঁপিয়া বড় ভাল, লিচু, পীচ ও গোলাপজামাদি দুষ্কর, পেয়ারা ভাল, পাটনাই কুল কোন কোন বাগানে ফলিয়া থাকে, দিশি কুল, তেঁতুল, চাল্‌তা, কামরাঙ্গা বিস্তর। সজিনার ফুল ও সজিনার খাড়া অতি দুর্লভ, পর্বতের উপর এক প্রকার কমলালেবু জন্মে, তাহা অতি ক্ষুদ্র ও মিষ্ট নহে, শশা অনেক, দাড়িম্ব ভাল নয়, তরমুজ অপকৃষ্ট, আনারস উৎকৃষ্ট। খর্মুজের ন্যায় "চিনার" নামক এক প্রকার ফল জন্মে, তাহার সৌরভ ফুটি হইতে কিঞ্চিৎ ভাল।

ইক্ষু অনেক, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট নহে, তাহার চিনি হয় না, গুড় অতি কদর্য হয়, খেজুরে গুড় যৎ সামান্য, চিনি প্রস্তুত করিতে জানে না।

কৃষিকার্য

এ দেশ পর্বতময়, একারণ ভূমি সাধারণরূপ উর্বরা, এবং কৃষকেরা কৃষিকার্যে তাদৃশ নিপুণ নহে, এজন্য অধিক শস্য জন্মে না, কিন্তু চাউল, মুগ, কলাই, খেসারী,

অড়হর অধিক জন্মে, গোধূম পরিমিতরূপ হয়। ছোলা, মটর, মুসুরী, যব, তিসি হয় না, সর্ষা অত্যল্প হয়, কৃষ্ণতিল অনেক হয় ও অতি উত্তম।

নানাদ্রব্য

এখানে গর্জন তৈল, নারিকেল তৈল, কেরণফুলের তৈল, নাগকেশর ফুলের তৈল ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈল জন্মে। নারিকেলের কাছি অনেক প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত দ্রব্য নৌকা পথে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার প্রতিভার যথার্থ দিগদর্শন করা ও তাঁহার কৃতকর্মের সঠিক মূল্যনির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। যুগ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসের মধ্যেই কবিগানের ক্রমাবনতির মূল কারণের যথার্থ ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে।

কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগ প্রয়োজনে সাংবাদিক, সম্পাদক, গবেষক, সাহিত্যিক হইয়াছেন। অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে তখন পরিবর্তনের দ্রুতগতি সঞ্চরণশীল। এই পরিবর্তনেরই প্রবাহে কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাভাবিকভাবেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

গুপ্তকবির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। আধুনিক বাংলা কাব্যের অগ্রপথিক—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অথচ অত্যল্পকাল মধ্যেই তৎকালীন বাংলা সাহিত্য গুপ্তকবিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল—ইহা কম বিস্ময়ের কথা নয়। ইহার কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গুপ্তকবি দ্বিধাহীনভাবে নূতনকে স্বাগত জানাইতে পারেন নাই। পুরাতন এবং নূতন—এই দুয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া গুপ্তকবি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন এবং পুরাতনের বিপরীতধর্মী দ্বিবিধ ভাবধারায় তিনি হইয়াছেন আবেগ-আন্দোলিত। তাঁহার এই দ্বৈত-ভাবের স্বাক্ষর রহিয়াছে তাঁহার জীবনের সকল কর্মে; সাহিত্য-কর্মও ইহার ব্যতিক্রম নয়। গুপ্তকবির পরবর্তী-কালীন বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভাবটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া নূতনকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে, তাহাকে বরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই রূপান্তর অমোঘ হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন যুগের দীপ্ত মহিমায় মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন জনচিত্তকে বিস্ময়াহত করিয়াছিলেন।[১৯] ইন্দ্রজিতের

---

১৯ In Bengali Poetry of the Nineteenth Century, Iswar Chandra Gupta (b. 1809) was forerunner of the modern school, more Catholic into spirit than the

অকল্পনীয় মহণীয়তার বার্তা তখন বাঙালীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে; তখন সেখানে 'কাম-রূপেতে কাক্ মরেছে, কাশীধামে হাহাকার' হউক বা না হউক তাহাতে কোন আসে যায় না। 'মেঘনাদবধে'র রাজকীয় কল্পনার পথ হইতে 'বোধেন্দুবিকাশে'র ছোট গলিকে আর চেনাই যায় না। এই না-চেনার কোনই দোষ নাই বরং প্রাণের প্রয়োজনে অস্থি-মজ্জার মত এগুলিও যে বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিবর্তন পথে নিজেদের সগৌরব সহায়তা দান করিতে পারিয়াছে তাহাতেই এ গুলির পূর্ণ মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। গুপ্তকবি আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই কাব্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের অবাধ বিস্তার এত দ্রুত সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন এ কথা কখনই বিস্মৃত হন নাই; সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া গুপ্তকবির প্রতি যে মানস-কুসুমের ভক্তি-অর্ঘ তিনি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, স্মৃতির-মন্দিরে তাহা আজিও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে :—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

products of earlier generation. His fame was overshadowed by that of Madhusudan Dutt (1824—73), who now ranks higher in the estimation of his countrymen than any Bengali poet of this or any previous age.—G. A. Grierson. (The Imperial Gazetteer of India, Vol II, New Ed. Oxford 1928, Chapter II pp. 433.)

পরিশিষ্ট (খ)

কবিগানের ভাষান্তরিত রূপ

অঙ্গ গৌরব-চন্দনে
চর্চিত বনমালা গলায়।
আ মরি এ রূপ ধরে
না ধরায়,
গুঞ্জ বকুলেরই মালে বাঁধিয়াছে চূড়া
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥
কদম্বতলে কে গো সখি,
বংশী বাজায়, এতদিন আসি যমুনা জলে,
আমি এমন মোহন মূরতি কখন,
দেখিনে এসে হেথায়,

সই, সজল নব-জলদবরণ,
ধরি নটবর বেশ।
চরণ-উপরে থুয়েছে চরণ,
এই কি রসিক শেষ।
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ,
নখরের ছটায়।
অনঙ্গে এ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
আমার হেন লয় মনে, জীবন-যৌবন,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়।[১]

—হরু ঠাকুর

[The soul beset by God wishes to surrender itself]

Who is this with smeared limbs
Of sandal wreathed with forest bosom.
For a beauty in him gleams
Earth bears not on her mortal bosom.

He his hair with bloom has crowned,
And many bees come murmuring, swarming.
Who is he that with sweet sound
Arrests our feet, our hearts alarming ?

Daily came I to the river,
Daily passed these boughs of blessing,
But beneath their shadow never
Saw such beauty heart-caressing.

১ কবি সঙ্গীতের নিয়মানুযায়ী এই গীতটি পূর্বে (পৃঃ ১৭১) যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

Like a cloud yet moist with rain
His hue is, rope of masquerader.
Ah, a girl's soul to win
Outposts here what amorous raider ?

Ankle over ankle lays
And moonbeams from his feet make glamour ;
When he moves, at every pace
His body's sweets love's self enamour.

A strange wish usurps my mind ;
My youth, my beauty, Ah, life even
At his feet if I resigned
Were not that rich surrender heaven.

ভুবনমোহন, না দেখি এমন ঐ বই
রূপ কি অপরূপ,
রসকূপ আ মরি সই !
কূলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,
কালরূপ নয়নে হেরিয়ে।

ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে,
ওই বটে সেই কালীয়ে,
চরণ চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে।
যে চরণে ভ'জে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।[২]

—রাম বসু

II

[The soul recognises the Eternal for whom it has failed in its earthly conventional duties and incurred the censure of the world.]

I know him by the eyes all hearts that ravish,
For who is there beside him ?
O honey grace of amorous sweatness lavish !

২ শ্রীঅরবিন্দ এই গীতটির অনুবাদকালে ইহাকে হরু ঠাকুরের রচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, গীতটির রচক রাম বসু। এ সম্পর্কে যথাস্থানে (পৃঃ ১৩৩, ২৩৮) আলোচনা করিয়াছি।